মুক্তমনা নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

আকাশ মালিক

যে সত্য বলা হয়নি

আকাশ মালিক

একটি মুক্তমনা ইবুক
www.mukto-mona.com

যে সত্য বলা হয়নি

আকাশ মালিক

তৃতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬

মুক্তমনা ইবুক

প্রকাশক

মুক্তমনা
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

আহমেদ সাইফ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Je Sathya Bola Hoyni, by Akash Malik

Third Edition: September 2016
Published by: Mukto-Mona eBook
Dhaka, Bangladesh.
eBook by: NoroSundor Manush

উৎসর্গ

যুক্তি ও সত্যের সন্ধানী নতুন প্রজন্মকে

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

লেখকের কথা

মনের ভেতর জগদ্দল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সংঘর্ষে সৃষ্ট ভাবনাগুলো চিরদিন অব্যক্তই থেকে যেতো যদি 'মুক্তমনা' (www.mukto-mona.com) অন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় **অভিজিৎ রায়** তা প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না দিতেন। বইটিকে একটি ঘরের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে সেই গৃহের আর্কিটেক্টর বা নকশাকারী ছিলেন অভিজিৎ আর কারিগর বা মেস্তরী অনন্ত বিজয় দাস। তাঁদের হাতের ছোঁয়া আছে বইটির পাতায় পাতায়। আজ তাদের নামের সাথে 'ছিলেন' শব্দ লিখতে গিয়ে এক পাহাড়সম চাপা বেদনা বুকে অনুভব করলাম। তারা উভয়েই আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। তাঁদের প্রতি রইলো আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

চৈতন্য-ভাবনা শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ। অন্যান্য জীব ও মানুষের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে কল্পনা ও চিন্তা করার শক্তি অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি আছে। মানুষের মন অনুসন্ধিৎসু তাই সে অনুসন্ধান করে ঘটনার পেছনের কারণ। আদিকালে বিভিন্ন ঘটনার সঠিক কারণ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে মানুষ কল্পনা করেছিল ঘটনার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এক অদৃশ্য মহাশক্তিধর; কেউ নাম দিয়েছিল ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউবা গড, আল্লাহ, খোদা প্রভৃতি, যার শক্তি-আকার-আকৃতি-রূপের বর্ণনা তারা দিল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে। আর নিজেদের শান্তনা দেয়ার লক্ষ্যে রচনা করলো বিভিন্ন রকমের কল্পকাহিনি। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথিত অদৃশ্য মহাশক্তি এবং জীবন-জগৎ নিয়ে মানুষের রচিত কল্পকাহিনি একেক দেশে হয় একেক রকম। খ্রিস্টানদের ঈশ্বর, হিন্দুদের ভগবান আর মুসলমানদের আল্লাহ যেমন বর্ণনায় সমান নয়, তেমনি কল্পিত হেভেন-হেল, স্বর্গ-নরক, বেহেস্ত-দোজখের রূপ-রঙ আকার-আকৃতির ব্যাখ্যাও সমান নয়। এই অদৃশ্য মহাশক্তিটি আসলে 'প্রকৃতি'। মানুষ প্রকৃতির কার্যকারণ বুঝতে ব্যর্থ হয়ে প্রকৃতি বন্দনার নাম দিল 'ধর্ম'। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ উদ্ঘাটন ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের সীমিত জ্ঞান ও ভয়-ভীতিকে সম্বল করে পরবর্তীতে কিছু ধূর্ত মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতা (Capital and Power) করায়ত্ব করার উদ্দেশ্যে রচনা করলো ধর্মগ্রন্থ, যার অন্যতম লক্ষ্য শাসকগোষ্ঠী ও পুরোহিত শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন

যাপন ও অবাধ নারী-ভোগ। সুতরাং আদিকালে মানুষের ভয়ভীতি ও অজ্ঞানতা থেকে সৃষ্ট 'ধর্ম' আর শান্তির বার্তাবাহী রইলো না, হয়ে গেল অন্যায়ভাবে নারীভোগ, সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মগ্রন্থ আর ধর্মের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর প্রমাণ বিদ্ধমান।

আগুনে হাত দেয়ার পরিণাম মানুষ বুঝতে পারে বিধায়, সে কখানো আগুনে ঝাপ দিয়ে সতীত্ব বা ঈমানি পরীক্ষা দেবে না, সে যতোই নিজেকে রামায়ণের সীতার মতো সতী অথবা ইব্রাহিম নবির মতো ঈমানদার দাবি করুক না কেন? সুতরাং ভগবান বা আল্লাহর নির্দেশে সীতা দেবীর বা ইব্রাহিম নবির অগ্নীকুণ্ড কুসুম-কাননে পরিণত হওয়া কিংবা ইসমাইল নবীর গলায় লাগানো ছুরি ভোঁতা হয়ে যাওয়া কল্পিত কাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে আমাদের দৃষ্টিগোচরে যা কিছু আছে, কোনো কিছুই ঈশ্বর নামক 'বড়বাবু'র নির্দেশে জন্মে না, বাঁচে না, মরেও না। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ধর্মের কোনো অবদান নেই। শিক্ষা-সাধনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে জাতি যত বেশি অগ্রসর, সে জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ধর্মচর্চাকারীদের চেয়ে উন্নত; তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর বাস্তবতা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম যে মানব প্রজাতির উপকারের চেয়ে সীমাহীন অপকার করেছে তা নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে এই বইটিতে। আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের হাতে ধর্মগ্রন্থ না বিজ্ঞান তোলে দেবো, এ সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। 'যে সত্য বলা হয়নি' বইটি নতুন প্রজন্মকে প্রথাসিদ্ধ ভাবনা ত্যাগ করে জগৎ ও জীবন নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে প্রেরণা যোগাবে এটাই বইটি লেখার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা।

আকাশ মালিক

ইংল্যান্ড ২০১৬ ইং

প্রথম অধ্যায়

বোকার স্বর্গ[১]

You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you can not fool all of the people all the time. অর্থাৎ, সকল মানুষকে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়। কিছু কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না।- মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯—১৫ এপ্রিল, ১৮৬৫)।

প্রতিটি মানব সমাজে বিশৃঙ্খলার মারামারি, হানাহানি, খুনোখুনি, আর্থ-সামাজিক অবনতির অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধান ও অন্যতম কারণ হচ্ছে 'ধর্ম' (Religion)। সমাজবিজ্ঞান আর নৃবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি আদিম-অসহায় মানুষদের অজ্ঞতা, কল্পনা আর ভয়ভীতি থেকে একদা ধর্মের উৎপত্তি; এবং এর যাত্রা শুরু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগের মানুষের পূর্বপ্রজাতি নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতির মধ্যে। আস্তে আস্তে সময়ের পরিক্রমায় মানুষের যেমন ক্রমবিকাশ ঘটেছে, চিন্তাচেতনার নানা স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন দর্শনে, তেমনি ধর্মীয় চেতনারও বিস্তৃতি ঘটেছে ভিন্ন ভিন্নরূপে। বিচ্ছিন্ন মানুষ বনে-জঙ্গলে বন্য-হিংস্র পশুর আক্রমণ, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে আর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ; বন্যা, খরা, অধিক বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবানল ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে গিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে, গোষ্ঠীবদ্ধ থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে, সমাজ

১. প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বোকার স্বর্গ'; যা বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত বাগধারা, এখানে 'বোকার স্বর্গ' বলতে 'ধর্ম' নামক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবান সংক্রান্ত ধারণাসমূহ, উপাসনার নিয়ম-নীতি, রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ইত্যাদি। 'ধর্ম' নামক সিস্টেমটি সমাজের জন্য মঙ্গলময়, কল্যাণকর ইত্যাদি মিথ্যে ধারণার খোলস খোলসা করে দেওয়ার জন্য 'বোকার স্বর্গ' নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করেছে। এই সমাজ কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের মতো করে

কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সে সময়কার মানুষের জীবন-জগৎ সম্পর্কে পরিপূর্ণ কিংবা বিশ্লেষণী জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য, বন্য পশুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য, খাবার সংগ্রহের নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রাক-ধর্মীয় চেতনা বিস্তার লাভ করে। প্রাক-ধর্মীয় চেতনার ধারণার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সময়ে আত্মার ধারণা থেকে টোটেমবাদ, টোটেমবাদ থেকে সর্বপ্রাণবাদ, সর্বপ্রাণবাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ থেকে বহুঈশ্বরবাদ-এ মোড় নিয়েছে, সমন্বয় ঘটেছে; তবে এগুলো সবসময় সবজায়গায় কখনো একরৈখিক ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে। ধীরে ধীরে বহুঈশ্বরবাদ থেকে আবার একেশ্বরবাদে পৌঁছেছে। এখন সময় এসেছে ধর্মীয় একেশ্বরবাদকে ছেঁটে ফেলে নিরীশ্বরবাদের দিকে যাত্রা শুরু করার। এগুলো আজ নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত সত্য। বর্তমানে প্রচলিত একেশ্বরবাদ বা বহুঈশ্বরবাদের ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো কঠোর পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে রচিত, যেখানে নারী নরকের কীট। শাস্ত্রগুলি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েই রেখেছে, নারী পুরুষের অধীন, নারী শয়তানের বেশ ধরে আসে, শয়তানের বেশ ধরে যায়! নারীর কোনো গুণ নেই, তার কাজ শুধু পুরুষদের দূষিত করা। তৌরাত, ইঞ্জিল, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরান ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো নির্মোহভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় এগুলো চরম পিতৃতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রিরাই 'ভগবান', 'ঈশ্বর', 'আল্লাহ', 'গড' - এর মুখ দিয়ে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। নিজেরা যেভাবে জগতকে দেখতেন, বিচার করতেন, তেমনি কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদ থেকে হোক, নিজের উদরপূর্তির জন্যই হোক, অথবা নিজের ভয়-ভক্তি-বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎ উদ্দেশ্য থেকেই হোক, শাস্ত্রগুলোর বক্তব্যকে তারা সৃষ্টিকর্তার বা ঈশ্বরের নামে রটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যে ধর্ম ছিল একসময় মানুষের কল্পিত আশ্রয়, হতাশ মানুষদের নিরাপত্তার আচ্ছাদন, সভ্যতার আলো না-পাওয়া, যুক্তি-বিবেকের সমন্বয় ঘটাতে না-পারা কতিপয় দুর্বল মানুষের ভ্রান্ত অবলম্বনমাত্র; সেই ধর্মই আজকের যুগে গোটা সমাজের জন্য দানবরূপে দেখা দিয়েছে। শোষিত মানুষের চোখে ধুলো

দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা স্বার্থে ধর্মকে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর সর্বনাশা ব্যবহার আর বোকার স্বর্গে বাস করা কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন (কিংবা শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী অতি ধুরন্ধর) লোকের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-চর্চার দ্বারা ধর্ম আজ এক বিরাট বিষবৃক্ষ। গোটা ধর্মটাই 'মৌলবাদ' আর 'রাজনীতি'র মিশেলে তৈরি; এই দুটি ধারণা ব্যতীত পৃথিবীতে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং তা কোনো ধর্ম থেকেই কোনোকালে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছে নানা মতভেদ, নানা বিভ্রান্তি, নানা বিদ্বেষ। নিজ নিজ ধর্মের প্রসার আর তালুক দখলের লোভ সবই একসূত্রে গাঁথা; যা মানুষে-মানুষে শুধু জিঘাংসাই বৃদ্ধি করেছে। ধর্মগুলো তাদের নিজস্ব গ্রন্থে (যেমন হিন্দুদের বেদ, মনুসহিংতা, গীতা ইত্যাদি, ইহুদিদের ওল্ডটেস্টামেন্ট, খ্রিস্টানদের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট, মুসলমানদের কোরান ও হাদিস) যেসকল সদাচার-ধর্মাচারের সুনির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট বয়ান দিয়েছে, সেটাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল উৎস। প্রতিটি ধর্মই কর্তৃত্ববাদ বা প্রভুত্ববাদ (Authoritarianism)-এর পরিচায়ক। এক ধর্মের সাথে আরেক ধর্মের এই যে এতো মতভেদ-বিভেদ বিদ্যমান, এগুলোকে মনীষী রাহুল সাংকৃত্যায়ণের ভাষায় চিহ্নিত করা যায় এভাবে:[২]

> "একজন যদি পুবমুখো হয়ে পূজার বিধান দেয় তো অন্যজন পশ্চিমে। একজন মাথার চুল বড়ো রাখতে বলে তো অন্যজন দাড়ি। একজন গোঁফ রাখার পক্ষে তো অন্যজন বিপক্ষে। একজন পশুর কণ্ঠনালী কাটার নিয়মের কথা বলে তো অন্যজন মুণ্ডচ্ছেদ করতে বলে। একজন জামার গলা ডানদিকে রাখে তো অন্যজন বাঁ-দিকে। একজনের যদি এঁটোকাঁটার বাছ বিচার না থাকে তো অন্য জনের নিজের জাতের মধ্যেও তেরো হাড়ি। একজন পৃথিবীতে শুধু খোদার নাম ছাড়া আর কিছু থাকতে দিতে রাজি নয় তো আর-একজনের দেবতার সংখ্যা অগণিত। একজন গো-রক্ষার জন্য জান দিতে রাজি তো অন্য জনের কাছে গো কোরবানি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।"

২. রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, তোমার ক্ষয়, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০।

‘বাংলাদেশের সক্রেটিস’ হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ তার বিখ্যাত প্রবচনগুচ্ছে বলেছিলেন: [৩]

“হিন্দুরা মূর্তিপূজারী; মুসলমানরা ভাবমূর্তিপূজারী। মূর্তিপূজা নির্বুদ্ধিতা; আর ভাবমূর্তিপূজা ভয়াবহ।”

অধ্যাপক আজাদ মুসলমানদের ভাবমূর্তিপূজারী হিসেবে অভিহিত করলেও আরো অনেক আগেই আরবের (উত্তর সিরিয়া) অন্ধকবি আবু-আল-আলা আল মারি (৯৭৩-১০৫৭) তাঁর ‘লুজুমিয়াত’ কাব্যে মুসলমানদের হজের সময় কাবা শরিফকে বাঁ দিকে রেখে ডাইনে থেকে বাঁয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, কালো পাথরে চুম্বন বা মাথা নোয়ানো, সাফা-মারওয়া পর্বতের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করা, মিনাতে ‘শয়তান’ লক্ষ্য করে পাথর মারা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে মুসলমানদের ‘পৌত্তলিক ভ্রমণ’ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।[৪] ধর্ম কিংবা ধর্মবাদীদের কাছে একজন ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতার মূল্য অত্যন্ত গৌণ; গুরুতর গর্হিত কাজ! গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা তো ধর্মবাদীদের কাছে ঈশ্বর দ্রোহের সমতুল্য! আজকের যুগেও স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় কতিপয় প্রাগৈতিহাসিককালের ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে বসে থাকা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-পুরোহিত দ্বারা! ধার্মীকেরাই একজন সাধারণ ব্যক্তির নিজস্ব বোধ-অনুভূতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত। কোনো ব্যক্তির জন্মের পর তার নাম কী হবে, কী কাপড় পরবে, কাপড় কতটুকু লম্বা হবে, গোড়ালির উপর উঠবে কি উঠবে না, মাথায় টুপি না টিকি দিবে, গরুর মাংস খাবে না শূকরের মাংস খাবে, কাকে বিয়ে করবে, কীভাবে করবে কোন জাত কোন গোত্র কোন বর্ণের সাথে আত্মীয়তা হবে, তার সন্তানকে মসজিদ-মাদ্রাসা না মন্দিরে পাঠাবে, সে মারা গেলে সৎকার কীভাবে হবে, কবরে শোয়ানো

৩. হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২২।

৪. Ali Dasti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, London, 1985, Page 94; the internet version of English translation can be read at: http://ali-dasti-23-years.tripod.com এবং Ibn Warraq, Why I am not a Muslim, Prometheus Books, New York, U.S.A., 1995, Page 35.

হবে না আগুনে পোড়ানো হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যই ধর্মবাদীদের কাছে একমাত্র অনুসরণ ও অনুকরণের বিষয়; এর বাইরে কোনো ভিন্নমত কোনোভাবেই বরদাস্ত যোগ্য নয়।

ঈশ্বরের নরাত্বরোপ (Anthropomorphism)

ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করলে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে এক প্রবল প্রতাপশালী রাজার মূর্তিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। ধর্মগ্রন্থে বর্ণীত 'ঈশ্বর' রাগ করেন, হিংসা করেন, তোষামোদে খুশি হন, তিনি ভালোবাসেন যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন আর যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না তাদের শাস্তি দেন। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি 'হীরক রাজার দেশে'র রাজা যেমন জোর করে হলেও প্রজাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনুগত্য আদায় করতে চান, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরও তেমনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নিরঙ্কুষ আনুগত্য চান। সম্রাট যেমন প্রজাদের আনুগত্যহীনতায় রুষ্ঠ, ব্যথিত এবং অসন্তুষ্ট হন, ঈশ্বরও তেমনি ধর্মদ্রোহিতায় এবং ঈশ্বরদ্রোহিতায় ক্ষেপে ওঠেন। সম্রাটের যেমন থাকে কারাগার কিংবা রাজদ্রোহীকে শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা, ঈশ্বরও তেমনি নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তৈরি করে রেখেছেন নরক। সেখানে রয়েছে ধর্মদ্রোহীদের পুড়িয়ে অত্যাচার করার নানা বন্দোবস্ত। এগুলো সবই আসলে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নরাত্বরোপের নানা প্রমাণ। George Carlin চমৎকারভাবেই বলেছেন:[৫]

Religion has actually convinced people that there's an invisible man ─ living in the sky ─ who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever 'till the end of time … But He loves you!

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ তৈরি করেছেন। কথাটা আসলে ঘুরিয়ে বলা উচিৎ, মানুষই আপন চিন্তার মাধুরী মিশিয়ে ঈশ্বরকে নির্মাণ করেছিলো। মানুষ নিজের কল্পনায় একসময় ঈশ্বরকে গড়েছিল বলেই তার প্রকাশ হয়েছে এক ক্ষমতাধারী মানুষের বৈশিষ্টসম্পন্নভাবে।

---

৫. Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, 2006, page 279.

আজ থেকে অনেক আগে রোমান দার্শনিক-রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত লুসিয়াস আনায়েউস সেনেকা (৪ খ্রিস্টপূর্ব-৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন এভাবে: "সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম সত্য বলে বিবেচিত, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যে আর শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা ফায়দা লুটবার হাতিয়ার।"

লক্ষ্য করুন, সেনেকার এই বক্তব্য এখনো কতোটা প্রাসঙ্গিক! শুধু রোমান সম্রাট কেন, আমাদের প্রাচীন ভারতের লোকায়ত দার্শনিক চার্বাকবাদীরা প্রকাশ্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা প্রচারিত ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক-আত্মা-পাপ-পূন্য-যজ্ঞ ইত্যাদির বিরোধিতা করে বলতেন:[৬]

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥"

অর্থাৎ

"স্বর্গ বলে কিছু নেই; অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়।
বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।"

তারা আরো বলতেন : "যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ, তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্নাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা; চোরেরাই মাংস খাবার মতলবে যজ্ঞে পশুবলির বিধান দিয়েছেন; ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসেবেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে (শ্রাদ্ধাদি) প্রেতকার্য বিহিত হয়েছে। তাছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা নেই। যারা তিন বেদ রচনা করছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র।" বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ সম্পর্কে চার্বাকবাদীদের এরকম চাঁছাছোলা সমালোচনার কারণেই আমরা রামায়ণ-মহাভারতে পাই চার্বাকদের 'রাক্ষস', 'দুর্বৃত্ত', 'কূটকৌশলী' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করার কথা; তাদের বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, চার্বাকবাদীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয়-সমালোচনাকে কি নির্দয়ভাবে দলন, দমন পেষণ করে আসছে। এখানে ঈশ্বরের মিষ্টি মিষ্টি কথা কোনো কাজে আসে না। রোমান সম্রাট সেনেকার বক্তব্য থেকে আরো স্পষ্টভাবে খোলাখুলি

৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

বলেছেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের গুরু ভীষ্ম; তিনি বলেন:[৭] *“রাজাদের পক্ষে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানই লোকসাধারণকে বশীভূত রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়। রাজদণ্ডের প্রভাবেই পৃথিবীতে ধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছে। রাজার দণ্ডনীতি না থাকলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম এক কালে বিনষ্ট হয়ে যায়। রাজধর্মের প্রাদুর্ভাব না থাকলে কোনো মানুষই নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা রাখে না।”* (মহাভারতের শান্তিপর্ব,১২/৫৮-৫৯, ১২/৬৩)।

রাজদণ্ডের সাথে ধর্মপ্রচারের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। যে সকল ধর্ম কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে অর্থাৎ ধর্মবাদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ণ ঘটেছে, কিংবা রাষ্ট্র (শাসক গোষ্ঠী) কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তারাই আজ প্রবল বিক্রমে বেঁচে রয়েছে। আর যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে পারেনি তাদের ইতিহাস বা বর্তমান অবস্থা জানতে আজ আমাদের মিউজিয়ামে যেতে হয়! আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখানে সংক্ষেপে হিন্দু ধর্মবাদীদের ক্ষমতায়ণের ধারাটি নিয়ে আলোচনা করবো। হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক আর্যরা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পনেরশো শতাব্দীর দিকেই ইরান-আফগানিস্তান অঞ্চল থেকে ভারতীয় অঞ্চলে আসেন এবং আস্তে আস্তে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী ভূমিপুত্র অনার্যদের (শূদ্র) হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে শুরু করেন এবং একসময় তারা সফলও হন। তারা প্রচার করতে শুরু করেন বেদভিত্তিক বৈদিক ধর্ম। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে সম্রাট অশোক (২৬৪-২৩৮ খ্রিস্টপূর্ব) রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি ঘটালে, বৈদিক ধর্মের সাথে তীব্র দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। মৌর্য বংশের পতন, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সুঙ্গ বংশের অভ্যুত্থান এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী সাতবাহন এবং গুপ্ত রাজাদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন-পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ত্বরান্বিত হয়। এরপর নানা সময়ে সেনরাজারা তাদের ধর্মের গাছে জল-সার দিয়ে হিন্দুধর্মের চাষাবাদ করেছেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্রশক্তি পুনরায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী আফগান-তুর্কিদের হাতে চলে যায় তখন আবার হিন্দু ধর্মটি অস্তিত্বের সংকট ভোগতে শুরু করে। পরে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে মুসলমানদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে কিছুটা হলেও প্রাণশক্তি ফিরে পায় ব্রাহ্মণ্যবাদের দোসর এই ধর্ম। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতে প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষভাবে সুবিধা পেয়ে চলছে হিন্দু ধর্মটি!

---

৭ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্মের ভবিষ্যৎ*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১০।

ধর্ম আর ধর্মবাদীদের কাজ-কারবার নিয়ে 'মানবজাতির বিবেক' বলে পরিচিত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দার্শনিক ভলতেয়ার বলেন : 'The first clergyman was the first sly rogue that met the first fool..., অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম পুরোহিত বা মোল্লা ব্যক্তিটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ধূর্ত বাটপাড়, যার মোলাকাত হয়েছিল প্রথম বোকা-নিবোর্ধ ব্যক্তিটির সঙ্গে; বাটপাড় ব্যক্তিটি নির্বোধ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে-পাড়িয়ে নিজের অনুগত প্রথম ভক্ত বানিয়ে ফেলে। ক্রমে পুরোহিত তথা ধর্মযাজকেরা নতুন নতুন সুযোগ বুঝলো–সৃষ্টি হল পুরোহিততন্ত্র (Priestcraft); তারা সহজ সরল মানুষের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা ও ডিভিনিটি দাবি করলো। তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো আর সঙ্গে সঙ্গে তারা উৎপাদনশ্রম থেকে রেহাই পেল। পুরুষ মৌমাছি (Drone) মধুমক্ষিকার মতো তারা সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদে শুয়ে-বসে ভোগ করতে লাগলো। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, দুর্বলতা, বিশ্বাসপ্রবণতা, সরলতা ইত্যাদিকে হাতিয়ার করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যুগে যুগে অনাচার, রক্তপাত, ডাইনি শিকার, শোষণ, নিপীড়ণ প্রভৃতির মহড়া চালিয়ে আসছে তথাকথিত ডিভিনিটির দাবিদার ডিভিন পুরোহিতেরা।" [৮] খ্রিস্টধর্ম, পুরোহিত শ্রেণী ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে লক্ষ্য করে ভলতেয়ারের একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল এরকম, "এই কুখ্যাত বস্তুটাকে গুড়িয়ে দাও!" (Crush the Infamy!) শুধু ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারই নয় পৃথিবীর অনেক দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনীষী, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগন যুক্তিসঙ্গত কারণে চাঁছাছোলা ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করেছেন। ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের এক তাত্ত্বিক নেতা Baran D Holbach (১৭২৩-১৭৮৯) বলেছিলেন:

> 'We find in all the religions of the earth, 'a God of armies', 'a jealous God', 'an avenging God', 'a destroying God', 'a God who is pleased with Carnage'... ..."।

---

৮. শফিকুর রহমান, *পার্থিব জগৎ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১২৭।

জ্ঞানবাদী আন্দোলনের অসীম সাহসী নেতা ও পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ডেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) মনে করতেন, "ধর্মের প্রতি যেকোনো ধরনের সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষেরই নামান্তর।" (দ্রষ্টব্য: ধর্মের ভবিষ্যৎ,পৃষ্ঠা ১৬১)। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির দিশারী-বস্তুবাদী দার্শনিক মনীষী কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ইউরোপের ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) আইনের দর্শনের পর্যালোচনার ভূমিকাতে বলেন:[৯]

> "ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন আত্মবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম। মানুষের মায়াময় সুখ হিসেবে ধর্মকে লোপ করাটা হল মানুষের প্রকৃত সুখের দাবি করা।"

'ঈশ্বর মৃত' (God is dead) ঘোষণাকারী হিসেবে খ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রাহিড্রিশ ভিল্হেল্ম নীটশে (১৮৪৪-১৯০০) বলেন: "যারই ধমনীতে ধর্মতাত্ত্বিকের রক্ত আছে তিনি একেবারে প্রথম থেকেই সবকিছুর প্রতি ভ্রান্ত ও অসৎ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।... ধর্মতাত্ত্বিক যাকে সত্য বলে মনে করেন তা অবশ্যই মিথ্যা; এটিই সত্যতা নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি।" এলবার্ট হিউবার্ট (১৮৫৯-১৯১৫) বলেন: "ধর্মতত্ত্ব হলো কিছু লোকের একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা, যে বিষয়টি তাঁরা বোঝেন না। সত্য কথা বলা ধর্মতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্য নয়, ধর্মানুসারীদের খুশী করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।" (দ্রষ্টব্য: পার্থিব জগৎ,পৃষ্ঠা ১৭)।

আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) তাঁর 'The Rebel' গ্রন্থে বলেন : 'One must learn to live and to die and in order to be a man, to refuse to be a God' (অর্থাৎ একজনকে বাঁচা এবং মরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মানুষের মতো বাঁচতে হলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হবে।) ভারতীয় বস্তুবাদী পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ (১৮৯৩-১৯৬৩) 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' সম্পর্কে বলেন:

৯.কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

"অজ্ঞানতার অপর নাম ঈশ্বর। আমরা আমাদের অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই এবং তার জন্য বেশ ভারী গোছের একটা নামের আড়ালে আত্মগোপন করি। সেই ভারী গোছের আড়ালটির নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশ্বাসের আরও একটি কারণ হল বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অপারগতা ও অসহায়ত্ব। ...অজ্ঞানতা আর অসহায়ত্ব ছাড়া আর কোনো কারণ যদি ঈশ্বর বিশ্বাসের পিছনে থেকে থাকে তা হল ধনী ও ধূর্ত লোকদের নিজ স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস। সমাজে চলতে থাকা সহস্র অন্যায় অবিচারকে বৈধতা দেবার জন্য তারা ঈশ্বরের অজুহাতকে সামনে এনে রেখেছে। ...ঈশ্বর বিশ্বাস এবং একটি সহজ সরল ছোট শিশুর নিজস্ব বিশ্বাস, বস্তুত একই।" (দ্রষ্টব্য : তোমার ক্ষয়,পৃষ্ঠা ৩৫)।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, এ প্রবন্ধের শিরোনাম 'বোকার স্বর্গ'। 'বোকার স্বর্গ' বলতে বোঝানো হচ্ছে শুধু 'ধর্ম' নামক ব্যবস্থাকে যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বর/আল্লাহ/ভগবান ইত্যাদি ধারণা এবং উপাসনার নিয়ম-নীতি, রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ইত্যাদি। ধর্ম নামক সিস্টেমটি সমাজের জন্য মঙ্গলময়, কল্যাণকর ইত্যাদি মিথ্যে ধারণার খোলস খোলসা করে দেওয়ার জন্যই 'বোকার স্বর্গ' নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম নামক ব্যবস্থার কারণেই মানুষ কি রকম নির্বিবেক, অপরিণামদর্শী, অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যায় তার ভুড়িভুড়ি প্রমাণ ইতিহাসে যেমন আছে তেমনি আমাদের চোখের সামনেও ঘটে চলছে সুদীর্ঘকাল ধরেই। খ্রিস্টানরা চতুর্থ শতাব্দীর দিকে প্রাচীন প্যাগান (Pagan) জার্মানদের 'সভ্য' করার নামে, ধর্ম প্রচারের নামে গণহত্যা চালিয়েছিল বিভৎস পন্থায়। ঐ সময় কোনো কোনো প্যাগান জার্মান গোষ্ঠী ওক গাছের পূজা করতো। ওক গাছ যদি সভ্য হওয়া জার্মানদের পুরানো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, আবার তাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলে, সেজন্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রোমান সৈন্যরা জার্মানিতে প্যাগানদের হত্যা করার পাশাপাশি ওক গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছিল! ধর্ম নামক ব্যবস্থা বলবৎ থাকার কারণে কিংবা ধর্মে বিশ্বাস রাখার কারণেই শিক্ষিত, বিদ্যান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী হিন্দুরা নিজেদের শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান তালাবদ্ধ রেখে সর্পদেবী মনসার পূজা করেন,

গঙ্গাদেবী নদীর পূজা করেন, গরুর পূজা করেন, গরুর মলমূত্র দিয়ে নিজেদের শরীর সহ ঘরবাড়ি পবিত্র করেন, বাঁদরের (হনুমান) পূজা করেন!

মুসলিমরা অন্য ধর্মের উপাসনার রীতিনীতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা-সমালোচনা করলেও নিজেদের বোধবুদ্ধি, জ্ঞানকে 'বগলদাবা' করে কোরানের বাণী অনুসরণ করে পরম পুণ্যের কাজ ভেবে প্রতি বছর মক্কায় হজের সময় কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে সাতবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করেন, বহু শতাব্দী প্রাচীন 'হাজর-উল-আসওয়াদ' বা কালো পাথরে আধ্যাত্মিক উল্লাস লাভের জন্য চুমো খান। হাজিদের কাছে এ-তো শুধু পাথরে চুমু খাওয়া নয়, নবি মুহাম্মদের হস্ত মুবারকেই চুমু খাওয়া! যদিও খলিফা ওমর (রাঃ) একদা কাবা ঘরের ঐ কালো পাথরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

> "আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া কিছুই নও, মানুষকে সাহায্য করা বা ক্ষতি করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি আল্লাহর রসুলকে না দেখতাম তোমায় চুম্বন করতে, আমি তোমাকে কখনো চুম্বন করতাম না; বরং কাবাঘর হতে বহিষ্কৃত করে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করতাম।" [১০]

ইসলাম কি পৌত্তলিকতা মুক্ত?

মুসলমানগণ দাবি করেন যে, ইসলাম পৌত্তলিক রীতিনীতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত। কিন্তু দাবিটি সত্য নয়। কোরানের বিভিন্ন সুরায় চন্দ্র, সূর্য, গোধুলী আর নক্ষত্রের নামে (সুরা ১১৩, ফালাক, আয়াত ১; সুরা ৮৪, ইনশিকাক্, আয়াত ১৬-১৯ ইত্যাদি), ডুমুর, জলপাই, সিনাই পর্বত, নিরাপদ নগরী (সুরা ৯৫, ত্বীন, আয়াত ১-৩), কিয়ামত, আত্মা (সুরা ৭৫, কিয়ামা, আয়াত ১-২), বাতাস (সুরা ৭৭, মুরসালাত, আয়াত ১), ফেরেশতাদের (সুরা ৭৯, নাজিআত, আয়াত ১-৫), তুর পাহাড়, উন্মুক্ত পত্র, সমুচ্চ আকাশ, উত্তাল সাগর (সুরা ৫২, তুর, আয়াত ১-৬), দ্রুতগামী ঘোড়ার (সুরা ১০০, আদিয়াত, আয়াত ১-৫) শপথ করা হয়েছে। জড় পদার্থ এবং নানা জীবজন্তুর নামে শপথ নেওয়া প্যাগান পূজা অর্চনা-রীতির অনুসরণ। এগুলোতে কোরান-

১০. Benjamin Walker, *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, Rupa & Co, New Delhi, India, 2002, Page 39. বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪১। এবং আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৬।

রচিয়তা স্পষ্টই নিজেদের ‘প্যাগান’ ঐতিহ্য-রীতিনীতিকে লুকাতে পারেন নি। ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হবার অনেক আগে থেকে আরবের প্যাগান উপজাতীয়রা-অগ্নিপূজারীরা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, পর্বতের নামে শপথ গ্রহণ করতেন, পূজা করতেন। কাবা ঘরের কালো পাথরের চারিদিকে সাতবার করে ঘুরতেন। প্যাগানদের এই পৌত্তলিক রীতি অব্যাহত রাখার নির্দেশ রয়েছে কোরান শরিফে (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১৫৮):

> নিশ্চয়ই দুটি পাহাড় *সাফা* ও *মারওয়া* আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে আল্লাহ্‌র ঘরে হজ বা ওমরা করে, তার জন্য এই দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোনো পাপ নেই। আর যে-ব্যক্তি ইচ্ছা ক’রে কোনো ভালো কাজ করে, আল্লাহ্ তাকে পুরস্কার দেন আর তিনি তো সব জানেন।

কোরানের আয়াতে প্যাগান দেবী লাত ও ওজ্জার নাম রয়েছে, (সুরা ৫৩, নজ্‌ম, আয়াত ১৯-২০)।

ধর্মের ইতিহাস বলে, একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো সংগঠিত এবং বিকশিত হওয়ার পূর্বে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রাক-ধর্মীয় ‘টোটেম-প্রথা’ (Totemism) অনুসরণ করতো। টোটেম মানে সাধারণভাবে বিশেষ প্রজাতির প্রাণী; তবে বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং জড়বস্তুকেও টোটেম হিসেবে পূজা করা হয়; যেমন হিন্দুরা নির্দিষ্ট ধরনের কালো রঙের পাথরকে ‘শিবলিঙ্গ’ মনে করে পূজা করেন। ইসলামপূর্ব আরবে সার্বিয়েনরা ছিলেন নক্ষত্র পূজারী, হিমিয়ারবাসীরা সূর্যের উপাসক, আসাদ ও কিয়ানা গোত্রের লোকেরা ‘আল্লাত’ দেবী হিসেবে চন্দ্রের, ‘মানাত’ দেবী হিসেবে ভেনাসের (শুক্র গ্রহ) ও ‘উজ্জা’ দেবী হিসেবে সাইরিয়াসের (লুব্ধক নক্ষত্র) পূজা করতেন। কোরানের সুরা নজমে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ সাইরিয়াসের প্রভু’ (সুরা ৫৩, নজ্‌ম, আয়াত ৪৯)। আবার কোরানে অনেকগুলি সুরার নামকরণ হয়েছে প্যাগান দেব-দেবীর নামে, যেমন: সুরা ৮৬ ‘তারিকা’ নক্ষত্র দেবতার নাম, সুরা ১১০ ‘নসর’ প্রাচীন আরব্যগোষ্ঠী হিমিয়ারদের দেবতার নাম, সুরা ৯১ ‘শামস্’ মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় ব্যাপকভাবে পূজিত সৌরদেবীর নাম। ইসলামপূর্ব আরবেও কাবা ঘরের এই পাথরকে পবিত্র মনে করে পূজা করা হতো। বর্তমানে হাজিদের কাবা শরিফে তাওয়াফের সময় পাথরে চুম্বন করা টোটেম-প্রথারই রূপান্তর মাত্র। আরবের বিখ্যাত কবি আবু-আল-আলা আল মারি ‘হজ্জ’কে সেজন্য ‘পৌত্তলিক ভ্রমণ’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। হজের সময় হাজিরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন, সাদা কাপড় (ইহরাম) পরিধান করেন, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন, মিনাতে কংক্রিটের তিনটি স্তম্ভকে ‘শয়তান’ বানিয়ে সাতবার করে মোট একুশটি ঢিল ছোঁড়েন। সেই ঢিলে আহত হয়ে এতোদিনে শয়তান মারা গিয়েছে কি-না জানা যায়নি, তবে শয়তানকে মারতে গিয়ে নিজেদের প্রচন্ড অন্ধবিশ্বাস আর আবেগের আতিশয্যে পদপিষ্ট হয়ে নিরীহ হাজিরা প্রায়শই মারা যান। ২০০৫ সালে ‘শয়তান’কে পাথর মারতে গিয়ে

অর্ধশতাধিক বাংলাদেশিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তিনশতাধিক হাজি মারা গেছেন। হজ্জ ছাড়াও পশু কোরবানি প্রথার মূলে রয়েছে মানুষের টোটেম-প্রথার অনুসরণ। হাদিসে মুহাম্মদের (দঃ) পৌত্তলিক উপাসনার নানা প্রমাণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, রসুল মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, তিনি প্যাগান দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে কোরবানি করা পশুর মাংস বালদাহ্ নামক স্থানে জায়েদ বিন আমর বিন নওফল এর জন্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু জায়েদ বিন আমর সে খাদ্য খেতে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন একমাত্র আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো প্যাগান ঈশ্বরের নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস আমি খাই না। (দ্রষ্টব্যঃ বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৭, নম্বর ৪০৭)। মুহাম্মদ (দঃ) আরব প্যাগানদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলেও প্যাগানদের রীতি অনুসরণ করে হজের সময় নিজে কালো পাথরে চুমু খেতেন। (দ্রষ্টব্যঃ বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ২৬, নম্বর ৬৭৩, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৯, ৬৮০)।[১১] কোরানে আরো বলা হয়েছেঃ "(বলো, আমি আশ্রয় চাইছি) সেসব নারীর অমঙ্গল হতে যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে।" ইংরেজিতে : (Say, I seek refuge) from the evil of the witchcrafts when they blow in the knots.' (সুরা ১১৩, ফালাক, আয়াত ৪)। জাদুটোনা, বাণমারা বা বশীকরণ ইত্যাদি আরব পৌত্তলিকদের 'সর্বপ্রাণবাদী' উপাসনার অংশ; যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। হজরত আয়েশা হতে বর্ণিত হাদিসে আছে, মুহাম্মদ (দঃ) একসময় বিশ্বাস করতেন তাঁকে জাদু করা হয়েছে। তিনি নিজে যা করেন নি, ধরে নিতেন (জাদুর প্রভাবে) সেটা তিনি করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৭১, নম্বর ৬৫৮, ৬৬০, ৬৬১)। আরবের প্যাগান বা বহুঈশ্বরবাদীরা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে পূজা করতেন তাদের ঈশ্বরের প্রকাশ বলে, কোনো কোনো উপজাতীয়রা একে পৃথিবী ধ্বংসের আলামত হিসেবে বিবেচনা করতেন। কেউ কেউ একে মানুষের জীবন-মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রচার করতেন। বহু ধর্মেই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনি বা মিথ (Myth) প্রচলিত রয়েছে। মুহাম্মদ (দঃ) চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে বলতেন আল্লাহর প্রকাশ, আল্লাহর ভয় দেখানো, শেষ বিচারের দিনের লক্ষণ, তাই বলেছেন এই সময়ে আল্লাহর কাছে কৃতকর্মের জন্য মাফ চাইতে, দুই রাকাত নামাজ পড়তে যতক্ষণ না গ্রহণ শেষ হয়।' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ১৮, নম্বর ১৬৬-১৭০)। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক কারণে ঘটে, এতে ঈশ্বরের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। প্রযুক্তির কল্যাণে এখন মানুষ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

হিন্দুরা প্রতি বছর দুর্গা পূজা কালী পূজাতে মহাধূমধামের সাথে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন এবং বেশিদিন আগের কথা নয়, বৃটিশ রাজত্বেই এই অঞ্চলে হিন্দু রাজা-জমিদারেরা এই দুই পূজাতে আয়োজন করে নরবলি দিতেন! বর্তমানে নরবলি দেওয়ার প্রথা রহিত হয়ে গেলেও পূজা উপলক্ষে পাঠা বলি দেওয়া বেশ প্রচলিত। ইহুদি-খ্রিস্টান-ইসলামের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়,

[১১] Sam Shamoun, *Muhammad and Idolatry*, The internet version can be read at: http://www.answering-islam.org/Shamoun/idolatry.htm.

আব্রাহাম বা ইব্রাহিম একটি স্বপ্ন দেখেই নিজের সন্তানকে কোরবানি দিতে নিয়ে যান, তবে শেষমেশ ঐশীবাণী পেয়ে সন্তানকে কোরবানি না দিয়ে একটি দুম্বাকে কোরবানি দেন! আব্রাহামের এই বাণী বা কর্মকে বিশ্বাস করে সারা বিশ্বের মুসলমানরা (ইহুদি-খ্রিস্টানরা এই প্রথা অনুসরণ করেন না) প্রতি বছর কোরবানির ঈদে লক্ষ লক্ষ নিরীহ পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন। এতে তাদের বিন্দুমাত্র চিত্তবিচলিত হয় না, মনে কোনো সংশয় জাগে না; এ অপচয়-বাহুল্য ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। বাংলাদেশের অন্যতম লোকায়ত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর এ নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন:[১২]

কতো সাধারণ প্রশ্ন অথচ কী তার গভীরতা। নৃতত্ত্ববিদ Robertson Smith তাঁর Religion of The Semites গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পশু কোরবানি প্রথার মূলে রয়েছে মানুষের টোটেম-প্রথার অনুসরণ। বিশেষ অনুষ্ঠানে বা উৎসবে টোটেম প্রাণীকে হত্যা করে তাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করার রীতি বিভিন্ন ধর্মে বেশ প্রচলন রয়েছে। প্রাক ইসলামি আরব-সমাজেও পশু ও মানুষ কোরবানির ব্যাপক প্রচলন ছিল; কিন্তু সমাজ বিকাশের সাথে-সাথে এবং সামাজিক প্রয়োজনে 'মানুষ' কোরবানির রীতি ধীরে ধীরে রহিত হয়ে গেছে কিন্তু আদিম সংস্কৃতির কিছু

'কোরবানি প্রথার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?... বর্তমান কোরবানি প্রথায় পশুর কোনো সম্মতি থাকে কি? একাধিক লোকে যখন একটি পশুকে চাপিয়া ধরিয়া জবেহ করেন, তখন সে দৃশ্যটি বীভৎস বা জঘন্য নয় কি? মনে করা যাক, মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এক অসুর জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহারা পুণ্যার্থে মহেশ্বর নামক এক দেবতার নামে জোরপূর্বক মানুষ বলি দিতে আরম্ভ করিল। তখন অসুরের খাঁড়ার (ছুরির) নিচে থাকিয়া মানুষ কী কামনা করিবে? "মহেশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অসুর জাতি ধ্বংস হউক, অন্ধ বিশ্বাস দূর হউক" ইহাই বলিবে না কি? ... কোরবানি প্রথায় দেখা যায় যে, কোরবানি পশুর হয় 'আত্মত্যাগ' এবং কোরবানিদাতার হয় 'সামান্য স্বার্থত্যাগ'। দাতা যে মূল্যে পশু খরিদ করেন, তাহাও সম্পূর্ণ ত্যাগ নহে। কেননা মাংসাকারে তাহার অধিকাংশই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সামান্যই হয় দান।... বলির পশুর আত্মোৎসর্গ না মাংসোৎর্গ? মাংস তো আহার করি এবং আত্মা তো ঐশ্বরিক দান। উৎসর্গ করা হইল কী' ?

---

[১২] আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৫, ২৫৭।

কিছু অবশেষ যেমন পশু কোরবানির প্রথা এখনো টিকে রয়েছে। Samuel M. Zwemer তাঁর The Influence of Animism on Islam: An account of Popular Superstitions গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন মুহাম্মদ একেশ্বরবাদের চর্চার অংশ হিসেবে ইসলাম ধর্ম তৈরি এবং প্রচার করলেও সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারেননি; তিনি সময় এবং পরিবেশ দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।[১৩] ইসলাম ধর্মের প্রচুর উপাদান যেমন নামাজ পড়ার রীতি সন্তান জন্মের পর আকিকা করা, শয়তান-ফেরেশতা-জীনের ধারণা, হজ্জ, কোরবানি ইত্যাদি সর্বপ্রাণবাদী (Animist) রীতি ইসলাম পূর্ব আরবে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এগুলো মুহাম্মদ দুহাতে ইসলামে আত্তীকরণ ঘটিয়েছেন; আবার কিছু কিছু বাদও দিয়েছেন। ইসলামপূর্ব আরবে সার্বিয়েনরা ছিল নক্ষত্র পূজারী, হিমিয়ারবাসীরা সূর্যের উপাসনাকারী, আসাদ ও কিয়ানা গোত্রের লোকেরা 'আল্লাত' দেবী হিসেবে চন্দ্রের, 'মানাত' দেবী হিসেবে ভেনাসের (শুক্র গ্রহ) ও 'উজ্জা' দেবী হিসেবে সাইরিয়াসের (লুব্ধক নক্ষত্র) পূজা করতো। কোরানে সুরা নজমে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সাইরিয়াসের প্রভু'। (দ্রষ্টব্য, সুরা নজম ৫৩, আয়াত ৪৯) কোরানের চ্যাপ্টার বা সুরার নামকরণও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর সংকলন করেছেন তাঁর খলিফা ও অন্যান্য অনুসারীরা। অনেকগুলি সুরার নামকরণ হয়েছে প্যাগান দেব-দেবীর নামে, যেমন: সুরা ৮৬ 'তারিকা' নক্ষত্র দেবতার নাম, সুরা ১১০ 'নসর' প্রাচীন আরব্যগোষ্ঠী হিমিয়ারদের দেবতার নাম, সুরা ৯১ 'শামস্' মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় ব্যাপকভাবে পূজিত সৌরদেবীর নাম।

আমরা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ হতে ঈশ্বরের যে রূপ দেখতে পাই তা একেবারে একজন সাধারণ মানুষের মতো। ঈশ্বর মানুষের মতো হাসেন, কাঁদেন, তোষামোদে খুশি হন, না করলে রাগ করেন, কষ্ট পান, পেছন থেকে আক্রমণ করেন, শত্রুকে খুন করেন, প্রতিশোধ নেন, চক্রান্ত করেন, গুণগ্রাহীদের প্রতিদান দেন, কর্জ ধার করেন, বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে ব্যবসা করেন, দল গঠন করেন, পক্ষপাতিত্ব করেন। রাজা যেমন প্রজাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আনুগত্য চান ঈশ্বরও তেমনই তার অনুসারীদের কাছ থেকে নিরঙ্কুষ আনুগত্য চান। আনুগত্যহীন প্রজাদের প্রতি রাজা যেমন রুষ্ট, ব্যথিত, অসন্তুষ্ট হন ঈশ্বরও তেমনি ঈশ্বরদ্রোহীতায় ক্ষেপে উঠেন। সম্রাটের যেমন

---

[১৩] Samuel M. Zwemer, F.R.G.S., *The Influence Of Animism On Islam: An Account Of Popular Superstitions*, the internet version can be read at: http://www.answering-islam.org/Books/Zwemer/Animism/index.htm

থাকে কারাগার, রাজদ্রোহীকে শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা, তেমনি ঈশ্বরও নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন নরক। সেখানে আছে ধর্মদ্রোহীদের অত্যাচার, টর্চার করার নানা বন্দোবস্ত। এগুলো সবই আসলে ঈশ্বরের ওপর 'নরাত্বরোপ' (Anthropomorphism) এর নানা প্রমাণ। মানুষের দ্বারা ঈশ্বর তৈরি করা হয়েছে বলেই ঈশ্বরের ওপর এমন 'নরাত্বরোপ' (anthropomorphism) করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী যদি ঈশ্বর তৈরি করতো তাহলে সেই ঈশ্বরের রূপটা কেমন হতো? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক কবি জেনোফিনিস (৫৭০-৪৮০ খৃষ্টপূর্ব)। তিনি বলেছিলেনঃ If oxen had hands and the capacities of men, they would make gods in the shape of oxen. অর্থাৎ ষাঁড়ের যদি মানুষের মতো হাত ও ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা দেব-দেবীর আকার, রূপ, চরিত্র, ষাঁড়ের মতো করেই তৈরি করতো।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের 'ধর্মীয়মূঢ়তা'কে উদ্দেশ্য করে রাশিয়ার চিঠিতে বলেছিলেনঃ 'যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারেনা, সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না কেন। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম 'বিষকন্যা'র মতো; আলিঙ্গঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতম মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।---ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভাল'।[১৪]

আমরা দেখেছি একটি সমাজের জনসাধারণের পক্ষে অর্থসম্পদজনিত সমস্যার সমাধান মোটেই অসম্ভব নয়। বর্তমানে পশ্চিমের অনেক দেশেই বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে; কিন্তু সমাজে ধর্মকর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, মারামারি, সংঘাতের সমাধান আদৌ লক্ষণীয় নয়; ধর্মগুলো বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। এক ধর্ম অন্য ধর্মকেই শুধু ঘৃণা করে না, নিজেদের মধ্যেও প্রচণ্ড ঝগড়া, ফ্যাসাদ, আগ্রাসন, হত্যা, হুমকি, উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান কেউই দাবি করতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতানৈক্য, দলাদলি, মারামারি নেই। ধর্মকে যতটা

---

[১৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, (সম্পাদনা করুণাসিন্ধু দাস), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৪২।

মানবিক হিসেবে প্রচার করা হয়, আসলে তা মোটেই নয়। ধর্মটা মনুষ্যত্বের নয় বরং স্বার্থের। ধর্ম মানুষের মাঝে একতা গড়ে তোলে না, আনে বিদ্বেষ; যা আসলে উগ্র, হিংস্র, জংলী আচরণে পর্যবসিত হয়। কোনো ধর্মই গণমানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখায়নি; শাসকগোষ্ঠীর তাবেদারি করা ছাড়া। 'মানব মুক্তি'র যে ধর্মীয় ফর্মুলা দেয়া হয়ে থাকে তা কল্পিত, পারলৌকিক, ইহজাগতিক নয়। তাই গরীব মানুষ আরো গরীব হয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি, কঠোরভাবে পালন ও অনুসরণ করে; আর ধনী আরো ধনী হয়–ভণ্ডামির মধ্যে লালিত হয়েও। ধর্মের বইয়ে বা ধর্মবাদীদের মুখে 'সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতি' শব্দ উচ্চারণ মানায় না। নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসার, আধিপত্য বিস্তার বা অন্যের সম্পদ দখলের লক্ষ্যে মানুষের মাঝে 'শ্রেষ্ট-নিকৃষ্ট' 'আশরাফ-আতরাফ' উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, শ্রেণীভেদ-জাতিভেদ, বৈষম্য-বিভাজন সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির বাণী উচ্চারণ করা চরম ভন্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে বলেই ধর্মবাদীরা মাঝে মাঝে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মিলে-মিশে থাকার কথা ঘোষণা করে, শান্তিবাদী হিসেবে নিজেদের দাবী করে, সেটা আসলে মস্ত বড় শুভঙ্করের ফাঁকি; কারণ জগতে ধর্মের নামে, এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই অগণিত, অসংখ্য মানুষ খুন করেছে এবং আজও সে ধারা অব্যাহত আছে। হাজার হাজার বছর ধরে টিকি, দাড়ি আর ক্রুশের বাড়াবাড়িতে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। ফলে ধর্ম আজ মানব-সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু বিধর্মী নয়, স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই এতো বিভেদ আর বিষ অন্তরে পোষণ করে একেকটা শান্তির ঝাণ্ডাধারী ধর্মগুলো।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্রাক্ষণ্যবাদীরা কোনো হিন্দু স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে 'সতী' বানাতো, ইংরেজ আমলে আইন করে এ ধর্মীয় বর্বর প্রথাকে রুখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কানের (Kane) 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' (আট খণ্ড) গ্রন্থের 'সতী' বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায়ে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে নারীর সতীত্ব (?) রক্ষার ধুয়া তুলে কেবলমাত্র বাংলোতেই (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) ২৩৬৬ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানানো হয়েছিল, যার মধ্যে কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। আর ১৮১৫

থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত বাংলোতে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানিয়েছিল ঠাকুর-পুরহিতের দল। এটা কি গণহত্যা নয়? এ কি জঘন্য-বর্বর ধর্মীয় রীতি নয়? বীভৎস ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে ফরাসী গণিতবিদ-দার্শনিক Pascal বলেছিলেন 'Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction'.

হিন্দু নারীরা কি স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ওঠে সহমরণে যেতেন? মোটেই তা নয়। ঐতিহাসিকগণ জানিয়েছেন কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্য বিধবা নারীকে উত্তেজক পানীয় পান করিয়ে কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে কিংবা অর্ধচেতন অবস্থায় স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হতো। এ বিষয়ে ভারতের অন্যতম মানবতাবাদী লেখক ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি:

> "সদ্যবিধবা নারী নববধূর মতো সাজে, তার শ্রেষ্ঠ পোষাক পরে, সিঁদুর, কাজল, ফুলমালা, চন্দন, আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সে চিতায় ওঠে, তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে, এইভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে সে বিভ্রান্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। যদি শেষ মুহূর্তে বিচলিত হয় এবং নীতিগত, দৃশ্যগতভাবে ছন্দপতন ঘটে তাই শুভাকাকাংখীরা তাকে উত্তেজক পানীয় পান করায়। এমন কি পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে ওঠে, পানীয়র নেশা কেটে যায়, তখন যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে পড়ে, 'সতী'র মহিমা ক্ষুণ্ণ হবার ভয় দেখা দেয় তখন সেই শুভাকাংখীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে যদি সে চিতা থেকে নেমে আসতে চায়। প্রতিবেশী পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় সাহায্য করতে চায়। তারা গান করে, ঢাক বাজায় এতো উচ্চ জয়ধ্বনি দেয় যে সতী যা কিছু বলতে চায় সবই উচ্চনাদে ঢেকে যায়।" [১৫]

বর্তমানকালের তথাকথিত 'মডারেট' হিন্দুরা স্বীকার করতে চাইবেন না, অথবা অনেকেই জানেন না তাদের ধর্মগ্রন্থে 'স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী হওয়ার' সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। প্রমাণ চাই তো, দেখুন ঋদবেগের দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ৭ নং ঋক (১০/১৮/৭): শ্লোকটির ইংরেজি হচ্ছে:

Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first

[১৫] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৪৭।

step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned. অথর্ববেদে রয়েছে,

"আমরা মৃতের বধু হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি।" (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, "মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে।" (৪:২৮)।

দক্ষ সংহিতার ৪:১৮-১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে; A sati who dies on the funeral pyre of her husband enjoys an eternal bliss in heaven. (যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়)। এই দক্ষ সংহিতার পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে,

"যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।" যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমনভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং সুখে থাকে।

ব্রহ্মপুরাণ বলে, "যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা।" (প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪০)। মহাভারতের মৌষল পর্বে আমরা দেখি, ভগবান কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর চার স্ত্রী রুক্মিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমন কি বসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিলেন। ব্যাসস্মৃতি বলছে, চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবে অথবা তার মস্তকমুণ্ডন করবেন। (২:৫৫)।

ষষ্ঠশতকের বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় বলেন, "অহো নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহ ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে।" (৭৪:২৩)।

এ কুযুক্তি শুধু বরাহমিহির কেন, আজকের একুশ শতকের কতিপয় পুরোহিত-ঠাকুর গর্বভরে ঘোষণা করেন, “নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়; এ হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট, ঐতিহ্য, মমত্ব, স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার দুর্লভ উদাহরণ।” ঠাকুর-পুরহিতের প্রচলিত ভণ্ডামিপূর্ণ বক্তব্যের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য; তিনি বলেন:

> “বৃহৎসংহিতার যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই মিথ্যার অবসান হওয়া উচিৎ। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীর চিতায় আত্মহত্যা করেনি? এ তো হতে পারে না যে আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হতো প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গেছেন। কিন্তু তা হয়নি, এ বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় বিধিও নেই। সুতরাং মূল ব্যাপার হল স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন; আর সতীদাহ এই আজীবন নাটকেরই পঞ্চমাংকের শেষ দৃশ্য।” (দ্রষ্টব্য: প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪৮)।[১৬]

হিন্দু ধর্মের বেদ-গীতা, মনুসংহিতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণপাচালি ইত্যাদির মধ্যে এতো জাতপাতের বৈষম্য, বর্ণভেদ, গোত্রবিভেদ, ধর্মভেদ, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা, নারীর প্রতি কুসংস্কার, বিরূপ ধারণা, ভয়, ঘৃণা, জংলী আইন-কানুন একই ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা করেও শূদ্র-বৈশ্যর প্রতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিভেদের বিপুল সমাহার আর সরব উপস্থিতি এবং চর্চা দেখেই হয়তো উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলে পরিচিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর

---

[১৬] আগ্রহীরা ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের বইটিসহ হিন্দুধর্মে নারী হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী জানতে আরো পড়ুন: Sita Agarwal, *Genocide of Women in Hinduism*.

অনুসারীরা Athenium নামক মাসিক পত্রিকায় সোচ্চারে ঘোষণা দিয়েছিলেন,[১৭] ‘If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism’.

ইহুদিরা অগণিত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে গলা কেটে হত্যা করেছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তা-তো ধর্মগ্রন্থেই লিখিত আছে; খ্রিস্টানরা স্বধর্মাবলম্বী-বিধর্মী অগণিত নারীদের ‘ডাইনি’ ঘোষণা দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত তৌরাত শরিফের Exodus -এর ২২:১৮ নং শ্লোকে সরাসরি বলা হয়েছে, Thou shalt not suffer a witch to live. (কোনো জাদুকারিণীকে বেঁচে থাকতে দেবে না।) (Good News Version: Put to death any woman who practices magic.) স্প্রেঙ্গার হিসাব দিয়েছেন, তৌরাতের এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে নব্বই লক্ষ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তিন থেকে চার বছরের শিশুরাও পর্যন্ত খ্রিস্টান মৌলবাদীদের নৃশংস ও বীভৎস কালো হাত থেকে রেহাই পায়নি। (দ্রষ্টব্য:-The Malleus Maleficarum (The Witch Hammer) of Heinrich Kramer and James Sprenger.) আসলে কেউ কোনদিন ভূতগ্রস্ত হয়নি, ভূত বলতে কোন জিনিষ কোন কালেই ছিলনা, আজও নেই। কুমারী(!) মাতা মেরির কোলে ছোট্ট, সুন্দর, শুভ্র, নিষ্পাপ যিশুর ছবি দ্বারা যেসব খ্রিস্টান মিশনারিজরা শান্তিবাদী-করুণাময় যিশুর রূপ তুলে ধরতে চান, তাদের গালে চপোটাঘাত করেছেন যিশু নিজেই:

> “আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এ কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসিনি বরং আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে।” (Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. "For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law..... (Matthew 10:34)

[১৭] সফিউদ্দিন আহমদ, *ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৮।

ব্লাসফেমির (ঈশ্বর নিন্দা) কারণে যে কোনো ব্যক্তিকেই পাথর ছুড়ে হত্যার নির্দেশ দেওয়া আছে এই তৌরাত শরিফের Leviticus (লেবীয়)-এর ২৪:১৬ নং শ্লোকে! বাইবেলের এসব নিষ্ঠুর, আগ্রাসী আয়াতের উপর নির্ভর করে যুগে যুগে কত যে স্বাধীন চিন্তাবিদ, লেখক, মুক্তচিন্তার অধিকারী ব্যক্তিকে নির্যাতন, বন্দীত্ব বরণ, অঙ্গচ্ছেদ, আগুনের ছেঁকা ইত্যাদির শিকার হতে হয়েছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই।[১৮] এমন কি, যে ইহুদিরা একসময় খ্রিস্টানদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই ইহুদিরাও খ্রিস্টানদের হাতে কম নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। খ্রিস্টানদের অত্যাচার, নির্যাতনের ভয়ে ইহুদিদের যাযাবরের জীবন বেছে নিতে হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে পোপ প্রথম লিও বাইবেল সম্পর্কে ভিন্নমতপোষণকারী স্বাধীন চিন্তাবিদদের ধরে এনে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। নবম শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এক লক্ষ ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করে; দুই লক্ষ লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ফ্রান্সের আবেলার পীয়রকে (১০৭৯-১১৪২) ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়, তার সব রচনা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফ্লোরেন্সের স্যা ভোনা রোলা (১৪৫২-১৪৯৮) খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, গির্জার সংস্কার দাবি করেছিলেন; এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারের মধ্যে যাতা কাঁধে তুলে দিয়ে পৈশাচিক পন্থায় নির্যাতন চালানো হয়। স্পেনের মনীষী মাইকেল সারভেন্টাস খ্রিস্টানদের 'ট্রিনিটী' Trinity অস্বীকার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্রের অবিনশ্বরত্বকে অবিশ্বাস করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে খোঁটায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। যাজকতন্ত্রের নিন্দা করায় আলেকজান্ডার লেটনকে (১৫৬৮-১৬৪৯) বেত্রাঘাত করা হয়, তাঁর নাক-কান কেটে ফেলা হয়। খ্রিস্টান পোপ নবম গ্রেগরি ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয়-বিরুদ্ধবাদীদের (বাইবেল সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণকারী) খুঁজে বের করে তাদের ফাঁসিতে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে হত্যার জন্য 'ইনকুইজিশন' বা ধর্মীয় বিচার সভার প্রবর্তন করেন। এই ইনকুইজিশনের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মবিরোধী যে কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওরদানো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) ধর্মান্ধদের হাত থেকে বাঁচতে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে পালিয়ে বেড়াতে হয়। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে ধর্মান্ধের দল। বৃদ্ধ গ্যালিলিও গ্যালিলিকে

---

[১৮] ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক, মানবাধিকার-বিরোধী, নারী-বিদ্বেষী বক্তব্য জানতে পড়ুন: *The Dark Bible,* Compiled by Jim Walker; the internet version can be read at : http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm

অত্যাচারের শিকার হতে হয়, তাকে গির্জার সামনে নতজানু হয়ে পাদ্রীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। দার্শনিক স্পিনোজাকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমস্টারডামের সিন্যাগগ (ইহুদিদের ধর্মমন্দির) সমাজচ্যুত করে, নির্বাসন দেয়। বার্থোলোমিউ লির্গেটকে (১৫৭৫-১৬১১) নিজের চিন্তা প্রচারের অভিযোগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়; ১৬১৮ সালে স্যার ওয়াল্টার রাওয়ালকেও ধর্মবিরোধিতার কারণে হত্যা করা হয়। তাকে শিরোচ্ছেদ করার পর তাঁর মাথাকে মমি করে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তুলুজে লুচিলিও ভানিনিকে ১৬১৯ সালে 'নাস্তিকতার' অপরাধে জিহ্বা ছিড়ে ফেলে তারপর আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারা হয়। মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ওপর সীমাহীন জুলুম অত্যাচার চালিয়ে, তাদের ভিটে-বাড়ি থেকে উৎখাত করে, নির্যাতন চালিয়ে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, ধর্মান্তরিত করে, তাঁদের শিশু, নারী-পুরুষ, সহায়-সম্পত্তিসহ গোটা দেশ দখল করে নিয়েছিলেন; ইসলামি ইতিহাস এর গর্বিত সাক্ষী। নবি মুহাম্মদ নিজেই 'মুরতাদ' - 'কাফের' এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর ছিলেন এবং এ ধরনের প্রচুর লোককে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন কিংবা প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। নবি মুহাম্মদের আদেশ ছিল, কোনো লোক ধর্মদ্রোহী বা ধর্মান্তরিত হলে শাস্তি হিসেবে কখনো আল্লাহর শাস্তি 'আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে না', তবে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে পারো। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন- Allah's Apostle sent us in a mission and said, "If you find so-and-so and so-and-so, burn both of them with fire." When we intended to depart, Allah's Apostle said, "I have ordered you to burn so-and-so, and it is none but Allah Who punishes with fire, so, if you find them, kill them."(সহিহ বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫২,নম্বর ২৫৯) অন্য হাদিসে প্রমান আছে, হজরত আলি কয়েকজন লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় তাদের ধর্মে ফিরে গেলে, তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

ইকরিমা থেকে বর্ণীত, হজরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কাছে যখন সংবাদ পৌছিল যে হজরত আলী (রাঃ) কয়েকজন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন, ইবনে আব্বাস বললেন- আলীর জায়গায় আমি হলে অবশ্য তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না, তবে নিশ্চয়ই হত্যা করতাম যেহেতু নবীজি নির্দেশ দিয়েছেন ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যা করতে। (সহিহ বোখারি শরিফ, ভলিউম

৪, বুক ৫২, নম্বর ২৬০)। অন্য একটি হাদিসে আছে- একজন ইহুদি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিছুদিন পর সে আবার ইহুদি ধর্মে ফিরে যায়; এ খবর শুনে নবি মুহাম্মদ হজরত মুয়াদ বিন জবলকে নির্দেশ প্রদান করেন ঐ লোকটিকে হত্যা করতে। মুয়াদ বিন জবল ঐ লোকটিকে হত্যা করতে গেলে সাহাবি আবু মুসা (রাঃ) 'ধর্মদ্রোহী' লোকটিকে গ্রেফতার করে হাতে-পায়ে বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসেন; এরপর মুয়াদ বিন জবল ঐ লোকটিকে হত্যা করেন। (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি, ভলিউম ৯, বুক ৮৪, নম্বর ৫৮ এবং ভলিউম ৯, বুক ৮৯, নম্বর ২৭১)। ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খলিফা মেহদি ইবন মনসুর সর্বপ্রথম 'মিহনা' (Mihna) নামের একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন; যার কাজ ছিল খোঁজে খোঁজে মুরতাদ, কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া। বর্তমানযুগে সারা বিশ্বে 'ইসলাম' নানা কারণেই আলোচনার বিষয়; স্বীকার করতে হবে ৯/১১-এর পর এ আলোচনার গতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামকে নূতন যুগের আলোয় পুনর্মূল্যায়ণ করা হচ্ছে। কালোপযোগী করার লক্ষ্যে সময়ের পরিবর্তনে যুগে যুগে ইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মসমূহে, কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। মেয়েশিশু হত্যা, ডাইনি হত্যা, সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা, আজ আর নেই। গির্জায় নারী নেত্রীত্ব, সমকামী বিবাহ আজ আইনতঃ বৈধ। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের সামনে মাথানত করে ধর্মযাজকেরা তাদের ধর্মগ্রন্থের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন তাদের পুর্বসূরীগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার জন্যে। খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল বিগত দু'হাজার বছরে খ্রিস্টান জনগণ, শান্তি, প্রেম মানবাধিকারের বিরুদ্ধে যেসব পাপ করেছেন, তার জন্য ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু ইসলাম ঠিক তার বিপরীত; অমানবিক, সন্ত্রাসী আদি অবস্থানে আজও অনড় অটল। জেহাদের মাধ্যমে বিধর্মীদের-অবিশ্বাসীদের হত্যা করে গোটা বিশ্বকে 'দারুল-ইসলাম' বানানোর প্রচেষ্টাকে ইসলামি বিশ্ব খুবই মর্যাদার সঙ্গে দেখে। ইসলাম অস্বীকার করে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত সত্যকে। সংস্কার-পরিবর্তন ইসলামে ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত মনীষী, নির্ভিক নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ তাঁর 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র ও বিচিত্র-ভাবনা' গ্রন্থে বলেছিলেন: "মানুষের অবচেতন-অস্পষ্ট জীবন চেতনার মূলে রয়েছে ভয়-বিস্ময়, ভক্তি-ভরসা ও কল্পনা। এতে বলতে গেলে জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তির ঠাঁই সংকীর্ণ ও নিতান্ত সামান্য।" বিধাতা, গড, আল্লাহ্ ভগবান বা ঈশ্বরের

রূপ-রং, চেহারা-চরিত্র জানার জন্যে বাংলা ভাষায় লেখা আমাদের বাংলাদেশেরই ড. আহমদ শরীফের 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা', আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধানে', মোস্তফা মীরের 'উল্লেখ্য', ড. হুমায়ুন আজাদের 'আমার অবিশ্বাস', মাহমুদ শামসুল হকের 'নারী কোষ', শফিকুর রহমানের 'পার্থিব জগৎ' ও 'হিউম্যানিজম' অভিজিৎ রায়ের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' ও 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইগুলোই যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত লেখকদের যুক্তি, তত্ত্ব-তথ্যবহুল লেখা বা তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর, তাদের দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমাধান, ধর্মে-বিশ্বাসীরা কোনোদিন দিতে পারেননি, হুমকি ধমকি দেয়া আর বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া। ধর্ম মানুষকে-সমাজকে-জাতিকে পেছনের দিকে টানে। যে কোনো ধর্মাবলম্বীর ধার্মিক হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো-স্বধর্মকে Superior 'শ্রেষ্ট' আর অন্য ধর্মকে Inferior 'নিকৃষ্ট' মনে করা। কোরান শরিফের ১০৯ নম্বর সুরা 'কাফেরুনে'র শেষ আয়াত 'লাকুম দ্বী-নুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার, আর বাইবেলের Love thy neighbours 'প্রতিবেশীকে ভালোবাসো', হিন্দুদের 'অতিথি নারায়ণ'- এর মতো কাল্পনিক অসাড় মিথ্যা শ্লোক-বাণী প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থেই কম-বেশি আছে। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন নেই চর্চাও নেই। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক; ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা প্রত্যেক বছরই মুসলিম, খ্রিস্টানদের পাইকারি হারে হত্যা করছে, তাদের উপাসনালয় ভেঙে-গুড়িয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশে মুসলিমরা হিন্দুদের, আহমদিয়াদের কিংবা পাহাড়ী আদিবাসীদের উপর যেভাবে অত্যাচার হত্যা, ধর্ষণ, পরিকল্পিত গুম-সন্ত্রাস পরিচালনা করছে, বাংলাদেশে আহমদিয়াদের সমস্ত ধর্মীয় প্রকাশনা বিএনপি-জামাতের চার দলীয় জোট সরকার ২০০৪ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, পাকিস্তানে মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টানদের উপর যেসব সংঘবদ্ধ আক্রমণ পরিচালনা করছে, সেটা ডিঙিয়ে এখন শিয়া-সুনি-আহমদিয়া দ্বন্দ্ব, একে অপরের উপাসনালয়ে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে নিজেদের ঈমানের পরীক্ষা দিচ্ছে, তা দেখে যে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক-বিবেক, জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের তথাকথিত পবিত্র ধর্মগুলোর শান্তিময় বাণীর উপর আস্থা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর বটে।

আধুনিক যুগের শিক্ষিত, তথাকথিত মডারেইট ধার্মিকেরা চোখের সামনে ধর্মগ্রন্থের ইতিহাস, ধর্মের কুৎসিত চেহারা, ধার্মিকদের অমানবিক অনৈতিক আচার আচরণ দেখে শুনেও দাবী করেন; ধর্ম মানবতা শিক্ষার বা নৈতিকতার চাবিকাঠি। এ দাবী করেই তারা থামছেন না, তারা

স্বগর্বে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন; ধর্ম না থাকলে মানুষ বনের পশু হয়ে যাবে, মায়ের সাথে সন্তান সহবাস করবে, নির্বিচারে অবাধ অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হবে, দুনিয়ার মানুষ সমকামী হয়ে যাবে, মানুষের রিপ্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে, বিশ্বে অশান্তি বিশৃংখলা শুরু হয়ে যাবে, সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের এ দাবী সপূর্ণ ভিত্তিহীন, এ বিরাট এক আত্মপ্রবঞ্চণা। ঘরে বাইরে সারা জগতজুড়ে নিত্যদিন যে অমানবিক, অনৈতিক, পাশবিক ঘটনা ঘটছে, প্রতিদিন পত্রিকায় পাতায় যে ধোকাবাজী-মিথ্যাচার, প্রতারণা-প্রবঞ্চণা, খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা, মসজিদ ভাঙ্গা, মন্দির ভাঙ্গা, গীর্জায় আগুন দেয়া, মূর্তি ভাস্কর্য ভাঙ্গা, উপাসনালয় ধ্বংস করার খবর আসে ওগুলো করছে কারা? নাস্তিকেরা না আস্তিকেরা? ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি ওগুলো ধর্মে বিশ্বাসীরাই করতেন আর বর্তমানেও এ সকল অপকর্ম তারাই করছেন যারা কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। তাহলে ধর্ম হাজার বছর ধরে মানুষকে মানবতা আর নৈতিকতার শেখালোটা কী? ধর্ম যদি মানবতা শিক্ষার বা নৈতিকতার চাবিকাঠি হতো তাহলে পৃথিবীতে পুলিশ আদালত, কৌর্ট-কাচারীর কোন প্রয়োজন হতোনা। জগতের সবগুলো কয়েদখানা ধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারাই ভর্তি। সারা পৃথিবীর কারাগার খুঁজে নাস্তিক পাওয়া যাবে কতোজন? সত্যবাদীতা, নৈতিকতা মানুষ ধর্মগ্রন্থ্ থেকে শেখেনি, শিখেছে পরিবেশ ও সমাজ বাস্তবতা থেকে। ধর্মগ্রন্থ্ লেখার আগে কি মানুষের মাঝে মানবতা আর নৈতিকতা ছিলনা? ধর্মহীন সমাজ বা পরিবারে কি সুখ-শান্তি, সত্যবাদীতা মানবতা নেই? সমাজবাস্তবতার চিত্র প্রমাণ করে ধর্মবাদীদের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও হাস্যকর। বলা যেতে পারে ধর্ম মানুষকে মানবতা বা নৈতিকতা শেখায়নি বরং শেখায়েছে তার উল্টোটা, সাম্প্রদায়ীকতা ও পাশবিকতা।

প্রায় সবগুলো নুতন ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার পূর্ববর্তি নিকটতম ধর্মের মানুষের রক্ত পান করে। মানুষের প্রাণ সংহার বা রক্তের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ধর্ম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায়। মুসলমানরা তো ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন; 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হর কারবালা কি বাদ'। কিন্তু অবাক ব্যাপারটা হলো, এই বিষাক্ত রক্ত পিপাসু ধর্ম যতটা না অন্য ধর্মের মানুষের রক্ত পান করেছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হরণ করেছে নিজ ধর্মের মানুষের প্রাণ।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ -৬০০ অব্দে বর্তমান ভারতের হরিয়ানায় একই পরিবারের পাণ্ডব ও কৌরব কর্তৃক সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আয়েশা ও আলীর মধ্যকার জামাল যুদ্ধ, ৬৫৭

খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া ও আলীর মধ্যকার সিফফিন যুদ্ধ, ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন ও এজিদের মধ্যকার কারবালা যুদ্ধ, ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের ক্যাথলিক আর প্রোট্যাস্ট্যান্ট এর মধ্যকার যুদ্ধ (Second War of Kappel, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীদের সাথে বাংলাদেশীদের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত লেবাননে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ, এ সব জগতে ধর্মবাদীদের দ্বারা সীমাহীন মানুষ খুনের কলংকিত ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র। এই যদি হয় আস্তিকদের নিজের ঘরের অবস্থা তাহলে বদর, ওহুদ, ক্রুসেড, হলোকাস্ট সহ শত শত ধর্মযুদ্ধে ভিন্নধর্মের মানুষের প্রতি তারা কেমন নৃশংস ও পাশবিক ছিলেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। আর ধর্মের জন্ম থেকে শুরু হওয়া এ সকল যুদ্ধে বলিদান হয়েছে জগতের কোটি কোটি নিরীহ, নিরস্ত্র অসহায় নারী ও শিশু।

একদল মধ্যপন্থি বা নিরপেক্ষ জ্ঞানী লোক আছেন তারা বলেন, সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই ঠিক, সব ধর্মই মানবতা, নৈতিকতা শিক্ষা দেয় এবং সকল ধর্মই পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী। এ এক মহা ভাওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। সুবিধাবাদী জ্ঞানপাপীরাই এরকম কথা বলতে পারেন। 'সবটাই সত্য' এর মানে কোনটাই চিরন্তন সত্য নয়। গরু পুজাও ইবাদত আবার গরু হত্যা করাও ইবাদত? এরা মানবতা, নৈতিকতা, সহনশীলতা (টলারেনস) বা সহিষ্ণুতার সংজ্ঞা এবং ধর্মের ইতিহাস ভালই জানেন, জেনে বুঝেও দুকূল রাখতে গিয়ে এই ভন্ডামীটা করেন। একটি নুতন ধর্ম পুরাতন ধর্মের মানুষকে দাওয়াত দিবে- 'তোমারটাও সত্য আমারটাও সত্য, তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ করো' এমন বে আক্কেল নির্বোধ জগতে কেউ আছে? 'তোমারটা মিথ্যা, ভ্রান্ত, বাতিল, পঁচা, অচল, অগ্রহনযোগ্য, হাস্যকর আর আমারটা সনাতন, সত্য, ঈশ্বর কর্তৃক অনুমুদিত, সর্বশ্রেষ্ট, একমাত্র গ্রহণযোগ্য' এই হলো এক ধর্মের প্রতি আরেক ধর্মের দাওয়াতের ভাষা। ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন মতের প্রতি মশকরা তিরষ্কার নিন্দা কটাক্ষ অপবাদ দেয়া ধর্মগ্রন্থ থেকেই মানুষ শিখেছে। এক ধর্ম অন্য ধর্মের মৃত্যু কামনা করে প্রতিমুহুর্ত নিজের বেঁচে থাকা ও বিস্তারের স্বার্থে। ধর্মের ইতিহাস যেমন এর সাক্ষী, তেমনি আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে তা প্রত্যক্ষ করছি। মক্কা জয় করে মুহাম্মদ কাবা ঘরের ৩৬০ টি দেবতার মাথা-মুন্ড ভেঙ্গে চুরমার করে বাহিরে ফেলে দিয়ে কেমন মানবতা আর নৈতিকতা শিক্ষা দিলেন? তিনি অন্যের মসজিদও ভেঙ্গেছেন। মদিনায় ইহুদীদের নিরপরাধ বৃক্ষের বাগান উজাড় করে কেমন টলারেন্সের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন? আজ তার অনুসারীরা একই কাজ মহা আনন্দের সাথে করে

যাচ্ছে আর বুক উঁচু করে চোখ রাঙ্গায়ে হুংকার দেয়; আমরা মূর্তি রাখতে আসিনি এসেছি মূর্তি ধ্বংস করতে'। ধর্মের তাবেদার সরকার এখানে নিঠুর নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করে। 'ধর্মে নৈতিকতা' প্রসঙ্গে ডঃ অভিজিৎ রায় লিখেন; 'প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বণ বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোড়া খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্ম গ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা। আমাদের দেশী সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছোটবেলা থেকেই ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবি পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখীর মত আউরানো হয় নিরক্ত বাক্যারলী -'অ্যাই বাবু- এগুলো করে না- আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে'। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোন বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিস্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যে কোন উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে পারলে কোন বান্দাই আর নৈতিকতা-ফৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানি, নামাজ, হজ্জ, কোরান

তেলাওয়াত, পুজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশী, তারাই কিন্তু বেশি বেশি 'আল্লা-আল্লা' করে চ্যাঁচায়। হাজী সেলিমের মত পান্ডারই হজ্জ করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশি, এরশাদের মত লম্পটেরই 'আলহাজ্জ' হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চন্ত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পুজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় সমাজের ভালোর জন্য। (ডঃ অভিজিৎ রায়, 'ধর্মই কি নৈতিকতার একমাত্র উৎস'?)

ধর্মে বিশ্বাসীরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে, ধর্মে বিশ্বাস রেখেও কি মুক্তমনা হওয়া যায় না? মুক্তমন বলতে চিন্তার স্বাধীনতা বুঝায়, আর ধর্মে বিশ্বাস হলো চিন্তার পরাধীনতা বা চিন্তার দাসত্ব। দুটোর সহাবস্থান কীভাবে সম্ভব? ধার্মিকের দেহ-মন, আশা-আকাংখা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, অর্থবিত্ত, মান-সম্মান, বাঁচা-মরা, জীবন-মৃত্যু সব কিছুর মালিক ঈশ্বর। ঈশ্বর তার ইচ্ছেমত নির্ধারণ করে দেন বিশ্বাসীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত। দু-জন মুক্তমনা নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও ঘর-সংসার করতে পারে, দু-জন ধর্ম বিশ্বাসী নর-নারীর মন চাইলেও তা করতে পারবে না। মন চাইলেও সে তার ইচ্ছে মত খেতে, পরতে পারবেনা এমন কি একজন আরেকজনকে ভালবাসতেও পারবেনা। একজন মুসলমান ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে জীবদ্দশায় ইচ্ছা থাকলেও তার দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর পরে কাউকে দিতে পারবে না। মানবিক দায়ে, নিঃস্বার্থভাবে একজন অপরজনকে সাহায্য বা দানও করতে পারবেনা, এ কেমন মুক্তমন?

আধুনিক যুগের শিক্ষিত, মডারেইট, মুসলমানেরা দাবি করেন, কোরান শরিফেই লিপিবদ্ধ আছে অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ দুনিয়ার যাবতীয় সব জ্ঞান; একমাত্র এই বইয়েই আছে, জগতের সকল মানুষের ইহলোক ও পরলোকের সকল সমাধান! অবশ্য এই দাবী অন্য ধর্মের মানুষেরাও করে থাকেন। প্রত্যেকটা ধর্মই বিজ্ঞানের পিছু নিয়েছে নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্যে। পনেরশত বৎসর যাবৎ বিশ্বের

কোটি কোটি মুসলমান কোরান বইখানি সাদরে, সমাদরে, মগজে, বুকে-অন্তরে ধারণ করে রাখলেন, ফল কী হলো? পনেরশত বৎসর কোরান পড়ে কোন বিজ্ঞানী কোন জিনিষটা আবিষ্কার করলেন? অথচ বিজ্ঞানের যে কোনো নূতন আবিষ্কারের কিছুদিন পরই দেখা যায়, যত দ্রুত সম্ভব বিজ্ঞানের ঐ আবিষ্কারের তথ্য মুসলমানেরা কোরানের মধ্যে খোঁজে পেয়ে গেছেন! যদি অমুসলিমরা বিজ্ঞানের নতুন কোনো তথ্য-তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকে তবে অমুসলিমরা নাকি কোরান গবেষণা করেই ঐ আবিষ্কার করেছে এরকম কলরব সৃষ্টি করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, অমুসলিমদের দ্বারা বিজ্ঞানের ঐ বিষয়ে আবিষ্কারের আগে কোনো মুসলিম কিন্তু কোরানে ঐ বিষয়ে কী ইঙ্গিত দেওয়া আছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন না বা দেন না! মজার ব্যাপার হচ্ছে বিজ্ঞান আজ যেসব বিষয়ে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি, যেমন পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা (বিজ্ঞান এখনো শুধু মহাকাশের বিশালায়তনের মধ্যে বহির্জগতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার গাণিতিক সম্ভাবনার কথা বলছে), কিংবা থাকলে সেই প্রাণের স্বরূপ কী, অথবা মহাবিশ্বের সঠিক আয়তন, আকৃতি কেমন, ডার্কম্যাটারের অস্তিত্ব, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে, তবে এখনো এ বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে নেই। আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের আলেম-ওলামা থেকে মডারেইট মুসলিমরাও এ বিষয়ে চুপচাপ; তাদের কেউই বলছেন না, কোরান-হাদিসের কোথায় এ বিষয়ে কী বলা আছে? অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমরা আশঙ্কা করতে পারি আগামীতে যেই জ্যোতির্বিজ্ঞান এ বিষয়গুলি নিয়ে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল ঘোষণা করবে অমনি তারা বিজ্ঞানের বক্তব্যকে আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর আগে 'কাব্যিক ঢঙে লেখা' কোরান-হাদিসের আয়াতগুলিকে 'অনুবাদের চাতুরী আর গোঁজামিলের মাধ্যমে' বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবেন। ইতোমধ্যে আমরা তো দেখেছি, বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কারের নমুনা মুসলমানগণ এরই মধ্যে কোরান-হাদিসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই ধরনের কাজটি করেছেন। শুধু মুসলমান কেন, এই ধরনের চরিত্র প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়, যারা ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মেলাতে চান, গুলাতে চান। একটা সময় ছিল, ধর্মগুলো বিজ্ঞানের কণ্ঠ চেপে ধরেছিল ওগুলো প্রচলিত বিশ্বাস-প্রথাবিরোধী-ঈশ্বরদ্রোহী বলে, অথচ আজ ধর্মগুলো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই বিজ্ঞানের কাঁধে চড়ে বসতে চাচ্ছে; ধর্ম আর ঈশ্বর বিশ্বাসের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান!

মুসলমানগণ কোরান না পড়ে, না বুঝে অন্ধভাবে চোখ বুজে কখনো বলেন- বিজ্ঞানীরা নতুন এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না, যার সূত্র বা ইঙ্গিত আগে থেকেই কোরানে দেয়া হয় নাই। আবার কোনো তথ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়ে বলেন- কোরানে বৈজ্ঞানিক সূত্র খোঁজা অর্থহীন কারণ কোরান বিজ্ঞান শেখাতে আসেনি; এসেছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান শেখাতে! এ দিকে কোরানে যেহেতু জীন নামক এক প্রাণীর নাম উল্লেখ আছে, কিছু ধুর্ত লোক বিজ্ঞান দ্বারা তার অস্তিত্ব প্রমান করতে গিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বস্তুর ভর আর আলোর গতির সুত্র দিয়ে এক জগা খুচুড়ি মার্কা থিওরি দাঁড় করেছেন যা শুনলে আইনষ্টাইন কবর থেকে উঠে এসে নিজের চুল নিজে ছিড়বেন। এরা কোরানের আয়াতে হকিন্স এর ব্ল্যাক হোল আর বিগ ব্যাং থিওরিও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। যারা বিগব্যাং-এর ব্যাখ্যা আল্লাহর সৃষ্টির বাণী 'কুন ফা-ইয়াকুন' (সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৮২) মনে করেন, যারা 'ওয়া আরছালা আলাইহীম, তোয়াইরান আবাবিল' (সুরা ফিল, আয়াত ৩) পড়ে আবাবিল পাখির ঠ্যাঙ্গের মধ্যে আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপনের সূত্র খোঁজে পান, তাদের সাথে তর্ক করা অর্থহীন!

ইসলাম ধর্মের সব থেকে সম্মানিত কেতাব কোরান শরিফ। ইসলামিক থিওলজি মতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে নবী-রসুল হযরত মুহাম্মদের কাছে নাজিল হওয়া কেতাব সম্পর্কে মুসলমানদের 'সম্মান ও পবিত্রতার' ধারণাকে প্রাচ্য গবেষক আলফ্রেড গিয়োম অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন: It is the holy of holies. It must never rest beneath other books, but always on top of the, one must never drink or smoke when it is being read aloud, and it must be listened to in silence. It is a talisman against disease and disaster. (Alfred Guillaume, Islam, Harmondsworth, 1978, Page 74.) কোরান বলছে; "নিশ্চয়ই এ কোরান বিশ্বাসীদের জন্য একটি সঠিক নির্দেশনামা----।" (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১০)। এখানে 'বিশ্বাস' বলতে কী বুঝোনো হয়েছে? কিসের ওপর বিশ্বাস, কার প্রতি বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে? বিশ্বাসী তো মূর্তিপূজক আবু জেহেল আবু লাহাবও ছিলেন, মুহাম্মদের বাবা আব্দুল্লাহ, চাচা আবু তালিব ছিলেন, আরো ছিলেন আল্লাহরই দেয়া দুই কিতাবের অনুসারী ইহুদি খ্রিষ্টানগণ। অন্য ধর্মগ্রন্থানুসারীরাও বিশ্বাস করতেন তাদের ধর্মগ্রন্থ সত্য, তাদের নবি সত্য, তাদের আল্লাহ আছেন, দেব দেবী আছেন, তারা কি এই আয়াতের

অন্তর্ভুক্ত লোক? বিশ্বাসী তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা মুহাম্মদের (দঃ) দলভুক্ত। মহাপুরস্কারের লোভ দেখানো হয়েছে, মানুষকে নিজ দলভুক্ত করে সঙ্গবদ্ধ করার লক্ষ্যে। সুরা বনি ইসরাইলের ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে: "তাদের জন্য সতর্কবাণী যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আর তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি ভয়ঙ্কর শাস্তি।" ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় দেখানোর মানেটা কী? জগতের কিছু মানুষ পরকালে বিশ্বাস না করুক, মুহাম্মদ (দঃ) ও আল্লাহকে অমান্য করুক, সেটা তো আল্লাহরই কাম্য। মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ নরক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নরক সৃষ্টির কারণই প্রমাণ করে, তিনি নিশ্চয়ই চান না, সকল মানুষ বিশ্বাসী হউক, বেহেস্তি হউক। সুরা বাকারার ৯৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে সুস্পষ্ট কোরানের আয়াতসমূহ পাঠিয়েছি (যাতে রয়েছে ইহুদি ও তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ)। কোরানের আয়তসমূহে যারা বিশ্বাস করে না তারাই অবাধ্য, দুর্বৃত্ত।" বুঝা গেল–ভাল মানুষ হওয়ার শর্তই হলো কোরানে ঈমান আনতে হবে, মুহাম্মদের দলে আসতে হবে, অন্যথায় সকল সততা, সকল মহৎ কাজ, সবই ব্যর্থ। এই আয়াতের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। যারা কোরানের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে তারা মুহাম্মদের বেহেস্তি দল, আর যারা বিশ্বাস করে না তারা অবাধ্য, দুর্বৃত্ত নরকে শাস্তি প্রাপ্যের দল। কোরান মানবতা শিক্ষা দেওয়ার, নাকি শত্রু চিহ্নিত করার বই?

মুহাম্মদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে দেখা যায়, মদিনায় মুহাম্মদ (দঃ) যখন দেখলেন কিছু লোককে কোনোভাবেই বিশ্বাস করানো সম্ভব হচ্ছে না যে, তিনি 'নবি' ও তাঁর 'কোরান' একখানি ধর্মগ্রন্থ, তিনি 'আল্লাহ'র নামে লেখালেন, "ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ কখনই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম মেনে নাও। তাদেরকে বলো, আল্লাহর হেদায়েতই (ইসলামি আদর্শ) একমাত্র হেদায়েত, আর তোমার কাছে যা নাজেল হয়েছে তার পরেও তুমি যদি ইহুদি বা খ্রিস্টানদের ধর্ম অনুসরণ করো, তাহলে তোমাকে সাহায্য বা রক্ষা করার কেউ থাকবে না।" (সুরা বাকারা, আয়াত ১২০)। সুরা বাকারার ১৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ (নাকি মুহাম্মদ?) আরও বলেন, "আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (ইহুদি, খ্রিস্টান), তাদের কাছে যদিও তুমি সকল আয়াত (প্রমাণ-নিদর্শন) নিয়ে আসো, তবুও তারা তোমার পথ মানবে না, আর তুমিও তাদের পথ অনুসরণ করতে পারো না। আবার তাদের কেউ কেউ পরস্পরের অনুসারী নয়। আর তোমার কাছে জ্ঞানের যা কিছু এসেছে তারপরেও তুমি যদি তাদের পথ

অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই হবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।” এই আয়াতের ইংরেজি করা হয়েছে এভাবে:

And even if you were to bring to the people of the Scripture (Jews and Christians) all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, sings, revelations etc.), they would not follow your Qiblah (prayer direction), nor are you going to follow their Qiblah (prayer direction). And they will not follow each other's Qiblah (prayer direction). Verily, if you follow their desires after that which you have received of knowledge (from Allah), then indeed you will be one of the Zalimun (polytheists, wrong-doers etc.)

আল্লাহ যখন আগেই জানেন সকল আয়াত (প্রমাণ-নিদর্শন) দেখালেও আহলে কিতাবের অনুসারী ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুহাম্মদের কথা শুনবেনা, মুহাম্মদকে মানবেনা তাহলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এতো বাক্য লেখার অর্থটা কী? তারা বিশ্বাস করবে কেন যে, আল্লাহ তারই লেখা পুরাতন দুইটা বই বাতিল করে নতুন একটি বই লিখে পাঠিয়েছেন? আর আল্লাহর কি সন্দেহ হয়েছিল মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছেন যে তাকে বলতে হলো, “তুমি যদি তাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমিও হবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত?” আসলে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ মুহাম্মদকে এমন কথা বলেননি, বরং মুসলিমদের মধ্যে ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বয়ং মুহাম্মদই এমন শক্তকথা লিখিয়েছেন। সুরা বাকারার ১৯১ নং আয়াতে মুহাম্মদ আরো বলেন, “তাদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের দেখা পাও, আর তাদেরকে তাড়িয়ে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে তাড়িয়েছিল, আর উৎপীড়ন হত্যার চেয়ে নিকৃষ্ট। আর মাসজিদুল হারাম মক্কার আশেপাশে তাদেরকে হত্যা করো না যদি না তারা তোমাদেরকে সেখানে হত্যা করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদেরকে সেখানে আক্রমণ করে, তোমরা তাদেরকে খুন করো। এটাই অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।” এই আয়াতে মুহাম্মদ (দঃ) যাদেরকে খুন করার কথা বলছেন এবং খুন করেছেন, এদের অবিশ্বাসী দাবি করা হলেও তারা তো আসলেই নাস্তিক-নিরীশ্বরবাদী বা অবিশ্বাসী ছিল না; তাদের বেশিরভাগই ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য বহু-ঈশ্বরবাদী, সর্বপ্রাণবাদী ধর্মাবলম্বী। মুহাম্মদ (দঃ) একদিকে বলেন: ‘লাকুম দ্বী-নুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন’ অর্থাৎ, তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আর আমার ধর্ম আমার, ‘লা ইকরাহা ফিদ্দীন’ অর্থাৎ, ধর্মে জবরদস্তি নেই, অন্যদিকে আবার বলেন: “যুদ্ধ তোমাদের জন্যে ফরজ

(বাধ্যতামূলক) করা হলো যদিও তোমরা তা পছন্দ করো না। হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক, আর তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" (সুরা বাকারা, আয়াত ২১৬)। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, মানুষ (আরবের তৎকালীন জনসাধারণ, এমন কী সদ্য যারা মুহাম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলো) যুদ্ধ পছন্দ করতো না, অথচ কোরান উৎসাহ দিচ্ছে যুদ্ধের। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, আজকে যে দুনিয়া জুড়ে ইসলামি-মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী তাণ্ডব চলছে, তার উৎস কোথায়?

বর্ণবাদী, বৈষম্যবাদী কথায় ভরপুর কোরানে আমরা আরো দেখতে পাই, "আর মুশরিক নারীকে বিয়ে করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঈমান এনেছে, অবশ্যই একজন ক্রীতদাসী ঈমানদার নারী একজন স্বাধীন নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর (তোমাদের মহিলাগণকে) বিয়ে দিওনা মুশরিকদের সাথে, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে, নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার গোলাম, স্বাধীন মুশরিকের চেয়ে ভাল যদিও সে তোমাদেরকে তাজ্জব করে দেয়। এইসব আমন্ত্রণ করে দোজখের প্রতি আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় আহ্বান করেন পরিত্রাণ ও বেহেস্তের দিকে এবং তিনি তাঁর নির্দেশনাবলী মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট করে দেন, যেন তারা বুঝতে পারে।" (সুরা বাকারা, আয়াত ২২১)। ইংরেজিতে বলা হয়েছে: And do not marry Al-Mushrikat (idolatresses etc.) till they believe (worship Allah Alone). And indeed a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (idolatress etc.), even though she pleases you. And given not (your daughters) in marriage to Al-Mushrikun till they believe (in Allah Alone) and verily, a believing slave is better than a (free) Mushrik (idolater etc.), even though he pleases you. Those (Al-Mushrikun) invite you to the Fire, but Allah invites (you) to Paradise and Forgiveness by His Leave, and makes His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations etc) clear to mankind that they may remember.

হাদিস শরিফে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন, "আল্লাহর রসুল (দঃ) বলেছেন, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের পাকা সাদা চুলে রঙ দেয় না, সুতরাং তোমরা তার উল্টোটা করবে অর্থাৎ তোমাদের পাকা সাদা চুলে ও দাড়িতে রঙ দেবে।" (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৬৬৮)। সাম্প্রদায়িকতার এরচেয়ে নিকৃষ্ট সবক আর কী হতে পারে? ঘৃণা,

অপমান, হিংসা, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ণ এমন একটি বই, মানবকল্যাণের লক্ষ্যে রচিত হতে পারেনা। সম্পূর্ণ বইখানি রাজনৈতিক স্বার্থে রচিত। তাহলে স্বর্গ, মহাপুরস্কার, নরক, ভয়ঙ্কর শাস্তি, তকদির, ফেরেস্তা, শয়তান এগুলো কি মিথ্যা? হ্যাঁ, এগুলো হলো সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়ানোর লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাজনৈতিক স্বার্থের ওপর মিথ্যার আবরণ। এ বইখানি পড়ে, এ ধর্মে পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করে কোনো মুসলমান, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে, জগতের কোনো অমুসলিমকে ভালোবাসতে পারে না। জানি, আমার এ বক্তব্যের সাথে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করবেন; তারা বলবেন, মুসলমানদের মধ্যে কি সহনশীল, মহৎহৃদয়ের ব্যক্তি নেই? অবশ্যই আছেন এবং অনেক আছেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাদের নন-মসুলিমদের প্রতি সহনশীলতা, প্রেম-ভালোবাসা, মৈত্রী ইত্যাদি তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কিংবা ছোটবেলা থেকে নন-মুসলিমদের সাথে পাশাপাশি থাকার কারণে, সামাজিকীকরণের সময় নিজেদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বোধ-বুদ্ধি-ধারণা-নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টির ফলে আর ধর্মগ্রন্থের তথাকথিত ঐশ্বরিক নির্দেশ থেকে কিছুটা উদাসীন থাকার কারণে এবং অবশ্যই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহিত হয়ে নয়। বইখানি পড়ে, জেনে, বুঝে যারা বলেন ইসলাম মানবতার ধর্ম, বিশ্ব-শান্তির ধর্ম, কোরান সাম্য-মৈত্রীর বাণী বহন করে, তাঁরা অবশ্যই ভান করেন, মিথ্যা বলেন, প্রতারণা করেন, অথবা সম্পূর্ণ না-জেনে বোকার স্বর্গে বাস করেন।

কোরান না হয় অন্য ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের নিন্দা, সমালোচনা করলো, তাদের সত্যতা অস্বীকার করলো। কিন্তু স্ব-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এতো মতভেদ, মারামারি, খুনোখুনি কেন? এই যে শিয়া-সুন্নি, আহমদিয়া, ওয়াহাবি, হানিফি, হাম্বলি, মালিকি ইত্যাদি স্বগোত্রে, স্বজাতিতে, স্বধর্মে এই মতভেদ, মারামারি, হানাহানি, খুনোখুনির কারণ কি ধর্মগ্রন্থ বোঝার ভুল, ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, নাকি এর কারণ স্বয়ং ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থের রচয়িতাগণ? মুসলমানদের দাবি মতো 'পৃথিবীর শেষ ধর্ম ইসলাম' এর পরে দুনিয়ায় আর কোন ধর্ম আসবেনা। তার পূর্ববর্তী সবগুলো ধর্মকে ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় বাতিল ঘোষণা করেছে। কোরান স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছে, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম (কোরান, সুরা ৩: আয়াত ১৯); এবং মুসলমানরা মৃত্যুর পরে (পাপ মোচনের পর) চিরদিনের জন্য বেহেস্তে যাবে আর অমুসলিমরা চিরদিনের জন্য দোযখে যাবে (কোরান, সুরা ২: আয়াত ৩৯)। সুতরাং যে ধর্মগুলো আল্লাহ কর্তৃক বাতিল,

পরিত্যক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ, বর্জনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অচল হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার কোনো যুক্তি নেই। নূতনের প্রতিই মানুষ আগ্রহী হয়, নূতনকেই গ্রহণ করে-বর্জন করে; নূতনকে নিয়েই হয় গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা-সমালোচনা। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কেউ ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান নিয়ে সামান্য যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা করলেই তাঁকে কথায় কথায় ইসলাম-ব্যাসার, ইসলাম-বিদ্বেষী, কাফের, মুরতাদ, ফ্যানাটিক, ইহুদি-নাসারাদের দালাল ঘোষণা করা হয়। আজকাল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু বামপন্থি আর কিছু নাস্তিক লোক উদারতার সাথে দাবি করেন, ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান স্বকালের সামাজিক পরিবেশ, ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে লিখিত। যদিও তাঁরা মনে করেন কোরানসহ কোনো ধর্মগ্রন্থই ঈশ্বর (আল্লাহ, ভগবান ইত্যাদি) প্রণীত নয়। আবার কিছু বিশ্বাসী লোক, আল্লাহ ও আল্লাহর মনোনীত রসুল ও তাঁর লিখিত ধর্মগ্রন্থ কোরানকে সুকৌশলে নির্ভুল প্রমাণ করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং সকল দোষ ধর্মানুসারীদের ওপর চাপিয়ে দেন। এদেরকে বলা হয় 'কোরান অনলি' মুসলিম। তাঁরা কোরান ছাড়া আর কিছু বুঝেন না, অর্থাৎ তারা হাদিস মানেন না। কোরান ছাড়া ইসলামের তারা দুটো নাম দিয়েছেন, একটি 'মৌলবাদি ইসলাম' অপরটি 'রাজনৈতিক ইসলাম'। অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, খুনোখুনি, অমঙ্গল, অকল্যাণ হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সবগুলো হয় কোরানের অপব্যাখ্যাকারী ঐ মৌলবাদী ও রাজনৈতিক ইসলামের দ্বারা। আল্লাহ, মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁদের কোরান সর্বদাই নমস্য, নিষ্কলঙ্ক, নির্ভুল, নির্ভেজাল! এ হলো আল্লাহ, মুহাম্মদ এবং কোরানকে সত্য ও নির্ভুল প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ইসলামের মৌলবাদ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত কোরান রচনার ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য হবে নিষ্ফল অর্থহীন; তার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বয়ং মুহাম্মদ আর কোরানের আয়াত এবং হাদিস সমুহ। আদ্যপান্ত স্ববিরোধী বক্তব্যে ভরপুর কোরান স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিভ্রান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। আল্লাহ ও মুহাম্মদকে হেফাজত করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন 'মডার্ন' ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কতিপয় শিক্ষিত 'মডারেট' মুসলিম। ওনাদের আবার ইসলাম নিয়ে একেকজনের একেক মত, একেক ব্যাখ্যা। কিন্তু তাঁদের মডার্ন ইসলামের অস্তিত্ব শুধুমাত্র কাগজে-কলমে, পত্রিকার পাতা আর ইন্টারনেটের ওয়েব ব্লগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব বা বাস্তব প্রতিফলন নেই। আমাদের বাংলাদেশে অর্ধশত ইসলামি দলের নাম

শুনে অবাক হওয়ার কি আছে? পনেরশত বছর আগে নবি মুহাম্মদ তো বলেই গেছেন, "উম্মতে মুহাম্মদী তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে মাত্র একদল হবে বেহেস্তি।" (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩, নম্বর ৪৫৮০)। My community will divide into seventy-three sects and all but one will enter the Fire.
আর এই ঘোষণার পর সকলেই যে নিজেদেরকে জান্নাতি দলের দাবি করবে আর একদল নিজেদের বেহেস্তি দাবি করে বাকি বাহাত্তর দল জাহান্নামিদের সাথে খুন-খারাবি, ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা এখন ধারণা করতে পারি, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রফেট মুহাম্মদ নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছিলেন 'স্ববিরোধী' বক্তব্যে ভরপুর তার কোরান ও কোরানের অনুসারীদের ভবিষ্যৎ। তাই বলেছিলেন–মতবিরোধ, মতানৈক্য আমার উম্মতের জন্যে আশীর্বাদ! নবি চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা আলি (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা হবেন; কিন্তু তাঁর আশাপূর্ণ হয়নি। হয়েছিলেন তাঁর সর্বকণিষ্ঠ পত্নী আয়েশার পিতা হজরত আবু বকর (রাঃ)। জানা যায়, নবি মুহাম্মদ জীবিত থাকতে একবার মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'গাদির আল-খুম' নামক একটি ঝরণার (কেউ কেউ বলে কূপ) কাছে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন: "আমি যাদের নেতা, হজরত আলিও তাদের নেতা।" এই ঘোষণার দিনটি স্মরণে রেখে এখনো শিয়ারা আনন্দোৎসবের আয়োজন করে থাকে।[১৯] ইসলামের ইতিহাসে ক্ষমতা দখল নিয়ে লড়াই, ফ্যাসাদ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যাত্রা তো মুহাম্মদের মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম খলিফা নির্বাচন নিয়ে স্বয়ং মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর নিকট আত্মীয়রা স্বজাতি মুসলমানদের জন্যে প্রথম বিষবৃক্ষ রোপন করেন। মুহাম্মদের রচিত কোরান-হাদিস প্রিয় স্ত্রী আয়েশা ও জামাতা আলির জন্যে মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি। মোয়াবিয়া ও আলির (রাঃ) মধ্যকার শত্রুতা নিরসন করতে পারেনি; পারেনি হাসান-হোসেনকে মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদের হাত থেকে রক্ষা করতে। ওহাবি, শিয়া, সুন্নি, শরিয়ত, মারিফত, তরিকত, হানিফি, মালিকি, হাম্বলি, শাফিই, জামাতি, জমিয়তি, কাদিয়ানি, তাবলিগি সবকিছুই মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর কোরান-হাদিসের সৃষ্টি। একই বিষ-বৃক্ষের বহু শাখা-প্রশাখামাত্র।

১৯. আরব জাতির ইতিহাস,পৃষ্ঠা ৪৬০, ৪৭২

ইসলাম আজ সারা পৃথিবীর মানুষের আলোচ্য বিষয়। সকলের মুখেই দুটো প্রশ্ন-১. ইসলাম মানে শান্তি না সন্ত্রাস, ২. কে আসল আর কে নকল মুসলমান? সন্দেহভরা মনে মানুষ দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টায়, না-জানি আজ পৃথিবীর কোথায় কোন নবদম্পতির বিয়ের আসরে, কোন সাগর সৈকতে, কোন আদালত প্রাঙ্গনে, কোন জজের মাথায়, কোন শপিং সেন্টারে, কোন হোটেলে ইসলামি বোমা পড়লো। প্রতিটি বোমা যত বিকট আওয়াজে পড়ে, সাথে সাথে ততটুকু বিকট আওয়াজে প্রতিধ্বনি ওঠে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না, বোমাবাজরা কোরানের অপব্যাখ্যাকারী ইসলামের শত্র"। অথচ কোরানের এই অপব্যাখ্যাকারী, ইসলামের শত্রুর বিরোদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনা যায়না, রাজপথে কোন মিছিল আন্দোলন হয় না।

উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত মৌলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদির (উর্দু ভার্সন) 'তাফহিমুল কোরআন' অবলম্বনে নিচে শানে-নুজুলসহ কোরানের দুটো সুরার অনুবাদ দেয়া হলো। প্রথম সুরাটির নাম 'সুরা আনফাল' (সুরা নম্বর ৮); অপরটির নাম 'সুরা তাওবাহ্' (সুরা নম্বর ৯)। মুহাম্মদ 'সুরা আনফাল' প্রকাশ করেন হিজরি দ্বিতীয় সনে, তাঁর ও কোরায়েশদের মধ্যকার সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর। আর 'সুরা তাওবাহ্' বলেছিলেন নবম হিজরিতে, কিছু অংশ 'হুদাইবিয়া' সন্ধির প্রাক্কালে, কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে আর কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। প্রথমেই উল্লেখিত সুরা দুটির শানে-নুজুল বা পটভূমি দেখা যাক। মৌলানা আবুল আলা মওদুদি 'তাফহিমুল কোরআনে' লিখেন-

"সুরা আনফাল" হিজরি দ্বিতীয় সালে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যকার সর্বপ্রথম যুদ্ধ, 'যুদ্ধে-বদর'-এর পরে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু সুরাটিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছ, তাই অনুমান করা যায় যে পূর্ণ সুরাটি একই সময়ে নাজিল হয়েছিল। তবে এটাও সম্ভব যে বেশকিছু আয়াত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সমস্যার ওপর নির্দেশনাবলী হিসেবে, পরে বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুনরায় যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সুরাটি বিভিন্ন সময়ে বর্ণীত বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যের সমষ্টি।

সুরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বদরের যুদ্ধের কারণগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। ইসলামের প্রথম দশ/বারো বৎসর, রসুলুল্লাহর(দঃ) মক্কা থাককালীন সময়েই তাঁর নবুওতির বার্তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবিজির মক্কি জীবনের শেষ পর্যায়ে আরব নেতাগণ ইসলামকে তাদের ধর্মের প্রতি বিরাট হুমকি মনে করে, তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে

বদ্ধপরিকর হলো। এদিকে নতুন ধর্ম ইসলাম পূর্ণ বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করার মতো শক্তি অর্জন করতে তখনো সক্ষম হয়নি। প্রথম কারণ তখনো প্রমাণিত হয়নি যে সকল মানুষ মুসলমান হয়েছে তারা ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শ মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে, ইসলামের জন্যে তাদের জানমাল সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। নতুন মুসলমানগণ কি প্রস্তুত সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এমন কি সে যুদ্ধ যদি হয় তাদের আপনজনদের বিরুদ্ধে। ইসলাম কি এমন একটি অনুসারী দল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যারা এই পৃথিবীতে ইসলামের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু মনে করে না এবং তারা তাদের ধর্মের জন্যে সর্বদা জীবন দিতে প্রস্তুত, তা প্রমাণ করার জন্যে এখনো অনেক পরীক্ষা বাকি। দ্বিতীয় কারণ যদিও ইসলামের বার্তা দেশের সকল জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, তথাপি একটি পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিশালী সমাজের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয় শক্তি তখনো ইসলামের ছিল না। তৃতীয় কারণ তখনো ইসলাম তার আলাদা কোনো আবাসস্থল বা কেন্দ্রস্থান গড়ে তোলতে পারেনি যেখান থেকে সুদৃঢ় শক্তি বর্ধন করা যায় ও পরবর্তী করণীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। চতুর্থ কারণ, মুসলমানগণ তখনো বাস্তবে ইসলামি জীবনের ফল ভোগ করার সুযোগ পাননি। তখন মুসলমানদের জন্যে না ছিল আলাদা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র, না ইসলামি সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আইন বিধি-ব্যবস্থা। তাই ইসলামি আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তোলার ও পৃথিবী জুড়ে ইসলামি আইন ও আদর্শ বাস্তবায়নের সুযোগ মুসলমানগণ তখনো পাননি।

বারো বৎসর পর এবার আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সেই সুযোগটা করে দিলেন। নানা কারণে মদিনার মানুষ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের চেয়ে অধিক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামের দ্বাদশ বর্ষে মদিনা থেকে হজ্জের মৌসুমে পচাত্তরজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবি মুহাম্মদের (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি বরং নবি করিম (দঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণকে মদিনায় আশ্রয় দিবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল মুসলমানদের জন্যে যুগান্তর সৃষ্টিকারী সংগ্রামী আহ্বান যা আল্লাহ প্রদত্ত এক পরম নেয়ামত। আল্লাহর নবি (দঃ) এমন সুবর্ণ সুযোগটি দু-হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। আল্লাহর রসুল (দঃ) তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ একদিন মদিনাতেই আরব দেশের 'প্রথম ইসলামের রাজধানী' প্রতিষ্ঠিত করেন। মদিনার লোকজন নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে এই নিমন্ত্রণের পরিণতি কি হতে পারে। স্পষ্টই এই নিমন্ত্রণের অর্থ ছিল সারা আরব বিশ্বের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং নিজেদের জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বয়কট ডেকে আনা। 'আকাবা'-য় মদিনার আনসারগণ যখন আল্লাহর রাসুলের (দঃ) প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন তখন তারা ভালোভাবেই জানতেন এর প্রতিক্রিয়া কী হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আনুগত্য প্রকাশ করার পূর্বে, মদিনার প্রতিনিধি দলের সর্বকণিষ্ঠ ব্যক্তি আসাদ

ইবনে জুবায়ের জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন- 'হে মদিনাবাসী, আপনারা খুব সতর্কতার সাথে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, যদিও আমরা এখানে এসেছি তাঁকে (মুহাম্মদকে) শুধুমাত্র একজন নবি মনে করে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে সারা আরব বিশ্বের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আমরা যখন তাঁকে মদিনায় নিয়ে যাবো তখন আমাদেরকে আক্রমণ করা হবে, হত্যা করা হবে আমাদের সন্তান পরিবার পরিজনকে। সকল দিক বিবেচনা করে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়ার যদি সাহস থাকে তখন, শুধু তখনই আপনারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি ইসলাম ও নবির (দঃ) জীবনের চেয়ে নিজেদের সহায় সম্পত্তি, আপনজন ও স্ত্রী-সন্তানদের মায়া বেশি হয় তাহলে এখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সময় আছে, হয়তো আল্লাহ এ জন্যে আমাদের কোন অপরাধ নেবেন না'।

মদিনার প্রতিনিধি দলের অন্য একজন সদস্য, আব্বাস বিন উবায়দাহ বিন নালা, ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন- 'আপনারা সত্যই কি বুঝতে পারছেন, এই মানুষটির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার পরিণতি কী দাঁড়াবে? তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হলো, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই মানুষটিকে নিমন্ত্রণের মানে হলো আপনাদের জান-মালের প্রতি নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন। যদি আপনাদের মনে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকে এবং মনে করেন, বিপদ যখন আসবে তখন তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে তোলে দেবেন, তাহলে এক্ষুণি তাঁকে ছেড়ে যাওয়া উচিৎ। কেননা, আল্লাহর কসম, অন্যথায় আমরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবো ইহকালে ও পরকালে। আর যদি আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নেন যে তাঁর কাছে 'বয়াত' (দীক্ষা) গ্রহণের কারণে যত প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন আসুক না কেন মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন তাহলে আনুগত্যের শপথ নিন, আল্লাহর কসম এর বিনিময়ে আপনারা পুরস্কৃত হবেন দুনিয়া ও আখেরাত'। এরপর সকলে এক বাক্যে ঘোষণা দেন- 'আমরা তাঁর জন্যে আমাদের সকল ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, পরিবার-পরিজন সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত'। ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত এই 'বয়াত' 'দ্বিতীয় বাইয়্যাতে আকাবা' নামে অভিহিত। এদিকে মক্কার জনগণের বুঝতে বাকি রইলো না যে, এই আনুগত্যের ফল কী দাঁড়াবে? তারা বুঝতে পারলেন মুহাম্মদ (দঃ) এখন তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বের দ্বারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী সমাজ তৈরি করে নেবেন। আর তা হবে তাদের পুরাতন ধর্মের জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা। মক্কাবাসীর জীবিকার প্রধান উৎস ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে মদিনার গুরুত্ব তাদের অজানা ছিল না। মদিনার ভৌগোলিক অবস্থানটাও ছিল মক্কার কোরায়েশদের দুশ্চিন্তার কারণ। ইয়ামেন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী বাণিজ্য-পথে মালামাল নিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদলকে মদিনা থেকে আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যে খুবই সুবিধাজনক। তাদের ভয় হলো, মুসলমানগণ বণিকদলকে অনায়াসে আক্রমণ করবে, আর তা হবে মক্কার অর্থনীতির মূলে চরম আঘাত। তায়েফ ও

অন্যান্য শহর ছাড়াও শুধু মক্কার বণিকগণই এই পথে বৎসরে কমপক্ষে দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের সম্পদের বাণিজ্য করতেন।

'বাইয়্যাতে আকাবা'-র সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তারা প্রথমে মদিনার প্রতিনিধি দলকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন দেখা গেলো একজন দুইজন করে মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছেড়ে মদিনায় চলে যাচ্ছেন, কোরায়েশগণ বুঝতে পারলেন, খুব শীঘ্রই মুহাম্মদও (দঃ) দেশত্যাগ করে চলে যাবেন। তারা এক জরুরি বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, বনি-হাশিম ছাড়া কোরায়েশ বংশের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক নেয়া হবে আর এরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করবে। কিন্তু তারা কোন প্রকার অনিষ্ট করার আগেই আল্লাহর কৃপায় নবির (দঃ) সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নবিজি (দঃ) নিরাপদে মদিনায় চলে যেতে সক্ষম হলেন। মদিনার অন্য এক নেতৃস্থানীয় লোক সাদ বিন মুয়াজ যখন ওমরাহ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন, মক্কার দ্বার-প্রান্তে আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন- 'তুমি কি মনে করো তোমাকে শান্তিতে হজ্জ করতে দেয়া হবে যখন তোমরা আমাদের দুশমনদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছো এবং নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছো? তুমি যদি উমাইয়া বিন কাহাফের অতিথি না হতে আল্লাহর কসম এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না।' সাদ বললেন- 'আবু জেহেল, আল্লাহর কসম, তুমি যদি হজ্জ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাদেরকে এমন এক জায়গায় বাধা দেবো, যা হবে তোমাদের জীবনমরণ সমস্যা। আমরা মদিনার কাছে তোমাদের বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেবো'। আসলে এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ঘোষণা হয়ে যায় যে, আজ থেকে মদিনার মুসলমানদের জন্যে মক্কায় এসে হজ করা আর মক্কাবাসীর জন্যে মদিনার পথ দিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য করা বন্ধ হয়ে গেলো। সত্যি বলতে কোরায়েশ ও অন্যান্য অমুসলিমদের বিদ্বেষী আচরণের জবাব দেয়ার, মুসলমানদের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। মদিনায় আসার পর মুসলমানদেরকে সঙ্গবদ্ধ করা ও মদিনার সম্ভ্রান্ত ইহুদিদের সাথে সমঝোতার প্রাথমিক কাজগুলো সেরেই মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম এই বাণিজ্যপথের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমে বাণিজ্যপথ ও লোহিত সাগর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে শান্তিচুক্তি বা মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র যারা সমুদ্র উপকূল ও পাহাড়ি এলাকায় বাস করতেন তাদের সাথে তাবলীগের মাধ্যমে (মিশনারি কাজ) জোটবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেন। উভয় কাজেই নবি (দঃ) পূর্ণ সফলকাম হন। তারপর এই বাণিজ্যপথ ধরে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি হুশিয়ারি স্বরূপ ছোট ছোট দলের অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। একটি অভিযানে নবিজি (দঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হিজরিতে চারটি অভিযানের প্রথম অভিযান হামজা, দ্বিতীয় অভিযান উবায়দা বিন হারিস, তৃতীয় অভিযান সাদ বিন আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্বে

ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল (দঃ)। দ্বিতীয় হিজরিতে আরও দুটি অভিযান সেখানে পাঠানো হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সবগুলো অভিযানের কোনোটিতেই কারো সাথে কোনো প্রকার সংঘাত বা রক্তপাত হয়নি এবং কোনো বণিকদলকে আক্রমণ বা কারো মালপত্র লুণ্ঠন করা হয়নি। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণ মদিনাভিমুখে সন্ত্রাসীদল প্রেরণ করে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট শুরু করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ- তাদের একটি অভিযানে কুরজ বিন্ জাবির আল্ ফিহরির নেতৃত্বে একদল লোক মদিনার নিকটবর্তী এলাকা থেকে গোবাদিপশু চুরি করে নিয়ে যায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে আবু-সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে কোরায়েশদের বিরাট এক ব্যবসায়ীদল সিরিয়া থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কা ফেরার পথে মদিনার অভ্যন্তরে এমন একটি এলাকায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে আক্রমণ করা মদিনাবাসীর জন্যে খুবই সহজ। আবু-সুফিয়ান তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলেন মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমণ করবে। তার ভয় হলো, মাত্র ৩০/৪০ জন লোকের হেফাজতে বিরাট মূল্যের মালপত্র নিয়ে মদিনা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আবু সুফিয়ান সাহায্যের জন্যে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন। লোকটি মক্কায় পৌঁছে চিৎকার করে ঘোষণা করলো- "মক্কাবাসী, তোমাদের বণিকদল মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বণিক-দলের নিকবর্তী হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা অতিশীঘ্র বেরিয়ে না পড়ো, আমি জানি না তোমারা তোমাদের মালপত্র উদ্ধার করতে পারবে কি-না।" এই সংবাদে কোরায়েশগণ ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তাদের বড় বড় নেতাগণ তাতক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ডাক দিলেন। আনুমানিক ১০০০ সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা মদিনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বণিকদলকে উদ্ধার করাই নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যাতে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে মদিনায় তাদের বিপরীত নতুন শক্তির উত্থান চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া আর মদিনার বাণিজ্যপথ কোরায়েশদের জন্যে চির উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা।

আল্লাহর রসুল (দঃ) যিনি সব সময়ই দেশের সার্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ভাবলেন এবার সময় এসে গেছে চূড়ান্ত ফয়সালার। আর এখনই শক্ত-কঠিন সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার সেই উৎকৃষ্ট সময়। অন্যথায় নতুন ইসলামের উদিত আলো পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে, ইসলাম আর কোনদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবে না। এদিকে মাত্র দুই বৎসর হলো মক্কা থেকে আগত মুহাজিরিনগণ মদিনায় এসেছেন। তখনো অর্থনৈতিকভাবে তারা ছিলেন খুবই দুর্বল। মদিনার আনসারগণও কোন প্রকার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তখন মুসলমানদের প্রতি ছিল স্থানীয় ইহুদিদের বৈরী মনোভাব, পার্শ্ববর্তী এলাকার কাফেরগণ ছিল কোরায়েশদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আর স্বয়ং মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একদল মানুষ ছিল মুনাফিক। এমতাবস্থায় কোরায়েশগণ যদি মদিনা

দখল করে নেয় তাহলে হয়তো দুনিয়া থেকে মুসলমান জাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোরায়েশগণ মদিনা দখল না করে শুধু তাদের বাণিজ্য-কাফেলাকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, আর মুসলমানগণ বসে বসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাও হবে মুসলমানদের জন্যে চরম অপমান। কারণ এভাবে সকল কাফের, মুশরিক, ইহুদিসহ সারা আরব বিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর মদিনার মুনাফিকেরা প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেবে। তখন মুসলমানদের জান-মাল, বাড়ি-ঘর, মান-সম্মানের কোন নিরাপত্তাতো থাকবেই না, মুহাজিরিনদের জন্যে মদিনায় বাস করাও হয়ে যাবে অসম্ভব। সেই সুযোগে কোরায়েশগণ আধিপত্য করবে সারা আরব জগতে। আল্লাহর রসুল (দঃ) এ সকল দিক বিবেচনা করেই অস্ত্রের মাধ্যমে কোরায়েশদের মোকাবিলা করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি মক্কার মুহাজিরিন ও মদিনার আনসারগণকে এক জরুরি বৈঠকে সমবেত করলেন। সকলের সামনে সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে নবিজি (দঃ) বললেন- 'উত্তর দিকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফেলা, আর দক্ষিণ দিকে মক্কা থেকে একদল সসস্ত্র সেনাবাহিনী মদিনাভিমুখে আসছে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এই দুই দলের যে কোন একটি তোমাদের হস্তগত হবে। তোমরা এদের কোন দলকে আক্রমণ করবে'? বেশিরভাগ লোক বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করতে চাইলেন কিন্তু নবিজির (দঃ) মনে ছিল অন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা। রসুল (দঃ) তাঁর গোপন ইচ্ছে প্রকাশ না করে একই প্রশ্ন পুনরায় যখন করলেন, মক্কার মুহাজিরিনদের একজন, মিকাদ বিন আমর দাঁড়িয়ে বললেন- 'হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনি যে দিকে চাইবেন আমরা সে দিকেই যেতে রাজি আছি'। মদিনার মুসলমানগণকে নীরব নিরুত্তর দেখে নবিজি (দঃ) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তখনো প্রকাশ করলেন না। আনসারদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক হবে না। মদিনার মুসলমানগণ ইতিপূর্বে ইসলামি কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। এখন সুযোগ এসেছে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল বিসর্জন দিতে রাজি, তা প্রমাণ করার। রসুল (দঃ) মদিনার আনসারগণকে সরাসরি প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে পুনরায় একই প্রশ্ন ব্যক্ত করলেন। এ পর্যায়ে এসে মদিনার সাদ বিন মুয়াজ দাঁড়িয়ে বললেন- 'হুজুর, প্রশ্নটি মনে হয় যেন আমাদেরকেই করা হয়েছে'। রসুল (দঃ) বললেন- 'হ্যাঁ'। সাদ বিন মুয়াজ বললেন- 'আমরা আপনাকে নবি বলে বিশ্বাস করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি আপনি যা বলবেন তা সত্য বলে মনে নেবো। সুতরাং হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনার ইচ্ছেই পূরণ করা হউক, আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে যেতে বললেও আমার সেদিকে যেতে প্রস্তুত আছি। আর আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি কাল যদি আপনি যুদ্ধের আহ্বান করেন, আমাদের একজন মানুষও পেছনে পড়ে থাকবে না'। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, বাণিজ্য-কাফেলাকে আক্রমণ নয়, বরং যুদ্ধের ময়দানে কোরায়েশদের মোকাবিলা করা হবে।

মাত্র তিনশজন অথবা তার চেয়ে সামান্য বেশি লোক যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এলেন। সমরাস্ত্র বলতে তাদের কাছে যা ছিল তা যুদ্ধের জন্যে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। খুবই অল্প লোক ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বেশিরভাগ লোক এতই ভীত ছিলেন যে তারা ধরে নিয়েছিলেন, এভাবে যুদ্ধে যাওয়া, জেনে শুনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে তোলে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আবার কিছু লোক এমনও ছিলেন যে তারা বুঝতেই পারেননি, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ যে ইসলামের জন্যে পরিবার পরিজন ত্যাগ করা, জান-মাল ও সহায়-সম্পত্তি বিসর্জন দেয়া। এমনকি তারা এও বলেছিলেন যে, ধর্মের জন্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, অযৌক্তিক ও অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর রসুল (দঃ) ও সত্যিকার বিশ্বাসীগণ এ সংকটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়ে যান, যে দিক থেকে কোরায়েশ সৈন্যবাহিনী আসছিল। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মুসলমানগণ বাণিজ্য-কাফেলাকে আক্রমণ করতে চাননি কারণ বাণিজ্য-কাফেলা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসছিল।

রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদর প্রান্তে দুইদল মুখোমুখী হলেন। নবিজি (দঃ) দেখলেন, কোরায়েশদের সৈন্যসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তিনি আকাশপানে হাত তোলে প্রার্থনা করলেন- 'হে আল্লাহ, মহা দাপটে, অস্ত্রসাজে সজ্জিত, গর্বিত এই সেই কোরায়েশগণ তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে এখানে উপস্থিত। এবার তোমার সাহায্য প্রেরণ করো যার ওয়াদা তুমি করেছিলে। হে প্রভু! তোমার দাসদের এ ছোট্ট দলটি যদি আজ পরাজয় বরণ করে তাহলে জগতে তোমার উপাসনা করার মতো একজন মানুষও থাকবে না'।

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুহাজিরিনগণকে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় আপন পরিবার ও প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে। তলোয়ার ধরতে হয়েছিল, বাবার বিরুদ্ধে পুত্র, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, চাচার বিরুদ্ধে ভাতিজা, ভাগিনার বিরুদ্ধে মামাকে। আর একমাত্র তাদের পক্ষেই এমন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব যারা আন্তরিকভাবে সত্যকে গ্রহণ করে মিথ্যার (কাফেরদের) সাথে সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। অন্যদিকে মদিনার আনসারদের জন্যেও এ যুদ্ধ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। এ পর্যন্ত তারা শুধু মক্কার শক্তিশালী কোরায়েশদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাজিরিনগণকে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এবার মদিনাবাসী কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন। মাত্র কয়েক হাজার লোকের ছোট্ট আবাসভূমি মদিনার পক্ষে বৃহত্তর মক্কাসহ সারা আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া অবশ্যই কঠিন পরীক্ষা ছিল। ইসলামের জন্যে সর্বস্বত্যাগী মুহাজিরিন ও আনসারগণের ত্যাগ আল্লাহ গ্রহণ করে স্বীয় ওয়াদা মতো তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। মুসলমানদের অল্প জনবল ও দুর্বল অস্ত্রের মুখে মহাশক্তিশালী কোরায়েশগণ পর্যদুস্ত হয়ে যায়। কোরায়েশদের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতা সহ ৭০ জন লোক এ যুদ্ধে নিহত ও ৭০ জন

মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের প্রচুর সমরাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম মুসলমানদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের এ চূড়ান্ত বিজয়, ইসলামকে এক বিরাট শক্তি হিসেবে বিশ্বের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই তো একজন পশ্চিমা গবেষক পণ্ডিত বদরের যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করেন- 'বদর যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইসলাম ছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের একটি ধর্ম, বদর-যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম নয় বরং ইসলাম স্বয়ং রাষ্ট্র হয়ে যায়'। [২০]

এবার দেখা যাক দ্বিতীয় সুরা, সুরার নাম 'আত-তাওবাহ'। আশ্চর্যজনকভাবে কোরানে 'সুরা আত-তাওবাহ'ই একমাত্র সুরা যার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া হয় না। কেন হয় না, তা নিয়ে তফসিরকারকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মুহাম্মদ এই সুরা লিখিয়েছিলেন নবম হিজরিতে অর্থাৎ সুরা আনফাল রচনার সাত বৎসর পরে। এই সাত বছরে ধুলিধুসর মরুভূমিতে আরও অনেক যুদ্ধ হলো, বদরের পরে ওহুদের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, হুনাইনের যুদ্ধে, মুতা-র যুদ্ধে শতশত মানুষের গলা কাটাকাটি হলো, অনেক অনেক কথা মুহাম্মদ আল্লাহর নামে কোরানে লেখালেন, এতো সব বাদ দিয়ে সুরা 'আনফাল'- এর পরপরই সুরা 'আত তাওবাহ' আসলো কী করে? কোরানের প্রথম সুরা, 'বাকারা' নয়, সুরা 'ফাতিহা' ও নয়। হাতের কাছে কোরানখানি এমনভাবে উপস্থাপন কারা কীভাবে কেন করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি হজরত উসমানের (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটির সেই সদস্যবৃন্দ, যথা জাবিদ বিন থাবিত, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, সাদ বিন আল-আস, আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম ছাড়া আর কেউ জানেন না। (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৭০৯)।

Narrated Anas:

`Uthman called Zaid bin Thabit, `Abdullah bin Az-Zubair, Sa`id bin Al-`As and `AbdurRahman bin Al-Harith bin Hisham, and then they wrote the manuscripts of the Holy Qur'an in the form of book in several copies. `Uthman said to the three Quraishi persons. "If you differ with Zaid bin Thabit on any point of the Qur'an, then write it in the language of Quraish,

২০. তাফহিমুল কোরআন' পৃষ্ঠা ১১৮-১২৭

as the Qur'an was revealed in their language." So they acted accordingly. (Sa`id bin Thabit was an Ansari and not from Quraish).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

মৌলানা আবুল আলা মওদুদির তাফহিমুল কোরান (উর্দু ভার্সন) থেকে 'সুরা তাওবাহ'-র শানে-নুজুলের সারাংশ:

"এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূর শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরির যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবি (সঃ) সে বছর হজরত আবু বকরকে (রাঃ) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সংগে সংগেই হজরত আলীকে (রাঃ) তার পিছে পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকূর শুরু থেকে ৯ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরির রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবি (সাঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুঁড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরষ্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুকু' থেকে শুরু হয়ে সুরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাজিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাজিল হয় এবং পরে নবি (সাঃ) আল্লাহর ইঙ্গিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরস্কার

করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবি (সাঃ) তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দুটিকে তার পরে রাখেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামি শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবি (সাঃ) তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরির রমযান মাসে আকস্মিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি, হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকিফ, নদর, জুসাম, এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্কারমূলক বিপ্লবটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারুল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশির ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলি ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময় যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌঁছুতে আরো বেশি করে সাহায্য করে। সেখানে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তাঁর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তাঁর ও তাঁর দ্বীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তার কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে। মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর নবি (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল

পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্য। তাদের বেশির ভাগ ছিল খ্রিষ্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা "যাতুত তালাহ" (অথবা যাতু-আতলাহ) নামক স্থানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হজরত কাব ইবনে উমাইর গিফারি প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবি (সাঃ) বুসরার গভর্ণর শুরাহবিল ইবনে আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খ্রিষ্টান। এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হুকুমের আনুগত। এসব কারণে নবি (সাঃ) ৮ হিজরির জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'-আন নামক স্থানের কাছে পৌছার পর জানা যায় শুরাহবিল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিমস নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই থিয়েডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিন্তু এসব আতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মুতা নামক স্থানে শুরাহবিলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্য প্রাচ্য বিস্ময়ে স্বম্ভিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধিন নজদি গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনি সুলাইম (আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামি ছিলেন তাদের সরদার) আশজা, গাতফান, যুবইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবিয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুযামি মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাকে বলেন ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থেকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করে ইসালামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার

মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ হুমকির স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্ট হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাসসানি ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবি (সাঃ) এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামি আন্দোলনের ওপর সামন্যমতও অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকেটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তুতিগুলোর অর্থ তিনি সংগে সংগেই বুঝে ফেলেন। কোনো প্রকার ইতস্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতম ও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হোনায়েনে আরবের যে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষ জাহেলিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং অন্যদিকে মদিনার যে মুনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রিস্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিল। উপরন্তু যারা নিজেদের দুস্কর্মের ওপর দ্বীনদারীর প্রলেপ লাগাবার জন্য মদিনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার" (ইসলামি মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তিত হয়ে যেতে পারতো। তাই, যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সওয়ারি ও সাজ, সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তবুও আল্লাহর নবি এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধে নবি (সাঃ) এর নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোনদিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বরং তিনি মদিনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মনজিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকু ও রাখলেন না। এবার পরিষ্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও

জানতো, এরপর আর কোথাও কোন দিক থেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোন সম্ভবনা নেই। মুনাফিকেরাও এরই পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। তারা নিজেদের মসজিদে দ্বিরার বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহি ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২ বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের দরজা খুলে যাবে অন্যদিকে এ সময় দুবর্লতা দেখাবার অর্থ দাঁড়ায় খোদ আরব দেশেও একে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হজরত উসমান (রাঃ) ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বিপুল অর্থ দান করেন। হজরত উমর (রাঃ) তার সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তার সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবি (সাঃ) এর সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবিরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নজরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারি পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো, এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিতকরার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোন ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের তার সম্পর্কের দাবি সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সহাবায়ে কেরাম নবি (সাঃ) এর নিকট তাদের খবর পৌছিয়ে দিতেন।

৯ হিজরির রজব মাসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা। পানির স্বল্পতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে পৌঁছে পেয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধিনস্থ সম্মুখ যুদ্ধ অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে

সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোন দুশমন নেই। কাজেই এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সিরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মোকাবিলা করার জন্য পৌঁছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখেনি। মুতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবি করিমের (সা.) নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দুলাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিম্মাত তার ছিল না।

তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দুর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন সে জন্যেই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল তাদের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জানদালের খ্রিষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিনদী, আইলার খ্রিষ্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আযরূহের খ্রিষ্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদিনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন বেশির ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রন ও বাঁধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলিয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেংগে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামত লাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলি কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশি হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে

সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তাঁর নবিকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে।

১। এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনেদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্নাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয়ঃ

(ক) আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামি কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোন অনৈসলামি উপাদান যেন সেখানকার ইসলামি মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীন ফিতনার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্তভাবে আল্লাহর বন্দেগি করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বেও তাওহিদদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়তুল্লাহর চতুর্সীমানার মধ্যে শিরক ও জাহেলিয়াতের যাবতীয় রসম-রেওয়াজ বল প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহিদদের মহান অগ্রনী পুরুষ ইব্রাহিমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দ্বারা কলুষিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম-রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুন্ন ছিল নতুন ইসলামি যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনক্রমেই সমিচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। নাসী (ইচ্ছেকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম গন্য করা) নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপরে সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২। আরবের ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌঁছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দ্বীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামি কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যত ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপরটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর জমিনে নিজেদের হুকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহি জোরপূর্বক চাপিলে দেবার কোন অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদের কে একটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া আদায় করে ইসলামি শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩। মুনাফিক সংক্রন্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়। সাময়িক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষাও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই হুকুম দেয়া হয়,আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যাবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবি (সাঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জামায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবি (সাঃ) তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম মসজিদে দ্বিরার ভেংগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দেন।

৪। নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামি সংগঠনের জন্য ঈমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোন আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায়

তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সংগত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসুলভ আচরণ এবং সাচ্চা ঈমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনদের ঈমানদের দাবি যাচাই আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ঈমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোন ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোন অভাব পূরণ করা যাবে না"।
এ ছিল মৌলানা আবুল আলা মওদুদি কর্তৃক বর্ণীত (তাফহিমুল কোরান (উর্দু ভার্সন) থেকে) 'সুরা তাওবাহ'-র শানে-নুজুলের সারাংশ:

এবার দেখা যাক সুরা আল-আনফালের উল্লেখযোগ্য আয়াতগুলি: (ব্রাকেটে লেখকের কথা)

১. "তারা তোমাকে যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, 'যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ' আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য করো যদি তোমরা মুমিন হও।"
(প্রশ্ন করা তো এই সুরার প্রথম আয়াতেই নিষিদ্ধ করা হয়ে গেল! ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। 'নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও' এর মানেটা কী? ওয়ার্নিংটা দেয়া হয়েছে বিশেষ করে মদিনার সেই সকল নব্য মুসলমানদেরকেই যারা মুহাম্মদকে (দঃ) সত্যি সত্যি আল্লাহর রসুল মনে করে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং নিজেদের জান-মাল, পরিবার-পরিজনদের মমতা ত্যাগ করে মুহাম্মদের কথায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। পরে যুদ্ধেলব্ধ সম্পদের ভাগ না পেয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বদর যুদ্ধে লব্ধ মাল মদিনার আনসারদের ভাগ্যে জুটেনি, সবটাই বিলিয়ে দেয়া হয়েছিল মক্কা থেকে আগত কোরাইশ মুহাজিরিনদের মাঝে। সুরাটিতে মুহাম্মদ (দঃ) বার বার 'আল্লাহ' শব্দটির সাথে 'রসুল' শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে মানুষ তার (মুহাম্মদের) আদেশ-নির্দেশ যুক্তি-তর্কহীনভাবে আল্লাহরই আদেশ মনে করে এবং অন্ধভাবে তা পালন করে। 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' তো আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের', কথাটি যদি আল্লাহর হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম (দঃ) থেকে হজরত ঈসা (দঃ) পর্যন্ত কত যুগ কত শতাব্দী অতিবাহিত হলো আল্লাহর অথবা আল্লাহর কোন নবির কোনদিন পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন হলো না কেন?)

৭. “আর স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের সাথে দুটি দলের একটির ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা চেয়েছিলে, যে দলের হাতে অস্ত্র ছিল না তা তোমাদের হউক। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন সত্যকে স্বীয় কালামের দ্বারা সত্যে পরিণত করতে আর কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে।”

(আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন সেই বাক্যটা কোরানের কোথায় লেখা আছে? এই বাক্যটাতো যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে লেখা। এই আয়াত বা বাক্য পড়ে পৃথিবীর কোনো ভাষাবিদ কি বুঝতে সক্ষম হবে যে উল্লেখিত দল দুটি কে বা কারা ছিল কিংবা যাদের হাতে অস্ত্র ছিলনা তারা কারা ছিল, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কী দখল করতে চেয়েছিল? শেষ পর্যন্ত অস্ত্রহীন দলের কী হলো? যে সকল মানুষ মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থিত ছিল অথবা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে স্বচক্ষে, তারা ব্যতীত পৃথিবীর কোনো মুসলমান কোরান পড়ে কি বুঝতে পারবে এর পেছনের ঘটনাটা কী? যে কথাগুলো মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর গোটাকয়েক অনুসারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যা অন্য কোনো মানুষের বোধগম্য নয়, সেই কথাগুলো সারা জগতের মানুষের জন্যে আল্লাহর চিরন্তন বাণী বলে মানুষ মেনে নেবে কেন? মুহাম্মদ (দঃ) ভালভাবেই জানতেন কোথায়-কীভাবে আক্রমণ করলে কী হবে। এই সুরার প্রেক্ষাপট বা শানে নুজুল পড়ে আমরা জেনেছি যে, মুহাম্মদ এই আক্রমণের প্লান করেছিলেন বহু আগে থেকে। ঠিক এই বানিজ্য পথেই বদরযুদ্ধের আগে বেশ কয়েকবার আক্রমণের মহড়া দেয়া হয়েছে এবং মুহাম্মদ অবশ্যই তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন আবু সুফিয়ান কোন পথে কোনদিন বদরপ্রান্তে আসছেন। আর মদিনায় এসে আল্লাহ কাফের বা অবিশ্বাসীদেরকে স্বমূলে উৎখাত বা শিকড় কর্তন করবেন কেন? তারা তো অবিশ্বাসী হয়নি। মুহাম্মদকে তাদের নুতন নবি বলে বিশ্বাস করছেনা। অবিশ্বাসী হয়ে তো তারা আল্লারই ইচ্ছা পূরণ করেছে; কারণ মক্কায় থাকতে আল্লাহ বলেছিলেন- ‘তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? আর কোনো প্রাণীর সম্ভব নয় বিশ্বাস করা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত’ (সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯-১০০)। আল্লাহর ইচ্ছা নেই কেন, পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে তাঁকে বিশ্বাস করুক? ‘তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে’ এ তো কুমীরের মায়া কান্না! জবরদস্তির চূড়ান্ত অবস্থাই তো যুদ্ধ।

মক্কায় থাকতে আয়াত নাজিল হয় 'জবরদস্তি নেই' আর মদিনায় নাজিল হয় শেকড় কেটে সমূলে উৎখাত?)

১২. *"স্মরণ করো তোমার প্রভুকে, ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণা দিলেন-আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছি, কাজেই যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করো, আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, সুতরাং আঘাত হানো তাদের গর্দানে এবং তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাতের আঙুল) কেটে ফেলো।"*

(কী সর্বনাশা কথা! আল্লাহ মানুষকে মানুষ খুন করতে হুকুম দিলেন! ফেরেস্তারাও খুনের দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। এই মানুষ খুনের আয়াত আল্লাহ তার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও কি লিখেছেন, না কি এই প্রথম? যুদ্ধে ফেরেস্তার সশস্ত্র বাহিনী মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত কেউ দেখেছিল বলে তো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি মক্কায় রচিত সুরা 'ফিল' এর বর্ণনানুযায়ী বাদশাহ্ আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের ওপর আকাশ থেকে আবাবিল পাখির পাথর বর্ষণ কেউ দেখেছিল বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলে না। অবশ্য আবরাহার মক্কা আক্রমণের তারিখ নিয়ে আরবের ইতিহাসে বহু মত-পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের কমপক্ষে এক যুগ পূর্বে। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের সময়টাকে মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতি করেছেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে কোনো কালে কোনো নবি পয়গম্বর সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে কোরানের কোথাও লেখা নেই। সেই আবাবিল পাখিরা কোথায় গেল? আল্লাহ নমরুদকে শাস্তি দিলেন মশার দ্বারা, বাদশাহ্ ফেরাউনকে মারলেন সাগরের জলে ডুবিয়ে, আরও কত শত জনপদ কত সম্প্রদায় ধ্বংস করলেন নিজ হাতে। হাজার হাজার বছর ধ্বংস লীলায় ব্যস্ত আল্লাহর হাত কি এতই ক্লান্ত যে মানুষ খুনের দায়িত্ব এবার মানুষের হাতেই তুলে দিলেন!!)

১৩. *"যেহেতু তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করেছে তাই তাদের জন্যে এই শাস্তি। আর যে কেউ আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে-আল্লাহ তবে শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"*

(*'শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর'* মক্কায় থাকতে এ কথাটি মুহাম্মদ বহুবার বলেছেন এবং অনেক উপমা উদাহরণও দিয়েছেন। কিন্তু মক্কায় থাকাকালীন সময়ে ১২ বৎসর যাবত বাস্তবে

শাস্তি ভোগ করেছেন শুধু মুসলমানরাই স্বদেশে এবং বিদেশে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে মানুষ কামনাও করেছে, ওপর থেকে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি আসুক। কিন্তু আল্লাহ অপারগতা দেখালেন। প্লাবন, মশা, আবাবিল, ঝড়, বৃষ্টি, মহামারি সবকিছু পড়ে রইলো মক্কায় রচিত কল্পকাহিনি হয়ে। মদিনায় এসে শাস্তিদানের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহ 'রসুলের' হাতে তুলে দিলেন তীর-বর্শা আর শাণিত তলোয়ার!)

১৭. "সুতরাং তোমারা তাদেরকে খুন করোনি বরং আল্লাহই খুন করেছেন, আর তুমি ছোঁড়ে মারোনি বরং ছোঁড়ে মেরেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ যেন তিনি ঈমানদারগণকে দিতে পারেন উত্তম পুরস্কার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।"

(হায়! হায়! সর্বনাশ। এ কি বিশ্বপতি আল্লাহর কথা? মহান আল্লাহ তারই সৃষ্টির সাথে যুদ্ধ করতে সুদূর আকাশের ঠিকানা থেকে নেমে আসলেন বদর প্রান্তে? একদিকে (কোরানের মতে, ক্ষিপ্তবেগে বেরিয়ে আসা না-পাক 'নুতফা' থেকে সৃষ্টি) ছয়শ জন মাটির মানুষ, অপরদিকে আল্লাহরই নূরের তৈরি নবি মুহাম্মদ (দঃ) যার উছিলায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সেই সাথে নূরের তৈরি এক হাজার আর্মি ফেরেস্তা নিয়ে তলোয়ার বর্শা হাতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা? পায়ের নিচে পড়া পিপীলিকার সাথে বন্য হাতির লড়াই না হয় মেনে নেয়া যায় কিন্তু এ যে সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ। বিশ্ব-প্রভুর কি শোচনীয় অপমান! আল্লাহর যদি কাফের মারার ইচ্ছে হতো তিনি নিশ্চয়ই বলতে পাতেন 'মর' ব্যস ওরা সব মরে সাফ হয়ে যেতো।)

২০. "ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের আদেশ পালন করো এবং আদেশ শুনার পর তার থেকে ফিরে যেও না।"

(যুদ্ধে মানুষের অনীহা? ওরা ভাবতেই পারেনি মুসলমান হয়ে যুদ্ধ করতে হবে গোত্রের বিরুদ্ধে গোত্রকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে, বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে। আর সবকিছু হারিয়েও বোকা মদিনাবাসীরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ পায় না!!)

২৬. "স্মরণ করো তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, দুর্বল অবস্থায় পড়ে রয়েছিলে দেশে, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে যেন লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিলেন, স্বীয়

সাহায্যে তোমাদিগকে শক্তি দিলেন এবং উত্তম জীবিকা দিলেন যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারো।"

(কথাগুলো নির্দিষ্টভাবে সেই সকল কোরায়েশদেরকে বলা হচ্ছে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে ও পরে মদিনায় এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মক্কার শরণার্থীগণ মদিনায় এসে দুই বৎসরের মাথায় উত্তম জীবিকার সন্ধান পেলেন কীভাবে? কী এমন ধন নিয়ে তারা মদিনায় এলেন? জীবিকার উৎস কি ব্যবসা-বাণিজ্য না কি কৃষিকাজ? বাস্তব ইতিহাসে তো এমন কোনো উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কি যুদ্ধলব্ধ সম্পদই আল্লাহর দেয়া উত্তম রিজেক? ১২ বছর যাবত আবিসনিয়ায় পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের দুর্গতি আল্লাহ দেখেন না? সে দেশে আল্লাহর উত্তম জীবিকা নেই? আর প্রিয় মানুষদেরকে আল্লাহ কেনই বা বিদেশে আশ্রয়ের ঠিকানা দিবেন? বদরের মাঠে একহাজার আর্মি ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন, মক্কায় পারলেন না? মাত্র বাহান্ন বছর পূর্বে আবরাহার ষাটহাজার সৈন্যকে সামান্য পাখি দিয়ে পরাজিত করে তিনশত ষাট দেবতার ঘর মক্কা বাঁচাতে পারলেন আর তার প্রিয় নবি ও বান্দাদেরকে আল্লাহ স্বদেশে রাখতে পারলেন না?)

৩০. "আর স্মরণ করো অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে আটক করবে, অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহর পরিকল্পনাই শ্রেষ্ট।"

(বাহ্! মানুষের সাথে আল্লাহ প্রতিযোগিতা করেন, কে কার চেয়ে ভাল পরিকল্পনা করতে পারে। রাতের অন্ধকারে পলায়ণের পরিকল্পনার মধ্যে আবার বাহাদুরির কী আছে?)

৩১. "যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে-আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি, আমরাও এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরনো উপকথা বৈ কিছু নয়।"

(আসলেই তো কথাগুলো সত্য)

৩২. "আর স্মরণ করো তারা বলেছিল-হে আল্লাহ এই যদি তোমার সত্য ধর্ম হয়, যদি কোরান সত্য হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দাও।"

(মক্কার কোরাইশরা তো মক্কায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল আল্লাহ তখন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে পালিয়ে গেলেন কেন?)

৩৩. “আল্লাহ কখনো তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে।”

(কি আজব ব্যাপার! মক্কায় শাস্তি দেয়া যায় না, মদিনায় দেয়া যায়। সরাসরি স্ববিরোধী কথা! বদরের যুদ্ধে কাফেরদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিলেন, না আশির্বাদ করলেন? যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ তাদের মাঝে ছিলেন, না কি পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন?)

৩৪. “আর কী বা তাদের আছে যে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না যখন তারা মসজিদে (কাবা ঘরে) যেতে বাধা দেয়? অথচ তাদের সে অধিকার নেই, তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়। এর তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে শুধু পরহেজগারগণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।”

(উপরোক্ত ৩৩ আর ৩৪ নম্বর আয়াত দুটো কি পরস্পর বিরোধী নয়? ৩৬০ দেবতার ঘরের তত্ত্ববধায়ক হবে মুসলমান, তাও মুহাম্মদের জন্মের ৫২ বছর পর?)

৩৫. “কাবা ঘরের নিকটে তাদের নামাজ বলতে শুধু শীষ বাজানো আর হাততালি দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এবার অবিশ্বাসী হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করো।”

(হাততালি দেয়া আর শীষ বাজানোর ধর্মইতো মুহাম্মদের মা আমিনা, বাবা আব্দুল্লাহর ধর্ম ছিল। সেই ধর্মানুসারেই তো বিয়ে করলেন মুহাম্মদ এবং নিজের মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মে তারা হাততালি দিলে, শীষ বাজালে মুসলমানদের কী আসে যায়? মক্কায় সুরা ‘কাফেরুন’-এ আল্লাহ বললেন- ‘তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার ধর্ম আমার জন্যে’। মদিনায় এসে অন্য ধর্মের সমালোচনা কেন? আল্লাহ নিজেই যদি অন্য ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন তাহলে মুসলমানদের কী করা উচিৎ?)

৪১. “আর যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহতে ও আমার বাণীতে যা আমি অবতীর্ণ করেছি রসুলের ওপর ফুরকানের (বদরের যুদ্ধের) দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল, তাহলে জেনে রাখো, যুদ্ধে যা কিছু সম্পদ তোমরা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর তথা রসুলের ও রসুলের নিকটাত্মীয়ের আর এতিম গরিব ও পথচারীদের জন্যে। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।”

(এতক্ষণে পাওয়া গেলো মালের ভাগের হিসাব! মালের ভাগের হিসাবে রসুলের নিকটাত্মীয়েরা খুশি হলেও মদিনার মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলতেই পারে। মাল পেয়েও কি তাদের যুদ্ধের প্রতি

উৎসাহ বাড়বে? আপন গোত্রের সাথে গলা কাটাকাটি। এই যুদ্ধে কোরায়েশবংশের হজরত আবু সুফিয়ানের দুই পুত্র অর্থাৎ হজরত মোয়াবিয়ার দুই ভাই খুন হয়েছিলেন। কিছুটা অনুশোচনা কোরায়েশদেরও হতেই পারে।)

৬৫. "হে প্রিয় নবি, মুসলমানগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি (ডাই হার্ড)) থাকে তবে তারা দু'-শ জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক'-শ জন থাকে তবে এক হাজার জনকে পরাজিত করবে, কারণ কাফেরেরা জ্ঞানহীন।"
(আনুপাতিক হিসাবটা ঠিকই আছে!)

৬৬. "এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, তিনি জানেন তোমাদের মাঝে দুর্বলতা আছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে এক'-শ জন থাকে তবে তারা দু'-শ জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক হাজার জন থাকে তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দুই হাজার জনকে পরাজিত করবে। আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথী।"
(উপরের ৬৫নং আয়াত অনুযায়ী ২০ জন মুসলমান = ২০০জন কাফের, আর ১০০ জন মুসলমান = ১০০০জন কাফের, অর্থাৎ ১জন মুসলমান = ১০জন কাফের। আর পরের আয়াত অনুযায়ী ১০০ জন মুসলমান = ২০০জন কাফের, আর ১০০০ জন মুসলমান = ২০০০জন কাফের, অর্থাৎ ১ জন মুসলমান = ২ জন কাফের। হিসাবটা তো বুঝলাম না? শুভঙ্করের ফাঁকি, না অঙ্কে গণ্ডগোল? আচ্ছা, অতিরিক্ত শক্তি ও মালতো পাওয়া গেলো এবার যুদ্ধে বন্দীদের নিয়ে কী করা যায়?)

৬৭. "নবির জন্যে বন্দীদেরকে রাখা সঙ্গত নয় যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, তোমরা চাও ইহকাল আর আল্লাহ চান পরকাল। আর আল্লাহ পরাক্রশালী হেকমতওয়ালা।"
(আয়াতটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে It is not for a prophet to have captives [of war] until he inflicts a massacre [upon Allah's enemies] in the land. Some Muslims desire the commodities of this world, but Allah desires [for you] the Hereafter. And Allah is exalted in Might and Wise. এই মুহূর্তে কোনো বিনিময় মূল্যে বন্দীদেরকে

ছেড়ে দিলে মুসলমানগণই বিশ্বাস করতেন না যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পদ নয় বরং আল্লাহর নির্দেশ।)

৬৮. "বিষয়টা যদি আগে থেকেই আল্লাহর কাছ থেকে অনুমোদিত না থাকতো তাহলে তোমরা (যুদ্ধে) যে সম্পদ অর্জন করেছিলে তার জন্যে তোমাদের ওপর শাস্তি এসে যেতো।"
৬৯. "সুতরাং ভোগ করো যুদ্ধে যা অর্জন করেছো পরিচ্ছন্ন হালাল বস্তু হিসেবে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান।"
(যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করতে মানুষ কি দ্বিধাগ্রস্থ ছিল?)

৭০. "হে নবি, তোমার হাতে যারা বন্দী রয়েছে তাদেরকে বলে দাও যে আল্লাহ যদি জানতে পারেন তোমাদের মনে ভাল কিছু চিন্তা আছে তাহলে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"
(ধর্মের বাণিজ্যকরণ? কৌশলে বশ্যতা মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি? জগতের কোনো মানুষ কি বলতে পারেন একজন যুদ্ধ বন্দীর কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কী ফেরত দেবার আছে? যুদ্ধে সন্তান হারানো মাকে সন্তান দেয়া যাবে, কিংবা সন্তানকে বাবা? মানবতা নিয়ে মুহাম্মদের কি হীন তামাশা! 'আল্লাহ যদি জানতে পারেন' এটা আল্লাহর কথা?)

৭১. "আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, এর আগে তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করেছে সুতরাং (তোমাকে) তাদের ওপরে প্রাধান্য দিলেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সুকৌশলী।"
(কথাটি যে মুহাম্মদের তাতে কোন সন্দেহ নেই কারণ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সুকৌশলী আল্লাহ সন্দেহসূচক শব্দ 'যদি' ব্যবহার করতে পারেন না। কাফেররা কী করবে, না করবে আল্লাহ যদি আগে থেকে না জানতেন, তাহলে বদরের যুদ্ধসহ যে সকল যুদ্ধ এখনো ঘটেনি তার বিবরণ হাজার বছর আগে কোরানে লিখে লাওহে মাহফুজে রাখলেন কীভাবে? কোরাঅনে আল্লাহ বহুবার বলেছেন যে তিনি কাফেরদের মনে কী আছে তা ভালভাবেই জানেন। এই সুরারই ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- 'আর প্রস্তুত রাখবে (মুসলমানগণকে) সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে যা কিছু তোমাদের আছে, তেজী যুদ্ধের ঘোড়া দিয়ে, আর তার দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত

রাখবে আল্লাহর শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) ব্যয় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে আর তোমাদের ওপর অবিচার করা হবে না'। And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah knows. And whatever you spend in the cause of Allah will be fully repaid to you, and you will not be wronged.)

নবি মুহাম্মদের বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সুরা আনফাল ও তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে লেখা সুরা তাওবাহ এর শানে নুজুল বা প্রেক্ষাপট আমরা আগের পর্বে দেখেছি। এবার সুরা তাওবাহ এর গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলোর ওপর আলোকপাত করা যাক-

সুরা আত-তাওবাহ-

১. "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের তরফ থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করা হলো সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।"

(কিসের চুক্তি? হোদাইবিয়ায় সন্ধি ছিল মক্কা আক্রমণের পূর্ব-পরিকল্পিত নীলনক্সা। এই কথাটি মক্কা আক্রমণের আগে বলা উচিৎ ছিল না? চুক্তি তো অনেক আগেই ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আমরা হুদাইবিয়ার চুক্তি নিয়ে পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করবো অন্য প্রবন্ধে)

২. "সুতরাং চার মাস স্বাধীনভাবে চলাফেরা করো। আর মনে রেখো, তোমরা আল্লাহর হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।"

(আয়াতটি এরকম হওয়া উচিৎ ছিল- 'আর মনে রেখো, তোমরা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকি'। কারণ কোরান তো আল্লাহর কথা!)

৩. "আর এই মহান হজের দিনে মানুষদের প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়মুক্ত আর তাঁর রসুলও। অবশ্য তোমরা যদি তওবা করো তা হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। অন্যথায় জেনে রেখো আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের মুক্তি নেই। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।"

('আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত' - এই কথার মানেটা কি? কোনো দায়বদ্ধতায় কি আল্লাহ কখনো দস্তখত করেছিলেন? হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে (দশ বছরের শান্তি চুক্তি) দস্তখত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। হজরত আলির লেখা সেই সন্ধিপত্রে আল্লাহর নামটিও লেখা ছিল কিন্তু মুহাম্মদ বিনা দ্বিধায় নিজের হাতে নামটি মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহর নামের হীন অপমান সহ্য করতে পারেননি হজরত আবুবকর, আলি, ওমর ও উপস্থিত মুসলমানগণ। সেদিন ক্ষুব্ধ ওমর, হজরত আবুবকরকে প্রশ্ন করেছিলেন - উনি সত্যিই কি আল্লাহর নবি? দ্রষ্টব্য-সহিহ বোখারি, বলিউম ৩ বুক ৫০। অবশ্য ওমর বিভিন্ন কারণে একাধিকবার মুহাম্মদের নবিত্বের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।)

৫. "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে, মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী করো আর ঘেরাও করো চতুর্দিক থেকে। আর ওঁত পেতে বসে থেকো প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ পড়ে এবং জাকাত (কর) আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

(উপরের আয়াত অনুযায়ী মুসলমান না হয়ে অমুসলিম কেউ মুসলিম দেশে বাস করার কি কোনো পথ খোলা আছে? কোরানের ৪৮ নং সুরায় ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দেন- 'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শণ করো যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন'। কে বলে ইসলামে জবরদস্তি নেই, ইসলাম অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?)

৬. "আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এদের কোন জ্ঞান নেই।"

(কল্পনা করা যায় দুষ্ট রাজনীতি একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে কেমন আত্মম্ভরী করে তোলে? মানবিক জ্ঞান কতটুকু নিচে নামলে একজন মানুষ

বলতে পারেন- 'আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেবে এ জন্যে যে তাদের কোনো জ্ঞান নেই'। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে মুহাম্মদ নিজে ও তার অনুসারীরা আশ্রয়প্রার্থী রিফিউজি ছিলেন আবিসিনিয়ায় আর মদিনায়।)

৭. "মুশরিকদের (অমুসলিম) সাথে কিরূপে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের চুক্তি বলবৎ থাকবে, তবে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে মসজিদুল-হারামের নিকটে? সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি সরল থাকে তোমরাও ততক্ষণ তাদের প্রতি সরল থেকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।"

(আল্লাহ যদি জানেন ওদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে না, তাহলে চুক্তিতে সই করলেন কেন? মানুষ চুক্তি ভঙ্গ করলো, তাই আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করলেন। মক্কা আক্রমণ করলেন, তারপর আরও কয়েকটি যুদ্ধে বেশকিছু এলাকা দখল করলেন, নারী হরণ করলেন, প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করলেন। মানুষ সরল হলে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও সরল, মানুষ যুদ্ধ করলে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেন। মানুষ ঠাট্টা করলে, মশকরা করলে আল্লাহও ঠাট্টা মশকরা করেন, মানুষ মতলব-পরিকল্পনা ষঢ়যন্ত্র করলে আল্লাহও মতলব-পরিকল্পনা ষড়যন্ত্র করেন। এ আল্লাহ তো জীবন্ত এক মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না!)

৮. "কেমন করে? (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব) তারা তো তোমাদের ওপর জয়ী হলে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাছিক (দুষ্কৃতিকারী)।"

(এই কথাগুলো চুক্তিতে সই করার পূর্বে না বলে তাবুক থেকে ফিরে এসে বলা হচ্ছে কেন? এই যে কথায় কথায় তারা মুশরিক, ফাছিক, কাফের, মুনাফিক বলা হচ্ছে এগুলো মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের প্রতি চিরদিন ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে নয় কি? কোরান কি গালি শিক্ষার বই?)

১০. "তারা মুমিনদের সাথে আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেয় না। আর তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী।"
১১. "অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আর আমরা নির্দেশাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্য।"

(যারা মুখ দিয়ে তওবা করে, শরীর দিয়ে নামাজ কায়েম করে, আর অর্থ দিয়ে জাকাত আদায় করে তারা ধর্মীয় ভাই হয়ে গেলো? এরপর যদি যুদ্ধে না যায় তাহলে সেই ভাই মানুফিক হয়ে যায়? জ্ঞানীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনার কি প্রয়োজন আছে? নামাজ কায়েম করার পদ্ধতির বিশদভাবে বর্ণনাটা কোথায়?)

১২. "আর যদি তারা চুক্তি (শপথ) ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্ম দিয়ে বিদ্রুপ করে তাহলে কাফের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো, এদের শপথের কোনো মূল্য নেই যে তারা বিরত থাকবে (দুষ্কর্ম করা থেকে)।"

(তাদের অন্তর সম্বন্ধে এতো জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করলেন? পরধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করা মুহাম্মদের কোরান ছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে আছে?)

১৩. "তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছিল? তারাই আগে তোমাদেরকে আক্রমণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের অধিকতর ভয়ের যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।"

(মাটির মানুষের কাছে আকাশের প্রতাপশালী আল্লাহর (না মুহাম্মদের?) কেমন করুণ মিনতি। বদর থেকে যুদ্ধ করে করে আর্মি ফেরেস্তারা কি সকলেই পেনশনে চলে গিয়েছিলেন? এই আয়তটি বলা হয়েছিল তাবুক অভিযানে যাওয়ার পূর্বে আর প্রথম আয়াতটি বলা হয়েছিল তাবুক থেকে ফিরে এসে।)

১৪. "তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন আর মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।"

১৫. "আর মুসলমানদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।"

১৬. "তোমরা কি মনে করো তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমরা কে যুদ্ধ করেছো এবং কে আল্লাহ ও তার রসুল ও মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিবহাল।"

(কে যুদ্ধে গিয়েছিল আর কে যায় নাই তা জানার জন্যে কিছুটা সময় লাগবে বৈকি। তবে এরা ভালোভাবেই জেনে গেছে মুহাম্মদের পদতলে মাথা নোয়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই।)

১৭. "মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করার তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল কাজ (আমল) ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরদিন আগুনের ভেতর বসবাস করবে।"

১৮. "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করবে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে আর পরকালেও আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

('অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'- আল্লাহরও মানুষের মতো আশা-নিরাশা আছে? কথাটা বোধহয় আল্লাহর নয় বরং রসুল মুহাম্মদের।)

১৯. "তোমারা কি হাজিদেরকে পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর ও পরকালে, আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিমদের হেদায়ত করেন না।"

(মুহাম্মদ ভুলে গেছেন কোরানের কথাগুলো হওয়ার কথা সরাসরি আল্লাহর, তিনি মাধ্যমমাত্র! কিন্তু বাক্যগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বক্তা আল্লাহ নয় বরং স্বয়ং মুহাম্মদ। আল্লাহর কাছে সুফিবাদের কোনো মূল্য নেই; আছে সন্ত্রাসের অপরিসীম পুরস্কার।)

২০. "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম।"

(জান আর মাল দিলে মর্যাদা ছাড়া আর কী কী পাওয়া যাবে?)

২১. "তাদের আল্লাহ তাদেরকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন-স্বীয় দয়া ও সন্তোষের আর বেহেস্তের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি।"

(আল্লাহর দয়া ও সন্তোষ আর বেহেস্ত পাওয়ার জন্যে আর কি কি করতে হবে?)

২৩. "হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

(শুধু জন্মদাতা পিতা আর সহোদর ভাই ত্যাগ করলেই হবে?)

২৪. "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ ও তার রসুল ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেকদলকে হেদায়ত করেন না।"

(সাধে কি আর মায়ের মমতা, বাবার আদর, সন্তানের মায়া, বোনের স্নেহ স্ত্রীর ভালোবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেহাদিরা বোমা হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়?)

২৫. "আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধেও যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল এবং তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে।"

(কী হয়েছিল সে দিন যে, সাহাবিগণ বেহেস্তের দরজা থেকে পালিয়ে গেলেন?)

২৬. "তারপর আল্লাহ নাজিল করেন সান্ত্বনা তার রসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের, আর এটি হলো তাদের কর্মফল।"

(একজন মুমিন সমান দশজন কাফের, আগের সুরা আনফালে তো তাই বলা হল। এতো সৈনিক থাকা সত্ত্বেও আকাশ থেকে ফেরেস্তা আর্মি নামাতে হলো? শুধু ফেরেস্তা আর্মি দিয়ে যুদ্ধ হয় না?)

২৮. "হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পরে যেন তারা পবিত্র মসজিদের নিকটে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা করো তাহলে আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।"

('আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন'-এটা আল্লাহর কথা হতেই পারে না। অন্যত্র সুরা আল ফাতহ (নং ৪৮) আল্লাহ লিখলেন- 'ইনশাল্লাহ তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়' (আয়াত ২৭)। আল্লাহও ইনশাল্লাহ বলেন?)

২৯. *"তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাব অনুসারী) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আর নিষেধ করে না যা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল নিষেধ করেছেন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে জিজিয়া (কর) প্রদান করেছে ও আনুগত্য মেনে নেয়।"*
(তাদের যেহেতু কেতাব আছে সুতরাং তাদের আল্লাহ আছেন, নবি আছেন, আখেরাতও আছে। হঠাৎ করে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে সত্যধর্ম বলে গ্রহণ করবে কেন? করজোড়ে কর প্রদান করে আনুগত্য মেনে নেয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্কটা কী?)

৩০. *"ইহুদিরা বলে উজায়র আল্লাহর পুত্র আর খৃস্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, তারা কেমন সত্য থেকে বিমুখ হয়।"*
(আবারও পর-ধর্মের সমালোচনা-বিদ্রোপ করা? আল্লাহ কি অন্য কোনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন- 'আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন' এর মানেটা কী? নাকি এর আড়ালে মুহাম্মদ লুকানো?)

৩৩. *"তিনিই সেইজন যিনি আপন রসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়ত ও সত্যধর্ম দিয়ে, যেন এই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপরে প্রধান্য দিতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।"*
(অন্য ধর্মের ওপর নিজের ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার করা তো সাম্প্রদায়িকতা!)

৩৮. *"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে তোমাদেরকে বের হবার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় খুবই অল্প।"*
(কোথাকার বাক্য কোথায় এনে বসানো হয়েছে; বাক্যটি এই সুরার প্রথমে থাকার কথা। কোরানে দর্জির কাজটা কারা করলেন?)

৩৯. "যদি তোমরা বের না হও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন আর অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"
(রসুলুল্লাহ ভুলে গেছেন বাক্যের প্রথমে 'কুল' (বলো) শব্দ না বসালে কথা যে তার নিজের হয়ে যায়)

৪০. "যদি তোমরা তাঁকে (রসুলকে) সাহায্য না করো তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক বাহিনী পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নত করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"
(এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? এঁদের হলোটা কী? এতো কাকুতি মিনতি করা হচ্ছে, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতিও দেখানো হচ্ছে, সর্বোপরি তারা জানেন, তারা আছেন যতো, আকাশ থেকে আসবেন ততো এবং মহা পরাক্রমশালী স্বয়ং আল্লাহও তাদের পক্ষে, তবুও যেন ওরা নড়তে চায় না। তাদের কি হুনাইনের সেই ভয়ানক জঙ্গলের কথা মনে পড়েছে, না কি রোমানদের ভয়ে তারা ভীত? আর আল্লাহই বা কষ্ট করে বারবার সাদা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ধরাতলে নেমে আসেন কেন? কিছু সময়ের জন্যে আজরাইলকে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো।)

৪১. "তোমরা বের হয়ে পড়ো অল্প অথবা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে (যা কিছু আছে তাই নিয়ে) আর জেহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।"
(মদিনার নতুন মুসলমানদের বুদ্ধিসুদ্ধি মক্কার জেহাদি ভাইদের তুলনায় একটু কমই। এমনিতেই যুদ্ধে যেতে চায় না আর গেলেও যুদ্ধে পাওয়া মালের ওপর ভাগ বসাতে চায়। এরা তখন বুঝবে যখন মুনাফিকের খাতায় নাম উঠবে!)

৪২. "যদি (এ যুদ্ধে) আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো আর যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু দুর্গম পথ তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হলো। তারা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলবে –আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে আর আল্লাহ জানেন এরা মিথ্যেবাদী।"

(আচ্ছা এই বাক্যটা জগত ও মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন এ কথা কোন যুক্তিতে মানা যায়? বর্তমান কালের বাক্য দিয়ে তাবুকে রোমানদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আহবান সেটা আগে থেকে লেখা হয় কী ভাবে? মহাশক্তিশালী রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধ। নগদ মালের সম্ভাবনাও নেই। তারপর কী ভীষণ গরম পড়েছে খামোখা জানের ওপর রিস্ক নিতে কি সকলে চায়?)

৪৩. (হে নবি) "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো কে সত্য বলছে আর জেনে নিতেন কে মিথ্যেবাদী?"

('আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন' –কে বলছেন কথাটা? মুহাম্মদের কোনো গুপ্তচর, নাকি কোনো সাহাবি, নাকি মুহাম্মদ নিজে?)

৬৬. "অজুহাত দেখিও না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো ঈমান আনার পরও। তোমাদের কিছু লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দেব কারণ তারা ছিল অপরাধী।"

(কোন দুঃখে ঈমান আনার পরও মুসলমানগণ কাফের হয়ে গেল? মক্কার কোরায়েশদের ইসলামি আচরণ, মুহাম্মদ ও তার ইসলামের রাজনৈতিক মুখোশপরা সন্ত্রাসী চেহারা চিনতে ভুল করেছিল?)

৭৯. "যারা বিদ্রুপ করে সেই সকল মুসলমানদের প্রতি যারা মুক্ত মনে দান খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই নিজের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া। অতঃপর তারা ওদের প্রতি ঠাট্টা করে, আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।"

(যে আল্লাহ বারবার বলেন তার কাছে আছে অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার, মানুষের সকল ধন তারই দেয়া, সেই আল্লাহ যখন মানুষের কাছে কর্জ চান, ভিক্ষে চান, বিজনেস করেন, মানুষ একটু কনফিউজড হবেই। মদিনার মানুষ মুসলমান হলো কিন্তু তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই, আর মক্কার শরণার্থীদের কিছুই ছিল না অথচ এখন দুই হাতে দান-খয়রাত করতে পারে,

বিষয়টায় ভাববার হেতু আছে। 'আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন' যাক আল্লাহও ঠাট্টা করে নিয়েছেন, সমানে সমান হয়ে গেছে)

৮০. "তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্যে যে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।"

(মুহাম্মদ ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা কবুল হবে না। ভাষাটা যেন অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কোন রাগী অভিমানী মহিলার মত মনে হলো)

৮১. "পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দবোধ করেছে, আর তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে এই গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও জাহান্নামের আগুন অনেক বেশি উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতে পারতো।"

৮২. অতএব তারা সামান্য হেসে নিক। তাদের কৃতকর্মের বদলে অনেক বেশি কাঁদবে।

(তারা হাসলো আর আল্লাহ হাসলেন না, এ কেমন কথা?)

৮৩. "কাজেই আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন (তাবুক থেকে) তাদের কোন দলের মাঝে আর তারা তোমার সাথে বেরুবার অনুমতি চায় তুমি বলো-তোমরা কোনো সময়ই আর আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবারে পেছনে থেকেছ। সুতরাং পেছনে থাকার দলেই থেকো।"

('আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন' -কথাটা বোধ হয় কোনো মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো।)

৮৪. "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি তাদের জন্যে নামাজ পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, আর রাসুলের প্রতিও, আর তারা মরেছেও নাফরমান অবস্থায়।"

৯৪. "তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমার কাছে এসে ছলনা করবে, তুমি বলো ছলনা করো না আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবো না, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন থেকে আল্লাহই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন আর তার রসুলও। তারপর তোমাদেরকে

ফিরিয়ে আনা হবে সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়ে অবগত সত্তার কাছে। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করেছিলে।"

(আজ যদি ২০০৯ সালে কোনো জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণী লিখে এভাবে, "বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে, রাজাকাররা সংসদে যাবে"- এমন জ্যোতিষীকে আপাদমস্তক পাগল ছাড়া আর কী বলা যায়? এই বইটা নাকি লাওহে মাহফুজে আগে থেকে লেখা ছিল?)

৯৫. "যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহর কসম খাবে, যেন তুমি তাদের উপেক্ষা করো, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে এরা নাপাক এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো জাহান্নাম।"

('ভবিষ্যতকাল' দিয়ে বলা বাক্যগুলো, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে কেন? "যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে" বাক্যটা লেখা হয়েছে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে।)

১০২. "কোন কোন লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক ভাল কাজের সাথে অপর মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

('আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন'- কথাটা কি আল্লাহর?)

১০৩. "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা স্বরূপ। আসলে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।"

(সর্বনাশ, বলেন কি! এরই মধ্যে কালো টাকা সাদা হয়ে গেলো? টাকার গন্ধ পেয়ে আল্লাহ যে মাইন্ড চেইঞ্জ করলেন? একটু আগে বললেন সত্তরবার দোয়া করলেও কাজ হবেনা আর এখন?)

১০৭. "যারা জিদের বশে মসজিদ নির্মাণ করেছে, তাদের ঘাটি স্বরূপ, কুফরির তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পূর্ব থেকে যুদ্ধ করে আসছে আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে, তারা কসম খেয়ে বলবে-আমরা যা করেছি মঙ্গলের জন্যে করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে তারা সবাই মিথ্যুক।"

(কোর্ট নেই, কাছারি নেই, সাক্ষী হাজির। আবার কেউ সাক্ষীকে দেখেও না। আমরা তো ইতিহাস থেকে জানি তারা সন্ত্রাসী, খুন খারাবি, লুন্টনবিহীন একটি শান্তিকামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আলোচনার কেন্দ্রস্থান হিসেবে ঐ মসজিদ নির্মান করেছিল)

১১১. "আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেস্ত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল, কোরানে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে নিজ ওয়াদাতে সত্যনিষ্ট আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটি হচ্ছে মহাসাফল্য।"
(জানমাল নগদ, দৃশ্যমান ও বাস্তব কিন্তু বেহেস্ত বাকি, অদৃশ্য ও কল্পনা, এ কেমন পার্টনারশিপ বিজনেস?)

১২৩. "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন।"
(এ আয়াত অনুসরণ করেই, সারা পৃথিবী জুড়ে ঈমানদারগণ (অবশ্য যারা প্রকৃত ঈমানদার) কাফের নিধনে লিপ্ত আছেন এবং এ যুদ্ধ অনাদিকাল চলবে। এ কোরানই শিক্ষা দেয়া হয় ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপরের দুটি সুরার শানে নুজুল ও আয়াতগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোরান আসলেই হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-সন্ত্রাসের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, নট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ।)

পৃথিবীতে সম্ভবত: একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত প্রায় সকল ধর্মই অন্য ধর্মের মানুষের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, জবরদস্তি, ভয় প্রদর্শণ খুন হত্যা লুটতরাজের পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের নবি মুহাম্মদ (দঃ) যখন নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা দিলেন, মানুষ তার কথায় সন্দেহ করলো। মুহাম্মদ (দঃ) নিজের নাম না দিয়ে একখানি বই (কোরান শরিফ) লেখালেন স্থানীয় কিছু অনুগত সাহিত্যিক দ্বারা, কিন্তু তৎকালীন আরবের জনসাধারণকে বললেন, কথাগুলো আল্লাহ নাকি লিখে রেখেছিলেন তার (আল্লাহর) বাসস্থান 'লাওহে মাহফুজে'। কোরানে বলা হল : বাল্ হুয়া কোরআনুম মাজিদ, ফি লাওহিম মাহফুজ; অর্থাৎ "বস্তুত এ হচ্ছে সম্মানিত কোরান। (যা আছে) সুরক্ষিত ফলকে লেখা" (সুরা বুরুজ ৮৫, আয়াত ২১-২২)।

লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে আল্লাহ কি নিজের হাতে লিখেছিলেন? কোরানে আল্লাহ বলেন: 'ফি ছুহুফিম মুকাররামাহ। মারফুআতিম মুতাহ্হারাহ..' এটা লিখিত আছে সম্মানিত উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে, যারা মহৎ, পূত চরিত্র। (It is) in Books held (greatly) in honour, Exalted (in dignity), kept pure and holy, (Written) by the hands of scribes. Honourable and Pious and Just (সুরা আবাসা ৮০, আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬)।

সুতরাং বুঝা গেলো, লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে ফেরেস্তাদের পবিত্র হাতে লেখা বইখানি নির্ভুল ও সন্দেহাতীত! প্রশ্ন হলো অতীতে লেখা বইখানি বর্তমান ঘটনার সাক্ষী হয় কীভাবে? ধরা যাক ২০০৪ সালের ২২ আগস্টের একটি দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরুলো- "গতকাল (২১ আগস্ট) আওয়ামীলীগের জনসভায় সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় আই.ভি রহমানসহ অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন আর শতশত মানুষ আহত হয়েছেন।" কেউ যদি বলে, পত্রিকায় খবরের হুবহু ঐ লাইনটি ১০ বৎসর পূর্বে আরেকটি পত্রিকা অফিসে দেখেছে, তখন কোনো অন্ধলোকও কি ঐ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করবে? এটা কি সম্ভব যে বদর, ওহুদ, মুতা, খয়বর যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ, অথবা মুহাম্মদের পালক পুত্র জায়েদ তার স্ত্রী জয়নাবকে তালাক দেবেন তারপর মুহাম্মদ জয়নাবকে বিয়ে করবেন, আয়েশার ওপর সতীত্বের অপবাদ, এ সবগুলোই পূর্ব পরিকল্পিত এবং লাওহে মাহফুজে লেখা ছিল?

মানুষ দেখলো মুহাম্মদ (দঃ) তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের কথাই ভিন্নভাবে কবিতার ছন্দে বলছেন। লোকে যখন তাকে প্রশ্ন করতো তিনি কৌশলে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে, প্রশ্ন এড়িয়ে প্রত্যেকবারই উত্তরের বদলে নিয়ে আসতেন নরকের আজগুবি সব ভয়ঙ্কর কাহিনি আর দেখাতেন স্বর্গের সীমাহীন আরাম-বিলাস, অবাধ নারী সম্ভোগের প্রলোভন। কোরানে বলা হলো: 'আর তুমি যখন তাদেরকে দেখবে আমার বাণীসমূহ নিয়ে নিরর্থক তর্ক করছে, তখন তুমি তাদের থেকে দূরে সরে যাবে যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে মনে পড়ার পরে বসে থেকো না অন্যায়কারীদের সাথে'। (সুরা আল আনাম ৬, আয়াত ৬৮) বুঝা গেল শয়তান মুহাম্মদকে ভুলাতে পারে। শয়তান ভুলাতো, না তিনি নিজেই ভুলে যেতেন? স্মরণশক্তি যতই প্রখর হউক না কেন, রক্তমাংসের মানুষতো! শুনা কথা ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। সন্দিহান লোকেরা যখন ধরে ফেললো মুহাম্মদ একটি

ঘটনা ভিন্ন সময়ে দুইভাবে বলছেন; তখন তারা এই দ্বিচারিতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করলো, তখন আল্লাহ (?) এসে কভার-আপ দিলেন- 'যে সকল আয়াত আমি মনসুখ করি অথবা ভুলিয়ে দেই, আমি এর পরিবর্তে আরও ভালো অথবা অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি'। (সুরা বাকারা ২, আয়াত ১০৬) আল্লাহর পাঠানো একটা আয়াতের চেয়ে আরেকটা আয়াত ভাল হয় কীভাবে? ভুলে যাওয়া আয়াতগুলো কি লেখা হয় নাই? এখন কোথায় আছে? যতদূর জানা যায়, ভুলে যাওয়া আয়াতগুলোও মুহাম্মদের অনুগামী মানুষেরা লিখে রেখেছিলেন, কিন্তু উধাও করা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে খলিফা ওসমানের সময় কোরানকে 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' সম্পাদনা করতে গিয়ে।

প্রশ্ন তো অবশ্যই উঠবে। আরবের জনসাধারণের অবাক হওয়ারই তো কথা। প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে একজন নবি পৃথিবীতে ছিলেন বলে তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, কিন্তু নবি যে কেমন লোক হন, স্বচক্ষে কেউ কোনোদিন দেখে নাই। হঠাৎ করে তাদেরই মাঝে একজন বলছেন, তিনি আল্লাহর প্রেরিত এক অসাধারণ মানুষ, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেন! এটা কী করে সম্ভব হয়? কোরানে আল্লাহ বললেন: "এ কি অবাক হওয়ার ব্যাপার যে তাদেরই একজন মানুষকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি এই বলে-তুমি মানুষকে সতর্ক করো...।" (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ২)। আরো বললেন "বলো, আল্লাহ যদি না-চাইতেন, তবে আমি তোমাদের কাছে এ পাঠ করতাম না আর আল্লাহও তোমাদের কাছে এ পাঠাতেন না। আমি তো তোমাদেরই মাঝে এক জীবন কাটিয়েছি।" (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ১০)

আওয়া আজিবতুম আন-জাআকুম জিকরুম মিররাবিকুম.....। অর্থাৎ "তোমরা কি অবাক হচ্ছো যে তোমাদের কাছে সংবাদ এসেছে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন মানুষের মাধ্যমে?" (সুরা আল আরাফ ৭, আয়াত ৬৯)। উল্লেখ্য উপরোল্লিখিত সুরা ইউনুস আর সুরা আরাফের নম্র নিরীহ কোমল ভাষায় বলা বাক্যগুলো মক্কায় রচিত।

মানুষের সন্দেহ ঘুঁচে না। মুহাম্মদ সুরা 'আল আরাফ'- এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে নিয়ে এলেন, আদ, সামুদ, মুসা, ফেরাউন, শোয়াইব, লুত ও নুহ সম্প্রদায়ের কাহিনি; প্রমাণ করতে চাইলেন তাকে (মুহাম্মদকে) নবি বলে না মানলে তাদেরকেও আল্লাহ শাস্তি দেবেন যেমন শাস্তি দিয়েছিলেন ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকগণকে ঝড়, তুফান, বজ্রপাত দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প দিয়ে। হাজার-হাজার বছর পরে, আল্লাহর মনোনীত দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবির পরে কেন আল্লাহ

আরো একখানি গ্রন্থ পাঠালেন? এর পূর্বে কষ্ট করে এতোখানি গ্রন্থ লিখে জগতে প্রেরণ করা কি আল্লাহর অদূরদর্শিতার প্রমাণ নয়? আল্লাহ কি এতোই অপরিণামদর্শী দুর্বল ও শক্তিহীন যে তার লেখা বইগুলোকে মানুষ বিকৃত করলো, অথচ তিনি তা আগে জানতেন না? একটা কপি নষ্ট হয়েছে তো কী হলো, আরেকটা কপি পাঠিয়ে দিলেই তো হতো! নতুন করে আরেকটা বই লেখার কি প্রয়োজন ছিল? সন্দিহান মানুষের প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ (দঃ) বললেন- *'জালিকাল কিতাবু লারাইবাফিহ্';* অর্থাৎ এই সেই বই, যে বইয়ে কোনো সন্দেহ নেই (সুরা বাকারা ২, আয়াত ২)। যদিও বাক্যটি 'আল্লাহর বাণী' হিসেবে মুহাম্মদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয়নি; কোরানে সর্বপ্রথমে এনে বসিয়েছেন মুহাম্মদের অনুসারীগণ। অন্ধভাবে তাঁকে (মুহাম্মদকে) নবি হিসেবে ও তাঁর কথাগুলোকে ঐশীবাণীরূপে বিশ্বাস করানোর জন্যে, পরবর্তী বাক্যেই মুহাম্মদ বললেন, *'হুদাল্লিল মুত্তাকিন',* অর্থাৎ মুত্তাকিনদের জন্যে এ একটি পথ-নির্দেশক। কিন্তু 'মুত্তাকিন' কারা? *'আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গায়িব',* অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে গায়েবের (অদৃশ্য বস্তুর) ওপর। (সুরা বাকারা ২, আয়াত ৩)। মুহাম্মদ কিছু মানুষকে বোকা বানাতে সক্ষম হলেন। তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করলো-আল্লাহ, ফেরেস্তা, শয়তান, বেহেস্ত, দোজখ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, তকদির, জিন, পরী, তাবিজ-কবজ, যাদু-মন্ত্র, হুর-গেলোমান, আরশ-কুরসি জাতীয় গায়েবি-অদৃশ্য বস্তু আছে। ওপরের আয়াতানুযায়ী কোরান প্রশ্নাতীত, কোরান সন্দেহাতীত, কোরান অন্ধবিশ্বাসী মানুষের জন্যে বেহেস্তের সোপান। এর পরে কোরানকে বিজ্ঞানের চোখে দেখা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? অন্ধবিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি, পক্ষান্তরে সন্দেহ আর প্রশ্ন বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। মুক্তমনা, সন্দেহবাদী, বস্তুবাদী, বিবর্তনবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের জন্যে কোরানের সুরা বাকারার দ্বিতীয় বাক্যটিতেই নিহীত রয়েছে সর্বশেষ উত্তর; প্রশ্নের দরজা বন্ধ। আল্লাহর দোহাই দিয়ে মুহাম্মদ কোরানে বলছেন: "তোমরা কি তোমাদের রসুলকে প্রশ্ন করতে চাও, যেমন মুসাকে এর আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল?" (সুরা বাকারা ২, আয়াত ১০৮)।

তবুও বারবার মানুষ কোরান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। বারবার ভয় ভীতি আর লোভ প্রলোভন দেখিয়েও সকল মানুষকে বোকা-অন্ধবিশ্বাসী বানাতে না পেরে তিক্ত-বিরক্ত মুহাম্মদ শেষমেশ অভিশাপ দিতে শুরু করলেন:

-আর নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে নাজিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, কেবল দুর্বৃত্তরাই তা অবিশ্বাস করে। (সুরা বাকারা ২, আয়াত ৯৯)।

- নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহর বাণীসমূহ তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। (সুরা আল ইমরান ৩, আয়াত ৪)।

- আর যারা আল্লাহর বাণীসমূহে মিথ্যারোপ করে তারা নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারে বোবা-বধির। (সুরা আল আনাম ৩৬, আয়াত ৩৯)।

- আল্লাহ তাদের (অবিশ্বাসীদের) অন্তর ও কানসমূহ তালাবদ্ধ করে দিয়েছেন, তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন, আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সুরা বাকারা ২, আয়াত ৭)।

- ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো। আর সেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। তাকে অচিরেই ঠেলে দেওয়া হবে জ্বলন্ত আগুনে। আর ইন্ধন যোগানকারী তার স্ত্রীকেও। তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার আঁশের তৈরি শক্ত বেড়ী। (সুরা লাহাব ১১১, আয়াত ১-৫)।

কে এই আবু লাহাব আর কেনই বা আল্লাহ (নবিজি?) তাঁর ধ্বংস কামনা করছেন? মুহাম্মদের জীবনীকাররা আমাদের জানিয়েছেন, আব্দুল উজ্জা (আবু লাহাব নামেই বেশি পরিচিত) মুহাম্মদের আপন চাচা; আবু তালিবের ভাই। কিন্তু কেন আপন চাচার ধ্বংস কামনা করা হচ্ছে? কারণটা জানতে হলে আমাদেরকে মুহাম্মদের মক্কাজীবন সম্পর্কে জানতে হবে। মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিবি খাদিজা এবং নবি মুহাম্মদের ঘরে তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যার (রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন চাচা আব্দুল উজ্জা বা আবু লাহাবের দুই পুত্র ওতবা এবং ওতাইবার সাথে। কোরায়েশ বংশের হাশিমি গোত্রের প্রধান আবু তালিবের মতো তার ভাই আবু লাহাবও ছিলেন কাবা ঘরের মূর্তিপূজারি (পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী)। প্রথম থেকেই মুহাম্মদের ইসলাম ধর্মের প্রচারকে তিনি মনে করতেন ভ্রান্ত এবং ভবিষ্যতে গোত্র-দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবুও ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে বিবি খাদিজা এবং চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর তিনি হাশিমি গোত্র প্রধান হয়ে নবিকে সমর্থন ও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। দুই বছর পর হিজরতের কয়েক মাস পূর্বে ৬২১ খ্রিস্টাব্দের আরবি রজব মাসের ২৭ তারিখে চাচা আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানির ঘরে অবস্থান করে পরের দিন মুহাম্মদ দাবি করেন গতরাতের মেরাজের ভ্রমণের কাহিনি! প্রথম দিকে তিনি অবশ্য এ কাহিনি তাঁর একান্ত অনুগতদের কাছেই ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে আবু বকর ছাড়া কেউই গল্পটি বিশ্বাস করেননি। উম্মে হানি পর্যন্ত ভীষণভাবে বিরক্তবোধ করেন। তিনি মুহাম্মদকে সাবধান করেন জনসাধারণের সামনে না বলার

জন্য কারণ এতে তিনি তাঁদের কাছে উপহাসের পাত্র হবেন ও সুনাম নষ্ট হবে। (উম্মে হানি কখনো নবির বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না)। ধীরে ধীরে গল্পটি ঘর থেকে বেড়িয়ে পাবলিক স্কোয়ারে পৌঁছে যায়। মক্কার লোকজন নবিকে অবিশ্বাস্য মেরাজ নিয়ে খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন। নবিও তাঁদের নানাভাবে উত্তর দিতে থাকেন। নবিজির ভাষ্যে, তিনি যখন অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় তখন জিব্রাইল আসে বোরাক নামক এক উদ্ভট ঘোড়া নিয়ে। সফেদ সাদা ঘোড়াটির মুখ মেয়ে মানুষের মতো, লেজে ময়ুরপুচ্ছ। ঐ ঘোড়ায় চড়ে নবি সপ্তাকাশ ডিঙিয়ে পৌঁছে যান বেহেস্তে আদম, মুসা, আব্রাহাম, যিশুর সাথে এক এক করে দেখা করেন এবং শেষে আল্লাহর সাথে কথা বলে ফিরে আসার পূর্বে এক নজরে দোজখে ঘুরে আসেন। দোজখে তিনি মক্কাবাসী অনেক অমুসলিমদের সাথে দাদা আব্দুল মোত্তালিব, চাচা আবু তালিবসহ তাঁর অন্যান্য পূর্বপুরুষকে শাস্তি পেতে দেখেছেন। কারণ তাঁরা বিধর্মী ও মূর্তিপূজারী। নবির এ বক্তব্য এক সময় চাচা আবু লাহাবের কানেও পৌঁছায়। যে দাদা, যে চাচা পিতৃ-মাতৃহীন নবিকে কোলে-পিঠে করে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে নিজের সন্তান থেকেও বেশি আদর করেছেন, লালন-পালন করেছেন, মানুষ করেছেন, সেই দাদা আর চাচার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও পরিবারের প্রতি বিরূপভাব লক্ষ্য করে আবু লাহাব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। মুহাম্মদ ভাবতেই পারেন নি যে, তার আপন দাদা ও চাচাকে দোজখের আগুনে দেখেছেন বললে কী প্রতিক্রীয়া হবে। নবির ধর্মশিক্ষা দাদা আব্দুল মোত্তালিব আর চাচা আবু তালিবকে শেষমেশ ঠাঁই দিল নরকে? আবু লাহাব নতুন ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে মুহ্যমান হন; পরবর্তীতে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নবির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। আবু লাহাবের সন্তানদ্বয়ও রোকেয়া ও কুলসুমকে তালাক প্রদান করে নবির পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মুহাম্মদ অন্তরে বেশ দুঃখ পেলেন, কিন্তু তখনও অভিশাপ দেয়া ছাড়া কিছু করার সামর্থ তাঁর ছিল না। একদিন তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এবং কোরায়েশ বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলাপের পাশপাশি ইসলামের দাওয়াত দিতে চাইলেন। এমন সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হলেন আবু লাহাব। তিনি চিৎকার করে ওঠলেন, ধ্বংস হও মুহাম্মদ! কোরায়েশ বংশের লোকদের দাওয়াত দিয়েছ অথচ আমাদের কি দিয়েছ? উৎসন্নে যা, আজ থেকে আমি তোর ঘোর শত্রু হলাম! মুহাম্মদও নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। প্রচণ্ড রাগে তিনি বলে উঠলেন, তুমিও ধ্বংস হও![২১]। মুহাম্মদ তার

২১. ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১২

দুই কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমকে মূর্তিপূজক আবু লাহাবের দুই ছেলের সাথে বিয়ে দিলেন কেন? কারণ মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম যে 'সূতিকা ঘরে'ই মারা যাবে; যেমনটা হয়েছে আরবের আরেক একেশ্বরবাদী হানিফদের অবস্থা। প্রশ্ন দেখা দেয় আবু লাহাবের দুই ছেলে, নবি কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে তালাক না দিলে, আবু লাহাব মুহাম্মদকে ত্যাগ না করলে সুরা 'লাহাব' কি নাজিল হতো? এও কি পূর্ব নির্ধারিত? নবির ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রচিত 'সুরা লাহাব' কি ফেরেস্তাদের পবিত্র হাতে সুরক্ষিত ফলকে লেখা ছিল লাওহে মাহফুজে? নবির জীবনী থেকে আমরা জেনেছি: স্ত্রী না হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁর চাচাতো বোন আবু তালিব তনয়া উম্মে হানির ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন, এটা কেউ না কেউ জেনে ফেলেছিল বা দেখে ফেলেছিল, তাই লোকমুখে জানাজানি হয়ে গেলে পরিবারের বদনাম হবে এমনটা ভেবেই পাবলিকের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অবিশ্বাস্য-অলৌকিক মেরাজের কাহিনি তৈরি করা হয়েছে! পরবর্তীতে এই কাহিনিকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করানোর উদ্দেশ্যে নিকট আত্মীয়স্বজনসহ অন্যান্য পাবলিকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের চাপে মুহাম্মদ 'গল্পের ডাল-পালা-শাখা-প্রশাখা গজিয়ে গজিয়ে' নিজের বেহেস্ত-দোজখের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর তা লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে আবু লাহাবের কানেও পৌছেছিল!"

নরকের ভয়-ভীতি, স্বর্গের লোভ-লালসা, অভিশাপ-ধিক্কার দিয়ে লেখা সবগুলো সুরাই মুহাম্মদের মক্কায় থাকাকালীন সময়ের। সকলকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব হলো না। ভয়ঙ্কর আজাব-শাস্তির কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত মক্কার মানুষেরা জিজ্ঞাসা করলো-সেই দিন কবে আসবে, যেদিন আল্লাহ পাকড়াবেন, কেয়ামত কতো দূর? মুহাম্মদ বললেন-কেয়ামত আসন্ন, কেয়ামত অতি নিকটে!

মক্কার মানুষেরা দিন তারিখ জানতে চায়।

মুহাম্মদ বললেন-আমি কি জানি? আমি তো তোমাদেরই মতো মানুষ।

মানুষ বললো-আমাদের জন্যে গজব নিয়ে এসো।

মুহাম্মদ বললেন-আল্লাহ চতুর্দিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রমণ করেন।

মানুষ বললো-তবুও নিয়ে এসো প্রমাণস্বরূপ।

মুহাম্মদ বললেন- তোমরা কি দেখো নাই পূর্বে কতশত জনপদ আল্লাহ ধ্বংস করেছেন?

তারা বলে -আমরা দেখি নাই, আমার বিশ্বাস করি না।
মুহাম্মদ বললেন-আমি যতদিন তোমদের মাঝে আছি, ততদিন আল্লাহর গজব আসবে না। আল্লাহর আজাব, গজব, মর্মন্তুদ শাস্তি, কেমন হয়, কেয়ামত কাকে বলে দেখানোর জন্যে ১০ বছর পর মুহাম্মদ ঢাল-তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে মদিনায় নিজেই 'কেয়ামত' হয়ে নাজিল হন। মুহাম্মদ তার মনের গোপন বাসনা, ইসলাম প্রচারের নীল-নকশা, তাঁর চাচা আবু-তালিব ছাড়া জগতের কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করেননি, এমন কি খাদিজার কাছেও না।
অবিশ্বাসীদের প্রশ্নবাণে মুহাম্মদ তিক্ত-বিরক্ত। দিনদিন তারা তাঁর প্রতি কঠোর হচ্ছে। তিনিও যৌক্তিক কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। পারছেন না কোন ম্যাজিক বা নিদর্শন দেখাতে। কোরানের বাণী নিয়ে আল্লাহ (?) আসলেন নবিকে সান্ত্বনা দিতে, "তারা বলে, তাঁর প্রভু কেন তাঁর কাছে কোনো নিদর্শন বা প্রমাণ পাঠান না? বলো, গায়েবি (অদৃশ্য বিষয়) শুধু আল্লাহর কাছে আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।" (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ২০)। "তারা আরও বলে, এ এক অলীক স্বপ্ন, সে এটি তৈরি করেছে, সে একজন কবি, সে বরং কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন পূর্ববর্তী নবিগণের কাছে এসেছিল।" (সুরা আম্বিয়া ২১, আয়াত ৫)।
মুহাম্মদ মক্কি জীবনের প্রত্যেকটি সুরায় বারবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, কীভাবে জবরদস্ত পরাক্রমশালী আল্লাহ তার শক্তির নিদর্শনস্বরূপ বহু জনপদ ধ্বংস করেছেন, আর তার নবীগণ লাঠিকে সাপ বানিয়ে, জলকে দ্বিখণ্ডিত করে, মৃতকে জীবিত করে, আগুনের ভেতরে ঢোকে, মাছের ভেতরে বাস করে, কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে, বাতাসে উড়াল দেয়ার ক্ষমতা দেখিয়ে, কি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন রেখে গেছেন! পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে হিসেব করলে দেখা যায়, বর্তমানে প্রচলিত কোরান শরিফের প্রথম ৮৯টি সুরার মধ্যে ২৭বার হযরত মুসার সাথে সম্রাট ফেরাউনের সংঘর্ষের কাহিনিসহ আরো কিছু কাহিনি বারেবারে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ প্রতি ৩.৩ সুরার মধ্যে একই কাহিনি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে! আর এই কাহিনিগুলোর সবগুলিই হুবুহু একইরূপে অথবা কিছুটা ভিন্নরূপে ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওল্ডটেস্টামেন্ট, নিউটেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থে পূর্বেই প্রচলিত ছিল।[২২]

২২. Don Richardson, Secrets of the Kuran, Regal books, USA 2003 page 33.)

এরপরও অনেক মুসলমান দাবি করেন, মৌলিক সাহিত্যকর্ম হিসেবে 'কোরান' অসামান্য! মুহাম্মদ কিন্তু নিজে বাস্তবে কোনো নিদর্শন দেখাতে পারছেন না। হতাশ হওয়ারই কথা। জিবরাইল(?) মারফত নবির কাছে বাণী এলো: "ওদের আগে অবিশ্বাসী বহু জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, এরা কি তবে বিশ্বাস করবে?" (সুরা আম্বিয়া ২১, আয়াত ৬)। যেহেতু এরা বিশ্বাস করবে না সুতরাং কোনো নিদর্শন দেখিয়ে লাভ নেই-এমন কথায় যে চিড়া ভিজবে না, এরা যে এমন সুবোধ বালক নয়, মুহাম্মদ তা টের পেয়ে গেছেন। মুহাম্মদ শুধু কালক্ষেপণ করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। মক্কা থাকাবস্থায় ছলাকলা কৌশল ব্যতীত বল প্রয়োগের ক্ষমতা নেই। মাত্র ১৪/১৫ জন লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছে, তাও দু-একজন বাদে সকলই সমাজের বঞ্চিত, দারিদ্র ক্লিষ্ট নিম্নবিত্তের লোক। এদিকে কোরায়েশ নেতাগণ লক্ষ্য করলেন, মুহাম্মদ তাঁর মিষ্টভাষায় রূপকথার কল্পকাহিনি শুনিয়ে শিশু-কিশোরদের মগজ ধোলাই করে নিচ্ছেন। আবু তালিবের ছেলে হজরত আলি এর প্রথম 'ভিক্টিম'। চিন্তিত কোরায়েশ নেতাগণ আবু তালিবের শরণাপন্ন হলেন। তারা সমঝোতা করবেন মুহাম্মদের সাথে, এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাবও পাঠালেন। প্রস্তাবটি হলো: মুহাম্মদ এবং নবদীক্ষিত মুসলমানেরা যদি এক বছর তাঁদের তিন প্রধান দেবীসহ (আল্লাত, মানাত, উজ্জা) অন্যান্য দেব-দেবীগণকে স্বীকার করে উপাসনা করেন, তবে তাঁরাও পরের বছর মুহাম্মদের আল্লাহকে মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাঁর উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে। কিন্তু মুহাম্মদ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাঠ করলেন সুরা কাফেরুন: Say O Muhammad, O Al-Kafirun, I worship not that which you worship, Nor will you worship that which I worship. And I shall not worship that which you are worshipping. Nor will you worship that which I worship. To you be your religion, and to me my religion. (সুরা কাফিরুন ১০৯, আয়াত ১-৬)। মুহাম্মদের এ বক্তব্যে হতাশ হলেন কোরায়েশ নেতাগণ। তারা আবার গেলেন আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব নিজে মুহাম্মদের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীন ভাতিজার প্রতি অপরিসীম মায়াও ত্যাগ করতে পারেন না। তাই ভাতিজাকে কাছে ডেকে এনে বললেন: "তুমি কি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেবে না?" মুহাম্মদ বললেন: "প্রিয় চাচা, পারসিয়ানদেরকে পদানত করে আমি আরববিশ্বে কোরায়েশ বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আপনি একটিবার বলুন, আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর প্রেরিত

পুরুষ।" রাজনীতি কাকে বলে, কোরায়েশ বংশের এই প্রবীণ নেতা আবু তালিব ভালই বুঝেন; জবাব দিলেন: "তোমার যা ইচ্ছে খুশি তা-ই করো, তবে আমি জীবিত থাকতে কাউকে তোমার অনিষ্ট করতে দেবো না।" মুহাম্মদ আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু আশঙ্কামুক্ত হতে পারলেন না। নানা চাপে মুহাম্মদও সাময়িক সমঝোতার পথ খোঁজছিলেন। সমঝোতার কৌশলও বের করে ফেললেন দ্রুত। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দের একদিন মক্কার বিশিষ্ট নাগরিকরা কাবা ঘরের পাশে জড় হয়ে শহরের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় সেখানে হাজির হন মুহাম্মদ। তিনি তাঁদের পাশে বসে প্রথমবারের মতো আবৃত্তি করতে লাগলেন কোরান শরিফের বিখ্যাত ৫৩ নম্বর সুরা 'নজম'। যখন তিনি মধ্যখানের ১৯-২০ আয়াত বা চরণে এসে যে দুটো বাক্য উচ্চারণ করলেন তা নিয়ে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। আয়াত দুটো ছিল: "আফারাআইতুসুল লাতা ওয়াল উজ্জা"; "তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও উজ্জা সম্বন্ধে?" (আয়াত ১৯)। পরের আয়াতটি হচ্ছে "ওয়া মানাতাছ্ ছালাছাতুল উখরা, তিল্কাল গারানিকা তালাউলা ওয়া আন্না শাফাতুহুন্না লাতারজা।" (আয়াত ২০)। ২০ নং আয়াতের প্রথমাংশের অর্থ হলো: "আর তৃতীয় দেবী 'মানাত' এর কথা?" দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো: "তারা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন দেবীগণ, নিশ্চয়ই আমরা তাদের মধ্যস্থতা আশা করি।" সুরা নজম-এর ১৯ ও ২০নং আয়াতের ইংরেজি হচ্ছে, Have you thought of al-Lat and al-Uzza and Manat, the third... these are the exalted Gharaniq whose intercession is approved. ২০ নম্বর আয়াতের দ্বিতীয় অংশটুকু বর্তমান কোরানে নেই; সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামপূর্ব আরবে অত্যন্ত সম্মানিত দেবী ছিলেন 'লাত, মানাত, উজ্জা'; যারা 'আল্লাহর কন্যা' (বানাতাল্লাহ) হিসেবেই আরববাসীর কাছে অধিক পরিচিত।

আরবিভাষী নাবাতিয়েনেরা আল্লাতকে যুদ্ধের দেবী হিসেবে পূজা করতো (গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরাডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৫) আল্লাতকে আরবের বিশেষ করে নাবাতিয়েনদের মহান দেবী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন) আর উজ্জা ছিলেন আরবের প্রেমের দেবী, পশু ও মানুষ বলি দেওয়া তাঁর আরাধনার অঙ্গবিশেষ; আল-কালবি'-র লেখা থেকে জানা যায় যুবা বয়সে স্বয়ং মুহাম্মদও এই দেবীকে উদ্দেশ্যে করে একবার বলি দিয়েছিলেন।[২৩] মানাত ছিলেন ভাগ্যের

---

[২৩] আরব জাতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯৩

দেবী; পাশপাশি আরবদের কাছে আল্লাত চন্দ্রের, মানাত শুক্র গ্রহের এবং উজ্জা ছিলেন লব্ধক (সাইরিয়াস) নক্ষত্র প্রতিনিধিত্বকারী। কাবাঘরে 'তাওয়াফ' করতে প্যাগান কোরায়েশরা এই দেবীদের নাম উচ্চারণ করতেন; এখন যেমন মুসলমানরা হজের সময় কাবাঘরে 'তাওয়াফ' করতে গিয়ে 'লাব্বায়েক আল্লাহুমা লাব্বায়েক...' বলেন। মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তায়েফে আল্লাত দেবীর বিশেষভাবে পূজা হতো; মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল পূর্ব দিকে নাখলাতে উজ্জা দেবীর এবং মক্কা থেকে অনতিদূরে মদিনার (পূর্ব নাম 'ইয়াসরিব')পথে কোদাইদ নামক এলাকায় মানাত দেবী পূজিত হতেন। যাহোক, উপস্থিত কোরায়েশগণ টেনশনমুক্ত হলেন, কেউ কেউ আনন্দিত হলেন, উল্লসিত হলেন ভাবলেন ঠিক আছে, মুহাম্মদ অন্তত পিতৃপুরুষের ধর্মীয় রীতি মেনে নিয়ে দেব-দেবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জানা যায়, মুহাম্মদ সুরা নজমের শেষ বাক্যটা বললেন এভাবে: "অতএব তোমরা আল্লাহকে সেজদা কর এবং তারই উপাসনা কর।" মুহাম্মদের বক্তব্য শেষে অনেকেই ভূমিতে আনত হয়ে সেজদা দিল। উল্লেখ্য, তখনকার আরববাসীরা মোটামুটি সর্বধর্মসমন্বয়তায় বিশ্বাস করতো বিধায় মক্কার কাবাঘর ছিল বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পবিত্র উপাসনালয়। তাই মুহাম্মদ যখন প্রথমাবস্থায় তার নূতন ধর্মের কথা বলতেন, কেউ তেমন একটা প্রতিবাদ করেনি; যতদিন পর্যন্ত না মুহাম্মদ তাদের ধর্মের ওপর আঘাত করেছেন। মুহাম্মদ দেখলেন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পিতৃপুরুষের ফিরে গেছেন, এ রকম একটি খবর দ্রুত মক্কা ছেড়ে পাশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে পৌঁছালো। পৌঁছালো খ্রিস্টান অধ্যুসিত রাজ্য আবিসিনিয়াতেও; যেখানে কতিপয় নব্য-মুসলমান মক্কা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। খবরটি নব্য-মুসলমানদের কানে পৌঁছুতেই এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মক্কায় ফিরে আসে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে যায়। দূরদর্শিতার ফলে নবিজি বুঝতে পারলেন, এই আপোষ-রফার ফলে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা মাঠে মারা যেতে পারে। তাঁকে আবারো কৌশল অবলম্বন করতে হলো, নিয়ে আসতে হলো কোরানের বাণী। যেহেতু উপস্থিত জনতা এক বাক্যে সবাই সাক্ষী দিচ্ছেন যে তারা ঐ আয়াতটি শুনেছেন, মুহাম্মদ স্বীকার করলেন যে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল সত্য, তবে তা তাঁর নিজের বা তাঁর আল্লাহর মুখের বাণী ছিল না। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন যে, শয়তান তাঁর (মুহাম্মদের) কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল। মানুষ তাজ্জব হয়ে গেল, শয়তান মুহাম্মদকেও ভুলাতে পারে, তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে পারে?

মুহাম্মদ কোরানের দোহাই দিলেন: “এবং শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তুমি তর্ককারীদের সাথে বসে থেকো না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ বদলায়। ...আমি কিছু আয়াত তোমাকে ভুলিয়ে এর পরিবর্তে ভাল বা এর অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।” (সুরা আনআম ৬, আয়াত ৬৮ এবং সুরা বাকারা ২, আয়াত ১০৬)।

মুহাম্মদকে আল্লাহর প্রেরিত আয়াত ‘শয়তান' ভুলিয়ে দেয় কিংবা আল্লাহ নিজেই ভুলিয়ে দেন বা পুরাতন বাক্যের চেয়ে উত্তম বাক্য আল্লাহ পাঠান -এরূপ কাহিনিকে রূপকার্থে ব্যবহার করে ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে (২৬ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক সলমান রুশদির সেই বিখ্যাত বই ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ (শয়তানি আয়াতসমূহ)। বইটি প্রকাশ হওয়ার পরের বছর ‘ইসলামকে কটাক্ষ করা ও মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেওয়ার’ অভিযোগ তুলে সলমান রুশদি এবং তার বইটির বিরুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯) ফতোয়া জারি করলেন "I inform the proud Muslim people of the world that the author of the Satanic Verses book, which is against Islam, the Prophet and the Koran, and all those involved in its publication who are aware of its content are sentenced to death." একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত বিশ্বের সবগুলো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেই ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উগ্রপন্থীরা এশিয়া-ইউরোপের-আফ্রিকার অনেক দেশ যেমন জাপান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইরান সৌদি আরব, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ইটালি, নরওয়ে, মিশর, মরোক্ক প্রভৃতি দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-ভাঙচুর করে, আগুনে পুড়িয়ে দেয় রুশদির বই। বই বিক্রির অপরাধে বোমা মেরে গুড়িয়ে দেয় লাইব্রেরি। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ইসলামি মৌলবাদীরা রুশদির বইয়ের জাপানি অনুবাদক হিতোশি ইগারশিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে, ইটালিয় অনুবাদক ইত্তোরে ক্যাপরিয়লিকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরিকাঘাত করে। ১৯৯৩ সালে জুলাই মাসে তুর্কি লেখক এবং অনুবাদক আজিজ নেসিনের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়; কারণ তিনি তুরস্কের এক পত্রিকার কলামে রুশদির বই থেকে কিছু উদ্বৃতি দিয়েছিলেন; একই বছরের অক্টোবর মাসে নরওয়েজিয়ান প্রকাশক উইলিয়াম নিগার্ডকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ বছরই ইরানের খোরদাদ ফাউন্ডেশন রুশদির মস্তকের জন্য তিন লক্ষ মার্কিন ডলার পুরুষ্কার ঘোষণা করে। পরের বছর তা বাড়িয়ে ছয় লক্ষ মার্কিন ডলার করা হয়! ১৯৯৯

সালে আরেকটি ইরানি ফাউন্ডেশন রুশদিকে হত্যার জন্য ২.৮ মিলিয়ন পুরুষ্কার ঘোষণা করে এবং খোরদাদ ফাউন্ডেশন পুনরায় (২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) রুশদিকে হত্যার জন্য ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরুষ্কার ঘোষণা করে এবং এ ঘোষণা এখনো বলবৎ আছে। বর্তমানকালের ইসলামি পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিদ, আলেম, ওলামা কেউই স্বীকার করতে চান না, নবি মুহাম্মদের উপর শয়তানও ভর করতে পারে। তাঁদের মতে এটা অমুসলিমদের শয়তানি, নবির মহত্ত্বের উপর অহেতুক কলঙ্ক আরোপের অপচেষ্টা। নবিজি ভুল করেছেন অথবা কোরায়েশদের সাথে সমঝোতার স্বার্থে নিজেই বানিয়েছিলেন এ আয়াত, পরে সমঝোতা ভেস্তে যাওয়াতে সরে এসেছেন এখান থেকে, এটা মনে করলে তাকে ধর্ম-বিরোধী (Heretical) বলা যেতে পারে; তাই বেশিরভাগই ইসলামি বুজুর্গরা এ ব্যাপারে চুপ থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কিন্তু আধুনিককালের কোনো কোনো নবিচরিত রচনাকারীরা শুধু চুপ থাকাই নয়, সরাসরি অস্বীকার করছেন এ ঘটনার এবং তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন; যেমন আমাদের মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর বিখ্যাত নবি জীবনী 'মোস্তফা চরিত'-এ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 'নবির ওপর কলঙ্ক আরোপের' অপকর্মের (?) প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, নবি মুহাম্মদের মুখে কথা বসানো শয়তানের পক্ষে অসম্ভব। তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন আরেক ইসলামি পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলির বক্তব্যের। কারণ আমীর আলি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Spirit of Islam' -এ কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করে স্বীকার করেছেন শয়তানি প্রণোদনার কথা![২৪]

উপন্যাস ইতিহাস নয় এবং ইতিহাসের বিকৃতিও নয়; তবে যে মূল ইস্যুটিকে (শয়তানি আয়াত) কেন্দ্র করে মুসলিম মৌলবাদীদের এতো লঙ্কাকাণ্ড, তা কিন্তু এমন নয় যে, সলমান রুশদি নিজে এমন কাহিনি তৈরি করেছেন, ইসলামের ইতিহাসে যার অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র নেই। কোরান শরিফে তো স্পষ্টই রয়েছে: "আমি তোমার পূর্বে যেসব নবি এবং রসুল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ আয়াতগুলোকে সুসংবদ্ধ করেন।" (সুরা হজ ২২, আয়াত ৫২)। শয়তান যে নবি-রসুলের উপর অনেক আগে থেকেই ভর করে আসছে, এবং ভর করতে পারে সেটা স্বয়ং আল্লাহই স্বীকার করে নিচ্ছেন! এবং এই কোরান শরিফেও তো রয়েছে, বেহেস্তের মধ্যেই হজরত আদম-হাওয়াকে শয়তান বিভ্রান্ত

---

[২৪] Ameer Ali, The Spirit of Islam, Low Price Publications, Delhi, India, 2002, page 34-35

করেছিল। (সুরা আল আরাফ ৭, আয়াত ১৮৯-১৯২)। তাহলে কেন ইসলামি বুজুর্গদের এতো ঢাক ঢাক! কেন এতো ঢক্কানিনাদ!

‘শয়তানি আয়াতে’-র কথা প্রথম জানা যায়, নবি মুহাম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবন ইসহাকের (মৃত ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বহুল প্রচারিত গ্রন্থ ‘সিরাত রসুলাল্লাহ’ গ্রন্থে নবি মুহাম্মদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেই তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবন ইসহাকের লেখাতে আমরা পাই, “মুহাম্মদ যখন কোরায়েশদের দেব-দেবী নিয়ে বললেন, তখন কোরায়েশরা অত্যন্ত উল্লসিত হলো; ...তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের দেব-দেবী নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন।” ইবন ইসহাক আরো বলেন, “জিব্রাইল এসে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, এ কী করলেন মুহাম্মদ? আমি যা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তা আপনি জনসাধারণের সামনে পাঠ করেননি। যা নিয়ে আসিনি, তাই আপনি পাঠ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ কোরায়েশদের দেব-দেবী সম্পর্কে আগের দেওয়া বক্তব্য তুলে নিলেন।”[২৫] ইবন ইসহাকের পর মুহাম্মদের জীবনীকার আল-ওয়াকিদি (মৃত ৮২৩), ইবন হিশাম (মৃত ৮৩৪), ইবন সাদ (মৃত ৮৪৫) কোরানের তফসিরকারক মুহাম্মদ ইবন-জরির আল-তাবারি (মৃত ৯২৩), আল-জামাখশারি (মৃত ১১৪৩), আল-বাদাবি (মৃত ১২৮৬/১২৯১)-সহ আরো অনেকেই এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করেছেন। ইবন সাদের (তিনি আল-ওয়াকিদির সেক্রেটারি হিসেবে পরিচিত) লেখাতে দেখি একই বক্তব্য: Then the apostle of Allah, approached them (Quraysh) and got close to them, and they also came near to him. One day he was sitting in their assembly near the Ka'bah, and he recited: "By the Star when it sets", (53:1) till he reached, "Have ye thought upon Al-Uzza and Manat, the third, the other". (53:19-20) Satan made him repeat these two phrases: "These idols are high and their intercession is expected". The apostle of Allah repeated them, and he went on reciting the whole surah and then fell in prostration, and

[২৫] (Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, ‘The Life of Muhammad’, (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004, Page 165-166)

the people also fell in prostration with him...[২৬] (আরো দেখুন: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ১৯, নাম্বার ১৭৭)।

বুঝা যায়, শয়তানি আয়াতের ঘটনা ইসলামের ইতিহাস, কোরানের ইতিহাস, মুহাম্মদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এটা এমন নয় যে, ইসলাম-বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। তাহলে, চক্রান্তকারীদের দলে মুহাম্মদের জীবনীকার, কোরানের তফসিরকারক, হাদিস সংকলক অনেকেই ফেলে দিতে হয়। আর কোরানেও তো এই ঘটনার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। আমরা আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি, জিন-ভূত-দৈত্য-দানো-শয়তান-আল্লাহ-ঈশ্বর এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই; মানসিক বিভ্রম মাত্র। তাহলে মুহাম্মদ কেন শয়তানের অজুহাত টেনে আগের অবস্থান থেকে সরে আসলেন? কারণ, যেমনটা ভেবে সমঝোতার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, সেটা কোরায়েশদের বিপুল প্রচারের কাছে হেরে গিয়েছিল, এতে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ভেস্তে যাচ্ছিল; যার ফলে তাঁকে তাঁর বক্তব্য 'শয়তানের দোহাই' দিয়ে তুলে নিতে হয়েছিলো।

মুহাম্মদের নিজের খেয়াল খুশি মতো কিংবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আল্লাহর বাণী' কোরানের আয়াতকে পরিবর্তন করার এটা একটা উদাহরণমাত্র। এ ধরনের আরো দুয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক: আল-বারা হতে বর্ণিত, নবিজি একটি প্রত্যাদেশ জানালেন, "যেসব মুসলমান বাড়িতে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে, তাদের মর্যাদা সমান নয়।" প্রত্যাদেশ পেয়ে বললেন, জায়িদকে ডাকো, কালির দোয়াত এবং হাড়ের টুকরো লাগবে লেখার জন্য। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় লেখা শুরু হলো: মর্যাদা সমান নয় যেসব মুসলিম বসে থাকে...। এমন সময় নবির পাশে বসে থাকা আমর বিন উম্মে মাকতুম নামের একজন অন্ধ ব্যক্তি বলে উঠলো: হে আল্লাহর নবি, এই আয়াতে আমার জন্য আদেশ কী, আমি তো অন্ধ লোক। নবি আবার ধ্যানমগ্ন হলেন, প্রত্যাদেশও পেয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ: "মুসলিমদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে, তাদের মর্যাদা সমান নয়।" (সুরা নিসা ৪, আয়াত ৯৫)। সহিহ বোখারি শরিফে উল্লেখ আছে-

---

[২৬] Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1, Part 1 & 2, Pakistan Historical Society, Pakistan, Page 236-239.)

Narrated Al-Bara:
There was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) and those who strive and fight in the Cause of Allah.' (4.95)
The Prophet said, "Call Zaid for me and let him bring the board,
the ink pot and the scapula bone (or the scapula bone and the ink pot).'"
Then he said, "Write: 'Not equal are those Believers who sit..", and at that time
'Amr bin Um Maktum, the blind man was sitting behind the Prophet . He said,
"O Allah's Apostle! What is your order for me (as regards the above Verse)
as I am a blind man?" So, instead of the above Verse, the following Verse was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) except those who
are disabled (by injury or are blind or lame etc.) and those who strive and fight in the cause of Allah.' (Sura Nisa 4.95)
(দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫১২)।
সুরা আনআমে বলা আছে, "আল্লাহর বাণী কেহ পরিবর্তন করতে পারবে না।" (no change can there be in the words of Allah.) (সুরা আনআম ৬, আয়াত ৩৪)। এখন দেখা যায়, সামান্য একজন অন্ধব্যক্তিও আল্লাহর বাণী সংশোধন করে দেয়!
হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত: ..." আমরা পাঠ করলাম, জানিয়ে দাও আমাদের লোকদের যে আমরা আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি খুশি হয়েছেন এবং আমরাও অত্যন্ত খুশি হয়েছি।" পরবর্তীতে এই আয়াতটি কোরান শরিফ থেকে বাতিল করা হয়।
Narrated by Anas
The Prophet sent seventy men from the tribe of Bani Salim to the tribe of Bani Amir. When they reached there, my maternal uncle said to them, "I will go ahead of you, andif they allow me to convey themessage of Allah's Apostle (it will be all right); otherwise you will remain close to me." So he went ahead of them and the pagans granted him security but while he was reporting the message of the Prophet, they beckoned to one of their men who stabbed him to death. My maternal uncle said, "Allah is Greater! By the Lord of the Kaba, I am successful." After that they attached the rest of the party and killed them all except a lame

man who went up to the top of the mountain. (Hammam, a sub- narrator said, "I think another man was saved along with him)." Gabriel informed the Prophet that they (i.e the martyrs) met their Lord, and He was pleased with them and made them pleased. We used to recite, "Inform our people that we have met our Lord, He is pleased with us and He has made us pleased" Later on this Quranic Verse was cancelled. The Prophet invoked Allah for forty days to curse the murderers from the tribe of Ral, Dhakwan, Bani Lihyan and Bam Usaiya who disobeyed Allah and his Apostle.
(Bukhari Shareef, Volume 4, Book 52, Number 57)

খলিফা হজরত ওমর (বিন আল-খাত্তাব) থেকে বর্ণিত: আমার প্রভু আমার সাথে তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রথমত আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, আমার ইচ্ছা আব্রাহামের (ইব্রাহিম) স্থানকেই (কাবা ঘর) আমাদের প্রার্থনার জায়গারূপে নিতে চাই। পরবর্তীতে প্রত্যাদেশ এলো: "আর আমি কাবা ঘরকে মানুষের প্রার্থনাস্থল করেছিলাম...।" (সুরা বাকারা ২, আয়াত ১২৫)। দ্বিতীয়ত আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে আদেশ দিন, তারা যেন সাধারণ মানুষ থেকে পর্দা মেনে চলে, কারণ যেকোনো সময় তাঁদেরকে খারাপ-ভালো কোনো কিছু কেউ বলে ফেলতে পারে। পরবর্তীতে নবীপত্নীদের প্রতি পর্দা মেনে চলার আয়াত নাজিল হয়। (সুরা নুর ২৪, আয়াত ৩১)। তৃতীয়ত, একবার নবির স্ত্রীগণ নবির বিরুদ্ধে অবস্থান নিল; তখন আমি তাদেরকে বললাম, তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে আল্লাহতালা নবিকে তোমাদের থেকে অনেক ভালো স্ত্রী দেবেন। পরবর্তীতে আমি যেমনটি বলেছিলাম সে রকম একটি আয়াত নাজিল হল। (সুরা তাহরিম ৬৬,আয়াত ৫)।

Narrated by 'Umar (bin Al-Khattab
My Lord agreed with me in three things: 1. I said,"O Allah's Apostle, I wish we took the station of Abraham as our praying place (for some of our prayers). So came the Divine Inspiration: And take you (people) the station of Abraham as a place of prayer (for some of your prayers e.g. two Rakat of Tawaf of Ka'ba)". (2.125) 2. And as regards the (verse of) the veiling of the women, I said, 'O Allah's

Apostle! I wish you ordered your wives to cover themselves from the men because good and bad ones talk to them.' So the verse of the veiling of the women was revealed. 3. Once the wives of the Prophet made a united front against the Prophet and I said to them, 'It may be if he (the Prophet) divorced you, (all) that his Lord (Allah) will give him instead of you wives better than you.' So this verse (the same as I had said) was revealed." (66.5). (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৮, নম্বর ৩৯৫)

সুরা বাকারাতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, কোরানের আয়াত নিয়ে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে, তার মতো কোনো সুরা আনো। (সুরা বাকারা ২, আয়াত ২৩)। চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার জন্য আরবেরা কোরানের সুরা বানাবার আগেই শয়তান নিজেই সুরা নিয়ে হাজির!! এরপরও কী করে মুসলিম পণ্ডিতরা দাবি করেন, কোরানের সুরার মতো কোনো সুরা কেউ বানাতে পারবে না?

কোরানের ১১৪টি সুরার মধ্যে ৯০টিই মক্কায় রচিত। স্থান-কাল-সময়-তারিখ নির্দিষ্ট করে জগতের তাবৎ মুসলমান কোনোদিনই একমত হয়ে বলতে পারবেন না যে এই বইখানি প্রথম কোন বাক্য দিয়ে শুরু করে কোন বাক্যে শেষ হয়েছে; সুরা সমূহের কোন সিরিয়েল নাম্বারে বর্তমান কোরানখানি রচিত। কোরানের গ্রন্থনা যেভাবে হয়েছে তা শুধুই বিশৃঙ্খল বলেই বর্ণিত করা যায়। বিভিন্ন অধ্যায়কে (সুরা) সাজাতে কোনো কালানুক্রম মানা হয়নি। স্রেফ কোন অধ্যায়টি আয়তনে কত বড়, সেই অনুযায়ী অধ্যায়গুলি সাজানো হয়েছে। যে অধ্যায়গুলি বড় (শুধু ব্যতিক্রম প্রথম সুরা আল-ফাতিহা, যদিও সুরা ফাতিহাকে অনেকে কোরানের অংশ বলেই স্বীকার করেন না) সেগুলি গোড়ায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া বহুক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন বিষয়ের টুকরো টুকরো অংশ দিয়ে এক একটি অধ্যায় তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ছন্দ ছাড়া কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। বহুক্ষেত্রেই মুহাম্মদ প্রকৃতপক্ষে যা বলেছেন সেইসব কথার মূল প্রসঙ্গ উদ্ধার করা অসম্ভব। কোন প্রসঙ্গে বা কোন পরিস্থিতিতে সেগুলি অবতীর্ণ হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। এই পরিস্থিতিতে কোরানকে বুঝতে-জানতে আমাদের দ্বিতীয় মূল তথ্যের উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। তা হল, হাদিস।

এবার সুরা ফাতিহা নিয়ে কিছু কথা; আরবি 'ফাতিহা' শব্দের অর্থ 'শুরু', 'ভুমিকা' বা 'উদ্বোধন'। সুরাটির অপর নাম 'সাবউল মাসানি'। 'ফাতিহা' কি আল্লাহ প্রদত্ত ওহি বা প্রত্যাদেশ, এ প্রশ্নটি কোন ইসলামবিরোধীদের কাছ থেকে আসেনি, প্রশ্নটি সময়ে সময়ে তুলেছেন খোদ মুহাম্মদের সাহাবিগণই। আগে সুরা ফাতিহাটি দেখা যাক;

১, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।
২, করুণাময় ও দয়ালু।
৩, বিচার দিনের মালিক।
৪, আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
৫, আমাদেরকে পরহেজগারদের পথ দেখাও।
৬, সেই সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো।
৭, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

ইংরেজি অনুবাদটাও দেখা যাক;
Praise belongs to God, the Lord of the Worlds,
The merciful, the compassionate,
The ruler of the day of judgement! Thee we serve and
Thee we ask for aid. Guide us in the
Right path, the path of those Thou art gracious to;
Not of those Thou art wroth with, nor of those who err.

দুটো অনুবাদকেই আমরা মূলানুগ বলে ধরে নিতে পারি। সুরাটির কোনো বাক্যের শুরুতে 'কুল' বা 'বলো' বা 'পাঠ করো' কিংবা 'Read' বা 'Say' লেখা হয়নি। যদিও পরবর্তিতে (অনেক পরে) কিছু কৌশলী অনুবাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বন্ধনীর ভিতর বা বন্ধনী ছাড়াই 'কুল' বা 'বলো' শব্দ যোগ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কোরানে এই 'কুল' বা 'বলো' শব্দটি ৩৫০ বার খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কতোটি নবি মুহাম্মদ ও তার সাহাবিরা লাগিয়েছেন আর কতোটি এর অনুবাদকেরা লাগিয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেমেটিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক Arthur Jeffery তার 'A Variant Text of the Fatiha প্রবন্ধে

লিখেছেন, শিয়া মতাবলম্বীদের সুরা ফাতিহার বেশ পুরাতন একটি ভিন্ন পাঠ তার সংগ্রহে আছে।[২৭]

সুরা ফাতিহা প্রার্থনা হিসেবেই মুহাম্মদ উচ্চারণ করেছিলেন যেমন অন্যান্য সময়ও করেছেন, কিন্তু এই প্রার্থনাবাক্যই যে একদিন কোরানে ঢুকানো হবে তা সয়ং মুহাম্মদও হয়তো জানতেন না। 'ফাতিহা' বা 'ভুমিকা' নাম দিয়ে কোরানের প্রারম্ভে নিয়ে এসেছেন সঙ্কলন কমিটির সদস্যরা। দেখা যাক পুরাতন ভার্সনের সুরা ফাতিহা কেমন ছিল-

Nuhammidu 'llaha, Rabba 'l-alamina

'R-rahmana 'r-rahi ma,

Mallaka yaumi'd - dini,

Hayyaka na'budu wa wiyyaka nasta i nu,

Turshidu sabi la'l - mustaqi mi,

Sabi la 'lladhi na na' 'amta 'alaihim,

Siwa 'l - maghdu bi 'alaihim, wa la'd - dall i na

ইংরেজিতে অনুদিত ভিন্ন পাঠটি হচ্ছে-

We greatly praise Allah, Lord of the worlds,

he Merciful, the Compassionate,

He who has possession of the Day of Judgement.

Thee do we worship, and on Thee do we call for help.

Thou dost direct to the path of the Upright One,

The Path of those to whom Thou hast shown favour,

Not that of those with whom Thou are angered, or those who go astray

তো শিয়াদের কাছে এই প্রার্থনা বা সুরা ফাতিহা আসলো কোত্থেকে? না কি বর্তমান সুরা ফাতিহা পুরাতনটারই নতুন ভার্সন?

---

[২৭] Tadhkirat al-A'imma of Muhammad Baqir Majlisi (edition of Tehran, 1331, page 18

বিখ্যাত কোরান সমালোচক ইবনে ওয়ারাক বলেন-

These words are clearly addressed to God, in the form of a prayer. They are Muhammad's words of praise to God, asking God's help and guidance.[২৮]

প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সংগৃহিত কোরানে সুরা 'ফাতিহা' সুরা 'ফালাক' ও সুরা 'নাস' এই তিনটি সুরার স্থান ছিল না। সুরা 'ফালাক' ও সুরা 'নাস' এর শুরু থেকে 'কুল' শব্দটি বাদ দিলে তা আর কোরানের সুরা হয় না, হয় প্রার্থনা বা দোয়া। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে তাহলে কি সাহাবি ইবনে মাসউদের সময়ে সুরা ফালাক ও সুরা নাস এর শুরুতে 'কুল' শব্দ ছিলনা?

তেমনি একটি দোয়া বা প্রার্থনা মুহাম্মদ মক্কায় থাকাকালীন সময়ে উচ্চারণ করেছিলেন, অথচ সেই বাক্যগুলো কোরান সংকলন কমিটি মদিনায় রচিত সুরা বাকারার শেষাংশে যোগ করে দিয়েছেন। সেই আয়াতগুলো দোয়া হিসেবে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আলেম, ইমাম ও মুসল্লিদের কাছে খুবই প্রীয় যা সচরাচর উচ্চারিত হতে শুনা যায়। আয়াতগুলো হলো- 'রাব্বানা লা তুয়াখিজনা ইন্না ছিনা আও আখ তা' না------------কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা- তুহাম্মিলনা মা-লা তোয়াকাতা লানা- বিহি, অয়া' ফু আন্না ওয়াগফির লানা-ওয়ারহামনা-আনতা মাওলা-না-, ফানসুরনা-আলাল কাওমিল কা-ফিরি-ন'।

'হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এমন দায়ীত্ব অর্পণ করোনা যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু, এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিওনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর'।

"Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us. Our

---

[২৮]Ibn Warraq (Editior), The Origins of the Koran, Prometheus Books, New York, U.S.A, 1998, page 9

Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people." (সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)

প্রশ্ন জাগতে পারে কোরানকে বই এর রূপ দিতে গিয়ে এই সমস্ত প্রার্থনা-বাক্য সমুহ কোরান সংকলন কমিটি তাদের ইচ্ছেমত কোরানে ঢুকানোর জন্যেই কি তারা হজরত আলিকে সংকলন কমিটি থেকে বাদ দিয়েছিলেন? আলি নিশ্চয়ই জানতেন, মুহাম্মদ কোন বাক্য কখন কোথায় কোন পরিস্থিতে উচ্চারণ করেছিলেন কারণ হজরত আলি নবি মুহাম্মদের সার্বক্ষণিক সাথী এবং একজন কাতিব (কোরান লেখক) ছিলেন।

এমনি আরেকটি বাক্য হলো ২৭ নং সুরা নমল এর ৯১ নং আয়াত; 'আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। এবং সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই'।

'I have been commanded to serve the Lord of this city, Him Who has sanctified it and to whom (belong) all things: and I am commanded to be of those who bow in Islam to Allah.s Will'.

এই আয়াতের তর্জমায় চাতুরী করে কিছু অনুবাদক বাক্যের প্রথমে 'বলো' বা 'Say' শব্দ যোগ করে দিয়েছেন।

এবার আরো একটি সুরার একটি আয়াত দেখা যাক। ৬ নং সুরা 'আনাম' এর ১০৪ নং আয়াত; 'তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের রক্ষক নই'।

এখানে 'আমি তোমাদের রক্ষক (কেউ বলছেন পর্যবেক্ষক) নই' কথাটি পরিষ্কারভাবেই মুহাম্মদের নিজের বক্তব্য হিসেবেই তুলে ধরে। আমরা এই আয়াতটির তিনটি ইংরেজি অনুবাদ দেখবো;

Sahih International-

There has come to you enlightenment from your Lord. So whoever will see does so for [the benefit of] his soul, and whoever is blind [does harm] against it. And [say], "I am not a guardian over you." (ব্র্যাকেটে say যোগ করা হয়েছে)
Muhsin Khan-
Verily, proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees, will do so for (the good of) his own self, and whosoever blinds himself, will do so to his own harm, and I (Muhammad SAW) am not a watcher over you.
Yusuf Ali-
quraanshareef.org থেকে;"Now have come to you, from your Lord, proofs (to open your eyes): if any will see, it will be for (the good of) his own soul; if any will be blind, it will be to his own (harm): I am not (here) to watch over your doings."
কোরানের বিখ্যাত অনুবাদক Dawood, Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan সহ আরো অনেকেই অনুবাদের পাদটিকায় এই 'আমি তোমাদের রক্ষক নই' এর 'আমি' কে মুহাম্মদ রূপেই চিহ্নিত করেছেন।
জার্মান স্কলার সলমন রেইনাক মনে করেন: "From the literary point of view, the Koran has little merit. Declamation, repetition, puerility, a lack of logic and coherence strike the unprepared reader at every turn. It is humiliating to the human intellect to think that this mediocre literature has been the subject of innumerable commentaries, and that millions of men are still wasting time in absorbing it." (Reinach 1932:176)

মুহাম্মদের মৃত্যুর ২৩ বছর পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আয়াত বাক্য সংগ্রহ করে সংশোধন-পরিমার্জন করে দুই মলাটের ভিতর নিয়ে এসে একটি বইয়ের রূপ দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবে হ্যাঁ, কোরান সম্পাদনায় সবচেয়ে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে এখানে কোনো কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়নি। মদিনায় আবৃত্তি করা সুরা 'বাকারা' ক্রমিকানুসারে ৯৬ নং সুরা। কিন্তু তা বর্তমান কোরানের ২নং সুরা। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মক্কায় থাকাকালীন সময়ে সুরা 'বাকারা' বাদ দিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণ কোরান পড়তেন কোন ক্রমিকানুসারে?

সুরা 'ফাতিহা' নাজিল হওয়ার পূর্বে নামাজ কি পড়া হতো? হলে কিভাবে হতো? সুরা 'ফাতিহা' নাজিল হয়েছিল কারো কারো মতে ৬ অথবা ৮ অথবা ৪৮টি সুরার পরে। তাহলে কোরান সংকলন কোন সময়ে কোন বছর করা হলো? সুরা ফাতিহা কোরানের প্রথমে আসলো কী ভাবে কখন?

মক্কায় রচিত সুরাগুলো পড়লে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রাণীজগৎ, সৌরজগৎ ও ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। বর্তমানকালে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে গোঁজামিল দিয়ে মেলানোর চেষ্টায় রত মুসলমানদের কোরান শরিফের সেই সকল মক্কি সুরার কিছু কিছু আয়াতের ওপর এবার আলোকপাত করা যাক: "ওয়ালাকাদ বাআছনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসুলান..."। অর্থাৎ "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি...।" (সুরা নহল ১৬, আয়াত ৩৬)। আরব দেশের বাইরে জগতের কোন কোন দেশে, কোন কোন জাতির কাছে রাসুল এসেছিলেন? না কি পৃথিবীতে তখন শুধু আরব দেশেই মানুষের বসতি ছিল? বাঙ্গালি বা চীন জাতির নবির নামটা কী?

তৌরাত শরিফে আছে; 'পৃথিবীর মানুষ ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে আল্লাহ বড় ব্যথিত হলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন, পৃথিবীর সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংস করে দিবেন'। ধ্বংস করার জন্য মহাপ্লাবন সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন এবং হজরত নুহকে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে সংগ্রহ করে রাখার পরামর্শ দিলেন; কারণ পরবর্তীতে তাদের দিয়েই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবেন। নুহ আল্লাহর কথা মত সবকিছুই করলেন। (জেনেসিস, ৬:১৯-২২)। তৌরাতের এই নুহের প্লাবনের কাহিনির সাথে কোরানে অনেকাংশই মিল রয়েছে। 'কোরানে-বিজ্ঞান' খোঁজা মডারেইট মুসলিমগন দাবি করেন কোরানে নাকি হজরত নুহ বা নুহের প্লাবন নিয়ে অবাস্তব কিছু বলা হয়নি! মিশরীয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ ড. তাহা হুসেন (১৮৮৯-১৯৭৩) একদা বলেছিলেন: They must explain what distinguishes Christianity from Islam for both stem from the same source. The essence of Islam is the same essence of Christianity. অর্থাৎ তাঁদেরকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করে দেখাতে হবে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে কী সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। কেননা এই দুই ধর্ম একই উৎস থেকে উদ্ভূত। আমাদের স্বীকার করতে আপত্তি নেই কোরান শরিফে তৌরাত শরিফের মতো বিস্তারিতভাবে নুহের জাহাজের বর্ণনা (জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা)

বা মহাপ্লাবন নিয়ে বক্তব্য দেয়া হয়নি।[২৯] কোরানে স্পষ্ট বলা আছে: "আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর।" (সুরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ১৪)। হজরত নুহ সাড়ে ন'শো বছর বেঁচে ছিলেন সেটা তৌরাত শরিফের জেনেসিসের ৯:২৯ আয়াতেও বলা আছে। কোরান শরিফে উল্লেখ আছে বলেই কোনো ব্যক্তি সাড়ে ন'শো বছর বেঁচে থাকতে পারেন? আরবি ভাষার অধ্যাপক ড. তাহা হুসেন অনেক আগেই এ ধরনের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। অর্ধশতাব্দী ব্যাপী মিশরের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ড. তাহা হুসেন ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিল শির-আল জাহিলি' বা 'On Pre Islamic Poetry' তে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন:

The Torah may speak to us about Abraham and Ishmael and the Quran may tell us about them too, but the mention of their names in the Torah and the Quran is not sufficient to establish their historical existence, let alone the story which tells us about the emigration of Ishmael, son of Abraham, to Mecca and the birth of the Arabs there. We are compelled to see in this story a kind of fiction to establish the relation of the Jews and Arabs on the one hand and Islam and Judaism on the other. তৌরাত শরিফ আমাদেরকে ইব্রাহিম ও ইসমাঈল সম্বন্ধে বলতে পারে এবং কোরানও আমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারে, কিন্তু কেবল তৌরাত ও কোরানে তাঁদের নাম থাকাই যথেষ্ট নয়। গল্পটি আমাদেরকে ইব্রাহিম-পুত্র ইসমাঈলের দেশান্তরী হয়ে মক্কায় গমন, এবং আরব জাতির জন্মের কথা বলে। গল্পটিতে আমরা এক ধরনের অলীক বস্তু দেখতে বাধ্য হই, একদিকে ইহুদি জাতি ও আরব জাতির মধ্যে, অন্যদিকে ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য অলীক কাহিনির সৃষ্টি।[৩০]

কোনো ধর্মগ্রন্থে কোনো কিছুর নাম থাকলেই তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বা ন্যায্যতা প্রকাশ পায় না। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক-এক জোড়া করে নুহের বিশাল নৌকায় উঠানো হয়েছিলা। চীন, রাশিয়া, আফ্রিকা কিংবা ভারতবর্ষের কোনো মানুষ, পশু-পাখি,

---

২৯. Dr. Taha Hussain, The Future of Culture in Egypt, American Council of Learned Societies, Washington, DC, 1954, Page 7

৩০. পার্থিব জগৎ, পৃষ্ঠা ১৫৩

সাপ, কীট-পতঙ্গ কি সেই নৌকায় উঠেছিল? না কি আরব দেশ ব্যতীত তখন জগতে কোনো দেশ বা কোনো প্রাণী ছিল না? চল্লিশ দিন পর নৌকা থেকে নেমে এক জোড়া শামুক বা কেঁচো বা জোঁক সারা পৃথিবীতে বংশবিস্তার করলো কতো দিনে, কীভাবে? নুহের প্লাবন নিয়ে খুব সুন্দর এবং অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছেন বিখ্যাত লেখক এবং কোরান-সমালোচক ইবন ওয়ারক, তিনি বলেন: Noah was asked to take into the ark a pair from every species (sura 11.36-41). Some zoologists estimate that there are perhaps ten million living spices of insects; would they all fit in to the ark? It is true they do not take up much room, so let us concentrate on the larger animals: reptiles, 5,000 species; birds, 9,000 species; and 4,500 species of class of Mammalia. In all, in the phylum Chordata, there are 45,000 species. What sized ark would hold nearly 45,000 species of animals? A pair from each species makes nearly 90,000 individual animals, from snakes to elephants, from birds to horses, from hippopotamuses to rhinoceroses. How did Noah get them all together so quickly? How long did he wait for the sloth to make his slothful way from the Amazon? How did the kangaroo get out of Australia, which is an island? How did the polar bear know where to find Noah?[৩১]

হজরত নুহ আর তাঁর প্লাবনের কাহিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ছাড়াই কোরান শরিফ তা ধার করেছে তৌরাত শরিফ থেকেই! এক আদম আর এক বিবি হাওয়া থেকে সৃষ্ট মানুষগুলো পৃথিবীতে হাজার প্রকার ভাষায় কথা বলেন কেন? ধরে নিলাম মা হাওয়ার ভাষা ছিল আরবি এবং তাঁর সন্তানেরা একটি চতুষ্পদ জন্তুকে 'জামাল' নামে ডাকতো। কিন্তু আদমের সন্তানেরা বাংলাদেশে গিয়ে ঐ জন্তুটিকে দেখে 'উট' আর ইংল্যান্ডে এসে 'ক্যামল' নামে ডাকবে কেন? আদম-হাওয়া কি তাদের সন্তানদেরকে এক-একটি প্রাণীর কয়েক হাজার নাম শিখিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন? না কি ঐ সকল জায়গায় আগে থেকেই ভিন্ন ভাষার মানুষ বাস করতো? কেউ যদি বোকার স্বর্গে বাস না করে তাহলে তার জন্যে ব্যাপারটা বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

---

[৩১] Why I am not a Muslim, page 133

দাবি করা হয় কোরান শরিফ একেবারে খাঁটি আরবি ভাষাতেই রচিত; আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার আরবি ভাষাতেই (Clear Arabic language) কোরান নাজিল করেছেন। প্রাচীন মুসলিম তফসিরকারগণ প্রথম প্রথম কোরানে বিদেশি শব্দ আমদানি বা ঋণের কথা স্বীকার করেছেন; মোতাজিলা পন্থী আরবি গদ্যের বিশেষজ্ঞ আমর ইবনে বাহার (মৃত ৮৬৯ খৃস্টাব্দ) বলেছিলেন, কোরান রচনা ও ভাষায় একটি ভাল গ্রন্থ বটে তবে পুরোপুরি আরবি ভাষায় রচিত নয়। নবির অন্যতম সাহাবি হজরত আব্বাস ইবনে মিরদাস তার নিজের একটি কবিতায় বলেছিলেন, 'ইসলাম' শব্দটিও মুহাম্মদের পূর্বে প্রচলিত ছিল, মুহাম্মদ শুধু এর সংস্কার বা মেরামত করেছেন।[৩২]

তা ছাড়া আরো কিছু শব্দ যেমন, কোরানের চ্যাপ্টারকে 'সুরা' বলা হয়, সুরা শব্দটি এসেছে সিরিয়ান শব্দ 'সুরতা' (Surta) থেকে 'জিকির' জুরকানা (Zurkana) 'সদকা' (Sadaka); এ সকল শব্দগুলো সিরিয়ান খৃস্টানদের বহুল প্রচলিত শব্দমালা। এ সব অপরিবর্তিতভাবেই কোরানে যোগ করা হয়েছে। কোরানের ২৫ নং সুরা 'ফোরকান' নামটি এসেছে আরামাইক খৃস্টান শব্দ 'পোরকান' (Porkhan) থেকে।[৩৩] তবে পরবর্তীতে বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মদ আল শাফিইর (মৃত ৮২০) প্রভাবে কোরান শরিফে বিদেশি শব্দের উপস্থিতি আস্তে আস্তে চাপা দেওয়া হতে শুরু করে। বলা হয় কোরানের প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ আল্লাহ কর্তৃক রচিত এবং প্রেরিত; আরবি ভাষায় খাঁটি ও অবিকৃতভাবে লিখে রাখা হয়েছে। কোরান শরিফের নয় থেকে দশটি আয়াতেও এরকম দাবি রয়েছে। সুরা এবং আয়াতগুলি হচ্ছে: (১) সুরা ইউসুফ ১২, আয়াত ২; (২) সুরা নাহল ১৬, আয়াত ১০৩; (৩) সুরা তাহা ২০, আয়াত ১১৩; (৪) সুরা আশ শোআরা ২৬, আয়াত ১৯৫; (৫) সুরা জুমার ৩৯, আয়াত ২৮; (৬) সুরা হা-মিম সিজদা বা ফুস্সিলাত ৪১, আয়াত ৩,৪৪; (৭) সুরা আশ-শুরা ৪২, আয়াত ৭; (৮) সুরা জুখরুফ ৪৩, আয়াত ৩; (৯) সুরা আহ্কাফ ৪৬, আয়াত ১২। কিন্তু কোরান শরিফের বিখ্যাত তফসিরকার (টীকাকার জালাল আল-দ্বীন আল সুয়ুতি (মৃত ১৫০৫) (Jalaluddin Al- Suyuti, 1445-1505) Precision and Mastery in the Sciences of the Qur'an (Al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an) গ্রন্থের

---

[৩২]. M. M. Bravmann, The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts, Leiden, 1972, Page 26

[৩৩] ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ২০৯-২১০

একটি চ্যাপ্টারে আরবি কোরান শরিফে পাওয়া ১০৭টি বিদেশি শব্দের (অ-আরবি) তালিকা দিয়েছেন, যে শব্দগুলি কোরান শরিফের আগে আরবি ভাষায় রচিত অন্যান্য সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না। তবে কোরান শরিফে বিদেশি শব্দের উপস্থিতি নির্ণয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেমেটিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক Dr. Arthur Jeffery (1892-1959)| তিনি ২৭৫টি বিদেশি শব্দের উপস্থিতি প্রাচীন আরবিয় কোরান শরিফ থেকে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন, যেগুলোর উৎস ইউথোপিয়ান, আর্মেনিয়ান, সিরিয়ান, সাবাতিয়ান, কপটিক, তার্কিশ, গ্রিক, ল্যাটিন, মধ্যপারস্য, ভারতীয় ইত্যাদি অ-আরবি ভাষা। ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, মুহাম্মদ তৎকালীন মক্কার সমাজবিচ্ছিন্ন কেউ ছিলেন না, মক্কাবাসীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতো নবির আশেপাশে কারা থাকে, কাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, তাদের কর্ম-পরিচয় কী ইত্যাদি। তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে কোরায়েশরা সন্দেহ করেছিল, আরবিয় এবং অ-আরবিয় কোন কোন ব্যক্তিবর্গ মুহাম্মদকে কোরান রচনায় সহায়তা করছে। বিভিন্ন ইসলামিক স্কলার মুহাম্মদের জীবনী অধ্যয়ন করে কয়েকজনকে সম্ভাবনার মাধ্যমে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আল-নিসাবোরি। তিনি বলেন,এখানে সম্ভবত পাঁচজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে:- (১) হোতেইব ইবন আব্দুল ইজার সন্তান আইস এবং জাইস, যারা তৌরাত শরিফ সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ ছিল, (২) ফাইক ইবন আল-মোঘেইরা'-র সন্তান সোলেমান আল-পার্সি, যিনি প্রথমে পারস্যের (ইরান) অগ্নিপূজারি জোরাস্ত্রিয়ান ছিলেন পরে খ্রিস্টান হন। পারস্যের জান্দিশাপুরে নেস্টোরিয়ান কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং খ্রিস্টান কাল্ব গোত্রে বসবাস শুরু করেন। মদিনাতে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করার বুদ্ধি মুহাম্মদকে তিনিই প্রদান করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি নবির ওহি লেখকদের (কাতিব) কেউ ছিলেন না, তবে নবির সঙ্গী হিসেবে আলাপ-আলোচনা করতেন। কথিত আছে, কোরানে শেষ বিচারের দিন, ফেরেস্তা ও শয়তান বা ইবলিস ইত্যাদি যে কথা বিধৃত আছে, তার ধারণা নবিকে এই সোলেমান পার্সিই প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে পুরাতন ধর্মগ্রন্থ জেন্দাআবেস্তাতে (জোরাস্ত্রিয়ানদের ধর্মগ্রন্থ) ইবলিস, শেষ বিচারের দিন, মৃত্যুর পর শাস্তি ইত্যাদির কথা বিধৃত আছে। (৩) রোমানিয়া থেকে আগত খ্রিস্টান আমর ইবন আল-হাদ্রমি (৪) মক্কার দুই লোক গাবের এবং ইয়াসর, পেশায় তরবারি বানাতো পাশাপাশি সুন্দর করে তৌরাত এবং বাইবেল পাঠে তাদের প্রচুর খ্যাতি ছিল। নবিজিও

ওদের কাছে এসে তৌরাত-বাইবেল পাঠ শুনতেন। (৫) মক্কার একজন লৌহমানবের কথা বলা হচ্ছে (এই ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি)। আরেক ইসলামিক স্কলার শেখ খলিল আব্দুল করিম কয়েকজন সম্ভাব্য ধর্মীয়গুরুর নাম দিয়েছেন, যাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মক্কার চারিদিকে বেশ প্রসারিত ছিল। তালিকায় প্রথম নাম হচ্ছে নবির প্রথম স্ত্রী খাদিজার চাচাতো ভাই খ্রিস্টান সাধক ওয়ারাকা ইবনে নওফাল (২) সিরিয়ার নেস্টোরিয়ান চার্চের সন্যাসী আব্বাস (৩) সারজিয়োস।

সুরা ফুরকানের ৫৯নং আয়াতে বলা হল: "আল্লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ামা বাইনাহুমা ফিছিত্তাতি আইয়্যাম...।" অর্থাৎ "তিনিই ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন।" (আরবি 'য়্যাওমু' শব্দের অর্থ দিন। 'আইয়্যাম' য়্যাওমুর বহুবচন)। ছয় দিনের হিসেবটা কীভাবে করা হলো? আর 'নিরাকার' আল্লাহ সৃষ্টি করে কীভাবে সিংহাসনে আসীন হলেন, বা সৃষ্টির আগে কোথায় ছিলেন? আল্লাহ সূর্য আগে, না পৃথিবী আগে সৃষ্টি করলেন? কত ঘণ্টা, কতো মিনিটে তখন একদিন হতো? জুপিটার আর ইউরেনাসে কতো ঘণ্টায় দিন হয় মুহাম্মদ কি তা জানতেন? পৃথিবীতে যে সময়ে একদিন অথবা এক বছর হয়, মঙ্গল, বৃহস্পতি কিংবা শনি গ্রহে একই সময়ে কি একদিন অথবা এক বছর হয়? তবে কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে আল্লাহর কতো সময় লাগে, সে হিসেব রাখার জন্যে এক সাথে সূর্য আর পৃথিবীকে সব কিছুর আগেই সৃষ্টি করেছিলেন? "হুয়াল্লাজি জাআলাস্সামছা দিয়াআন ওয়াল কামারা নুরান...।" অর্থাৎ "তিনিই তো সূর্যকে করেছেন উজ্জ্বল তেজস্বী আলোকময় আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়।" (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ৫)। মানেটা কী? আমরা জানি যে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, চাঁদ যে পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র এবং সূর্যের আলোয় আলোকিত সেটা কি কথিত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জানেন না? পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদকে রাতের বেলা দেখে মুহাম্মদ ধরে নিয়েছিলেন, চাঁদেরও আলো আছে! ধরে নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ ঐ সময় আরব জনসাধারণের কাছে চাঁদের যে আলো নেই, চাঁদ যে পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র, এ ধরনের পর্যাপ্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল না। তাইতো এ ধরনের ভুল মুহাম্মদ বারেবারে করেছেন। "তাবারাকাল্লাজি জাআলা ফিচ্ছামায়ি বুরুজান ওয়াজাআলা ফিহা ছিরাজান ওয়া কামারাম মুনিরা।" "তিনিই কল্যাণময় যিনি আকাশে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন একটি প্রজ্জ্বল বাতি (সূর্য) ও

দীপ্তিময় চন্দ্র।” (সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত ৬১)। ‘ওয়াল কামারা নুরান” (জ্যোতির্ময় চন্দ্র),‘ওয়া কামারাম মুনিরা’ (দীপ্তিময় চন্দ্র)-ওগুলোর অর্থ কী? চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে চোখে মুহাম্মদ চাঁদের আলো দেখেছিলেন সে চোখে পৃথিবীরও যে আলো থাকতে পারে তা বুঝতে পারেননি। তাই কোরানের কোথাও ‘ওয়া আরদান মুনিরা (দীপ্তিময় পৃথিবী) বা ‘ওয়াল আরদা নুরান’ (জ্যোতির্ময় পৃথিবী) লেখা নেই। “আলাম তারা ইলা রাববিকা কাইফা মাদ্দাজ্জিল্লু...।” অর্থাৎ “তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমার প্রভু ছায়া বিস্তার করেন? তিনি ইচ্ছে করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।” (সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত ৪৫)। আল্লাহ ইচ্ছে করলে সূর্যকে না ছায়াকে স্থির রাখতে পারতেন? পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন; “ছুম্মা কাবাজনাহু ইলাইনা কাবজান ইয়াছিরা।” মানে হচ্ছে, “তারপর ধীরে ধীরে একে আমি টেনে নেই আমার নিজের দিকে।” (সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত ৪৬)। আল্লাহ কাকে টানেন? ছায়াকে টেনে টেনে লম্বা করেন, নাকি সূর্যকে টেনে টেনে নিজের দিকে নেন?

শত বাধা, প্রতিবাদ প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মদ একই সুরে বলতে থাকলেন, গজব অতিসত্তর এসে পড়বে, কেয়ামত আসন্ন। মুহাম্মদকে অবিশ্বাসীরা কবি, মিথ্যেবাদী, উন্মাদ, পাগল বললো, উপহাস, তিরস্কার নির্যাতন, অপমান করলো তবু কিয়ামত হয় না, কোন প্রকার আজাব, গজবও আসে না। মুহাম্মদ একই ভাঙা রেকর্ড বাজাতে থাকলেন, নতুন কিছু নেই, নেই কোনো পরিবর্তন। লোকে বললো: মুহাম্মদ, যে ঘটনা আমরা তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল কিতাবে আগেই পড়েছি, তা আর কতো শুনাবে, এবার পুরাতন রেকর্ডটি বদলাও। আল্লাহ বললেন: “ওয়া ইজা তুতলা আলাইহিম আয়াতুনা বায়্যিনাতিন...।” “যখন আমার বাণী তাদের সামনে পাঠ করো, যারা আমার সাথে মোলাকাতের আশা করে না, তারা বলে অন্য কোনো বই নিয়ে এসো, না হয় এটি বদলাও।” (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ১৫)। নিজেকে আল্লাহর মনোনীত-প্রেরিত পুরুষ হিসেবে কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন দেখাতে ব্যর্থ মুহাম্মদ কথা বলার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করলেন। দৃশ্যমান কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখলেন; “আফালা-ইয়াংজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত?’ “তারা কি উটের দিকে চেয়ে দেখে না, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?” (সুরা গাশিয়াহ ৮৮, আয়াত ১৭)। পৃথিবীতে কতো বিচিত্র আকারের সুন্দর পশু-পাখি থাকতে মুহাম্মদ উটের মধ্যে আল্লাহর দক্ষ কারিগরি দেখতে পেলেন! “ওয়া ইলাছছামাই কাইফা রুফিয়াত?” “আর (তারা কি দেখে না) আকাশকে কীভাবে উঁচু করা

হয়েছে?" (সুরা গাশিয়াহ ৮৮, আয়াত ১৮)। এই আকাশের কথা বহুবার কোরানে উল্লেখ আছে। আকাশ কিসের সৃষ্টি বা আকাশ বলতে কি আদৌ কোনো জিনিস আছে? আকাশ সম্পর্কে জানতে হলে বাতাস ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রথমে চিনতে হবে। আকাশ সৃষ্টির তথ্য মুহাম্মদের অজানা ছিল বলেই কোরানে বার বার বলেছেন: "আকাশ বিদীর্ণ হবে, আকাশ থেকে পানীয়-বৃষ্টি বিতরণ করা হয়, আকাশে দূর্গ আছে, আকাশ ভেঙে চুরমার হবে, আকাশ একটি মজবুত ছাদ, ওপরে ৭টি আকাশ আছে, তাতে ৭টি দরজা জানালা আছে ইত্যাদি। "ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুছিবাত?" "আর (তারা কি দেখে না) পাহাড়কে কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে?" (সুরা গাশিয়াহ ৮৮, আয়াত ১৯)। বোঝাই যাচ্ছে ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানও মুহাম্মদের মোটেই ছিলনা। পৃথিবীর নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরের উৎপত্তি তিনি জানতেন না বলেই কোরান সাক্ষী দিচ্ছে: "আর তিনি পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন (শক্ত খুঁটি হিসেবে) পাছে তোমাদেরকে নিয়ে হেলেদোলে (পৃথিবী) কাঁত হয়ে না যায়, আর তিনি নদ-নদী, রাস্তাঘাট তৈরি করেছেন যেন তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।" (সুরা নহল ১৬, আয়াত ১৫)। 'পাছে তোমাদেরকে নিয়ে হেলেদোলে (পৃথিবী) কাঁত হয়ে না যায়' এর মানেটা কী? নবি মুহাম্মদের ধারণা ছিল পৃথিবী একটি সমতল থালা বিশেষ, তাই বলেছেন, "ওয়া ইলাল আরদি কাইফা ছুতিহাত?" অর্থাৎ-আর (তারা কি দেখে না) দুনিয়াকে কেমন সমতল করে বিছানো হয়েছে? (সুরা গাশিয়াহ ৮৮, আয়াত ২০)। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, মুহাম্মদ যে রাস্তা পাহাড়ে অথবা সমতল ভূমিতে দেখেছেন, তা তাঁর জন্মের আগে থেকেই তৈরি ছিল, তাই ভেবেছেন ওগুলো আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন! কিন্তু সত্যিই কি তাই?
মুহাম্মদ আল্লাহর নামে বলছেন, "আলাম য়্যারাও ইলাত্তাইরি মুছাখখারাতি...।" "তারা কি আকাশের শূন্যগর্ভে ভাসমান পাখিদের দেখে না? আল্লাহ ছাড়া ওদের কেউ ধরে রাখে না।" (সুরা নহল ১৬, আয়াত ৭৯)। মুহাম্মদ আল্লাহর পাখি উড়তে দেখেছেন, কিন্তু মানুষের রকেট উড়তে দেখেন নাই! বাতাস সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে অথবা উড়োজাহাজের যুগে মুহাম্মদের জন্ম হলে, নিশ্চয়ই তিনি এ ধরনের আয়াত কোরানে লিখাতেন না!

আসলেই আকাশ বলতে কোনো জিনিস নেই। আমরা তো জানি সূর্যের আলোর সাতটি রঙ, যথা: বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন

আমরা সূর্যের আলো আমাদের চোখে পৌঁছুবার আগে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় ধুলিকণা বা অণুর সাথে ক্রিয়া করে। বাতাস (ধুলিকণা, গ্যাসীয় অণু) তার ঘনত্বের স্তর বা প্রকারভেদে বিভিন্ন রঙ ধারণ করে। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে আকাশের অনেকাংশ নীল দেখায় কারণ, নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, বাকি রঙ (যেমন লাল রঙ) থেকে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ লাল বা কমলা দেখায় কারণ এ সময় আমাদের দৃষ্টিরেখা থেকে নীল রঙ বিক্ষিপ্তভাবে দূরে ছড়িয়ে থাকে। জলের ধর্মও তাই। সুতরাং সন্ধ্যা ও প্রভাতের আকাশ দেখে, আকাশের রঙ কি লাল, কি নীল এ প্রশ্ন অবান্তর। তবে বলা যায় আকাশ কোনো অদৃশ্য কিছু নয়, বরং আকাশ দেখা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে, সূর্যের আলো + বাতাসের কণিকাসমূহ = আকাশ। এক কথায়, যেখানে সূর্যের আলো ও বাতাস নেই, সেখানে আকাশ নেই আর যেখানে জীব ও মাটি নেই সেখানে পথঘাটও নেই। এই সাধারণ জ্ঞানটুকু মুহাম্মদের যুগের কিছু মানুষের অজানা থাকার কারণে মুহাম্মদ কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ নীল আকাশ দেখেছিলেন, নীল চাঁদ দেখেননি। পৃথিবী থেকে নীল চাঁদ দেখা যায় না। তবে কেউ যদি দয়া করে দশবর্গ মাইলের একটি বাতাসভর্তি কাঁচের বাক্স চাঁদের ওপর ভাঙতে পারেন, তাহলে ক্ষণিকের জন্য হলেও পৃথিবীর মানুষ একটি নীল চাঁদ দেখতে পাবে। মুহাম্মদের আকাশ সাতটি আর সত্তরটি একই কথা। গোপালভাড়ের আকাশের তারা গণনার কেচ্ছা। "তারা কি দেখে না আমি সাতটি আসমান ও সাতটি জমিন সৃষ্টি করেছি?" (সুরা নুহ ৭১, আয়াত ১৫; সুরা তালাক ৬৫, আয়াত ১২)। মক্কার লোকদেরকে আল্লাহ সাত আসমান সাত জমিন দেখাচ্ছেন? কোথায় সাত আসমান আর কোথায় সাত জমিন?

এরপর মুহাম্মদ 'মানুষ' সৃষ্টির কথা শুনালেন। কখনো বললেন, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে শুক্রকীট থেকে, কখনো নাপাক পানি থেকে, কখনো ক্ষিপ্ত বেগে বেরিয়ে আসা বীর্য থেকে, কখনো আওয়াজকারী কাঁদা মাটি থেকে। কোরানের এক জায়গায় বললেন: "ইন্নামা-আমরুহু...কুন ফায়্যাকুন", অর্থাৎ আল্লাহর কোনোকিছু সৃষ্টির ইচ্ছে হলে শুধু বলেন 'কুন', ব্যস হয়ে যায়। (সুরা ইয়াসিন ৩৬, আয়াত ৮২)। কিন্তু দুনিয়াকে কেন 'দারুল ইসলাম' বানাতে এবং মানুষকে আল্লাহর অনুগত করতে স্বয়ং নবি এবং তাঁর অনুসারীদের তরবারি হাতে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়? এখানে কি আল্লাহ 'কুন' বলতে পারেন না? 'কুন' বললেই তো সব ঝামেলা শেষ!

কোরানের অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে আল্লাহর সময় লেগেছে পুরো ছয় দিন। তারপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন তার কুরসিতে। আল্লাহরও কি ক্লান্তি আসে? প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র দেখিয়ে মুহাম্মদ প্রমাণ করতে চাইলেন ওসব আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টিতে আরববাসীর কোনো অবজেকশন ছিল না। এই আল্লাহ তাদেরই আল্লাহ, যার উপাসনা করে আসছে তারা বিভিন্ন মূর্তি-পাথর, দেব-দেবীরূপে মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই। অবজেকশনটা হলো, মুহাম্মদ যে সেই আল্লাহর নবি তার প্রমাণ চাই। এতো কিছু বলা, এতো কিছু দেখানোর পরও এরা অলৌকিক প্রমাণ বা নিদর্শন ছাড়া মুহাম্মদকে নবি বলে মানতে রাজি নয়। মক্কাবাসীরা বলতে লাগলো এসব সেকেলে পৌরাণিক কাহিনি। আসলে এগুলি তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাবেরই কথা। তারা আরো বলতে লাগলো; খ্রিস্টান-ইহুদি ধর্মের বিজ্ঞ কবি-সাহিত্যিক ও ধর্মগুরুরা 'কোরানের আয়াত' রচনা করতে মুহাম্মদকে সহায়তা করছেন, তাঁকে (মুহাম্মদ) সকাল-সন্ধ্যা নুহা-আব্রাহাম-মুসা-যিশুর কাহিনি পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এর জবাবে কোরানের আয়াত তৈরি হল: "অবিশ্বাসীরা বলে, এ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে। ওরা তো সীমালঙ্ঘন করে ও মিথ্যা বলে। ওরা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।" (সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত ৪-৫)। মুহাম্মদ তৌরাত-জবুর-ইঞ্জিল শরিফের বাণী কার কাছ থেকে জেনেছিলেন, কোরানে প্রবেশ করিয়েছিলেন, আর কারা সম্পাদনা করেছিলেন কোরান, তা আরবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। মক্কাতে আবদিয়াস বেন সালোম নামে একজন বিজ্ঞ রাব্বীর (ইহুদি ধর্মগুরু) সাথে মুহাম্মদের বন্ধুভাব ছিল। ঐ রাব্বী তাঁকে (মুহাম্মদ) ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন, ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন; যেগুলো পরে মুহাম্মদের কোরান প্রনয়ণের সময় কাজে লেগেছিল। তফসিরকারক আব্বাসী ও জালালায়েনের মতে, এই রাব্বী পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নূতন নাম 'আবদুল্লাহ ইবন সালোম' রাখেন। ধারণা করা হয়, কোরানে ৪৬ নং সুরা আহ্কাফের ৮নং আয়াতে 'সাক্ষী' হিসেবে এই ইহুদি রাব্বীর কথাই বলা হচ্ছে।[৩৪] তবে মুহাম্মদ এসব অস্বীকার করে সহজেই একটি কৌশল বের করে ফেললেন। 'আল্লাহর নামে' আরববাসীর প্রতি ভীষণ শক্ত একটি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে দিলেন: "আম য়্যাকুলু-

[৩৪] ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৪

নাফতারাহু কুল ফাতু বি আশরি ছুয়ারিম মিছলিহি...ইন কুনতুম ছাদিক্কিন", "তারা কি বলে সে (মুহাম্মদ) এ কোরান বানিয়েছে? বলো, তাহলে এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে খুশি তাকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সুরা হুদ ১১, আয়াত ১৩)। আরো লেখা হয়েছে "এই কোরান এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ রচনা করতে পারে, ...তারা কি বলে সে (মুহাম্মদ) এ কোরান রচনা করেছে? বলো, তবে এর মতো এক সুরা আনো...।" (সুরা ইউনুস ১০, আয়াত ৩৭-৩৮)।

এবার কবিতার মালজোড়া প্রতিযোগিতা হবে, আল্লাহ বনাম মানুষ। আল্লাহ (মুহাম্মদ) এই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তার মক্কি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে। তখন তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, কাজটা ঠিক হলো কি না। মদিনায় এসে বুঝতে পারলেন তার চ্যালেঞ্জ করা ভুল হয়নি। আল্লাহ বলেন: "ওয়া ইজা তুত্লা আলাইহিম আয়াতুনা কালুকাদ্ সামিনা লাওনাশাউ লাকুলনা মিছলাহাজা ইনহাজা ইল্লা আছাতিরুল আউওয়ালিন।" "আর যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে-আমরা এর আগেই শুনেছি, আমরাও ইচ্ছে করলে এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরাকালের উপকথা বৈ কিছু নয়।" (সুরা আনফাল ৮, আয়াত ৩১)। 'এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো' বলে মুহাম্মদ এখানে যা বলেছিলেন তা হলো, ইংরেজি 'আই ডোন্ট নো' এর আরবি কী বলো? কোরানের অনুরূপ কিছু লিখলে তৌরাত, জবুর, বাইবেল হয়, আর তৌরাত, জবুর, বাইবেলে যা আছে তা-ই কোরান! সুতরাং তালগাছ সব সময়ই মুহাম্মদের। পারস্য দেশ ভ্রমণকারী সাহিত্যিক আল-নাদির বিন আল-হারিস মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। উল্লেখ্য, পারস্য ছিল তখন শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে, শিল্পকলায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, পুরোহিত আরবদের চেয়ে অনেক উন্নত। পারসিয়ানদের প্রতি চিরদিনই মুহাম্মদের তীব্র হিংসা ছিল। নাদির 'ফেরদৌসি' নামে সুন্দর একটি কবিতা লিখে এক গণজমায়েতে পাঠ করে শুনালেন। মুহাম্মদ কবিকে তার হটলিস্টে রাখলেন; কারণ পারস্যের কবি নাদিরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তিনি কিছুটা বিব্রত। কিন্তু কৌশলগত কারণে তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন। বছর দুয়েক পর, মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে কবি নাদির বিন হারিস বন্দী হলে তাঁকে নবির আদেশে হজরত আলি বিন আবু তালিব তরবারি দিয়ে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন; যথারীতি কবি নাদির বিন হারিসকে হত্যা করার কিছু আগে কোরানের আয়াত তৈরি হল: "তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা।' এ তো

সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে। সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, এ-ই সেই যা তোমরা অস্বীকার করতে।" (সুরা মুতাফ্ফিফিন ৮৩, আয়াত ১৩-১৭)। কবি নাদিরের মতো আরেক জন কবি উকবা বিন আবু মুয়াতও বদরের যুদ্ধে বন্ধী হন। মক্কায় থাকাকালীন এই কবিও মুহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিত কবিতা রচনা করেছিলেন। হাদিস থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ যখন কবি আবু মুয়াতকে হত্যা করতে আদেশ দেন, তখন কবি নবির কাছে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে জানতে চান, আমি মারা গেলে আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে? মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, দোজখ! সঙ্গে সঙ্গে নবির এক অনুসারী তরবারি দিয়ে উকবা বিন আবু মুয়াতের ধড় থেকে মস্তক বিছিন্ন করে দেয়। (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, নম্বর ২৯৩৪; মুসলিম শরিফ, ভলিউম ৩, নম্বর ৪৪২২, ৪৪২৪)। নবিজি এই হত্যাযজ্ঞ যথারীতি 'আল্লাহর দোহাই' দিয়ে ঐশীনির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিলেন: It is not fitting for an apostle that he should have prisoners of war until he hath thoroughly subdued the land. Ye look for the temporal goods of this world; but Allah looketh to the Hereafter: And Allah is Exalted in might, Wise নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে-------। (সুরা আনফাল ৮, আয়াত ৬৭)।

বদর যুদ্ধের আশাতীত, অকল্পনীয় সাফল্য মুহাম্মদের জন্যে সারা আরব বিশ্বকে তাঁর পদানত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বদর যুদ্ধের পর থেকে মুহাম্মদ হয়ে গেলেন নবির মুখোশপরা এক ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়ক। সুতরাং তিনি (মুহাম্মদ), যারা তাঁর সমালোচনা করেছিল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মতের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল অথবা আগামীতে করতে পারে বলে তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল এমন বেশ কিছু লোককে গুপ্তহত্যার উদ্যোগ নিলেন। গুপ্তহত্যার তালিকায় ছিলেন বিভিন্ন গোত্র-নেতা, কোরান লেখক, আর বেশির ভাগই কবি-সাহিত্যিক। মুহাম্মদ কর্তৃক নৃশংসভাবে মানুষ হত্যার লোমহর্ষক ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবে হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামিক সূত্র থেকে এরকম কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, যা মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত 'নৃশংস' হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র।

কবিরা যে ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারেন মুহাম্মদ সম্ভবত তা বুঝতেন। বদর যুদ্ধের পরই মক্কা-মদিনার বেশিরভাগ অমুসলিম কবি এক বাক্যে মুহাম্মদের বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁদের কাছে নবির স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে, মক্কা এবং মদিনার জন্য আশু বিপদ অপেক্ষা করছে এটা তাদের কবিতার মাধ্যমে মক্কা-মদিনার অধিবাসীদের বোঝাতে লাগলেন। বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে মক্কার নাম না-জানা এক কবি ব্যাথিত চিত্তে লিখেন:

সম্মান রাখতে তারা (বদরে মৃত কোরায়েশরা) দিল প্রাণ
আগন্তুকের কাছে স্বজনকে তারা করেনি দান।
তোমাদের তো নতুন বন্ধু এখন 'গাসসান' !
তারা নতুন বন্ধু খোঁজে না মক্কায়,
বরং বলে, কি নির্লজ্জ এরা, হায়!
রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা বড় অপরাধ
ন্যায্যবিচারে তোমরাই পাবে না রেয়াত।[৩৫]

মদিনার ইহুদি কবি আসমা বিনত মারোয়ান বদর যুদ্ধের পরপরই 'ইসলাম' নিয়ে মুহাম্মদের মনোভাব বুঝতে পেরে মদিনাবাসীকে হুঁশিয়ারি করে কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যে ব্যক্তি ধর্মের নাম ভাঙিয়ে স্বজাতি-স্বগোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে, তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে পারে; সে হয়তো এতোদিন মদিনাবাসীর আশ্রয়ে থেকে-খেয়েও কিছুদিন পর যেকোনো উছিলায় মদিনাবাসীকেই হত্যা করবে। মদিনাবাসীর ওপর ছড়ি ঘোরাবে। আসমা মদিনার ইহুদি বনি খাতমা গোত্রের অধিবাসী; তাঁর স্বামীর নাম ইয়াজিদ বিন জায়েদ এবং জানা যায়, তাঁদের পাঁচটি সন্তান ছিল। আসমা বিনত মারোয়ান কবিতা লিখে ইসলাম, মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের আচরণের নিন্দা জানাতেন পাশপাশি মুহাম্মদ সম্পর্কে মদিনাবসীর নিঃস্পৃহ ভূমিকারও কঠোর উপহাস করতেন। আরবি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত আসমা বিনত মারোয়ানের এরকম একটি কবিতা নিচে তুলে ধরা হল:
"I despise B. Malik and al-Nabit

---

৩৫. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭৮

and Auf and B. al-Khazraj.
You obey a stranger who is none of yours,
One not of Murad or Madhhij.
Do you expect good from him after the killing of your chiefs
Like a hungry man waiting for a cook's broth?
Is there no man of pride who would attack him by surprise
And cut off the hopes of those who expect aught from him?"

মুহাম্মদ তাঁর মিশনের প্রথম দিকে ইহুদি রীতি অনুসরণ করে হিব্রু শব্দ 'নাবী' ব্যবহার করতেন, পরবর্তীতে ইহুদিদের সাথে বিরোধ বাঁধলে 'নাবী' বা নবি শব্দটি ত্যাগ করে আরবি শব্দ 'রসুল' ব্যবহার করতে শুরু করেন।[৩৬] এই কবিতায় উল্লেখিত বানু মালিক, আউস, বানু আল-খাজরাজ, মুরাদ, মাদ্হিজ ইত্যাদি মদিনার বিভিন্ন গোত্রের নাম, যারা নানাভাবে মুহাম্মদ এবং মক্কা থেকে আসা তাঁর অনুসারীদের সহযোগিতা করতো। কবিতাটি শুনতে পেয়ে মুহাম্মদ খুবই ক্ষিপ্ত হলেন। আসমা বিনত মারোয়ানের কবিতার জবাবে নবির নিয়োগকৃত অফিসিয়াল কবি হাসান বিন থাবিত আরেকটি কবিতা লেখেন। নিচে সেই কবিতাটিও (আরবি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত) তুলে ধরা হল:

"Banu Wa'il and B. Waqif and Khatma
Are inferior to B. al-Khazrahj.
When she called for folly woe to her in her weeping,
For death is coming.
She stirred up a man of glorious origin,
Noble in his going out and in his coming in.
Before midnight he dyed her in her blood
And incurred no guilt thereby

৩৬. ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৪, ১৯৭

কবিতার জবাবে কবিতা লিখে উত্তর দেওয়ার কৌশলে মুহাম্মদ সন্তুষ্ট হলেন না। বদর যুদ্ধের পর মুহাম্মদ এখন মদিনার অঘোষিত সম্রাট। তাঁর সমালোচনা কোনোভাবেই আর বরদাশ্ত যোগ্য নয়। অতএব আসমাকে নিশ্চুপ করে দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ ঘোষণা দিলেন: 'কে আছ? এই মারোয়ান কন্যাকে হত্যা করতে পারবে'? সঙ্গে সঙ্গে উমায়ের বিন আদিয়া আল-খাতমি নামের নব্য-মুসলমান হাত তুললেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস, রমজান মাসের ২৫ তারিখের রাত্রিতে আসমার বাড়িতে চুপিসারে প্রবেশ করে উমায়ের বিন আদিয়া। সেখানে পাঁচ শিশু সন্তান নিয়ে শায়িত আসমাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করেন উমায়ের'। ঘটনাটি ইবনে সাদ এর 'কিতাবুল তাবাকাত আল কাবির' এবং ইবনে ইসহাকের 'সিরাতে রাসুলুল্লাহ' বর্ণনা সরাসরি এখানে তুলে দেয়া হলো।

Hearing the poem, Muhammad then called for her death in turn, saying "Who will rid me of Marwan's daughter?" Umayr bin Adiy al-Khatmi, a blind man belonging to the same tribe as Asma's husband (i.e., Banu Khatma) responded that he would. He crept into her room in the dark of night where she was sleeping with her five children, her infant child close to her bosom. Umayr removed the child from Asma's breast and killed her [৩৭]

When the apostle heard what she had said he said, "Who will rid me of Marwan's daughter?" Umayr b. Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and that very night he went to her house and killed her. In the morning he came to the apostle and told him what he had done and he [Muhammad] said, "You have helped God and His apostle, O Umayr!" When he asked if he would have to bear any evil consequences the apostle said, "Two goats won't butt their heads about her", so Umayr went back to his people.

Now there was a great commotion among B. Khatma that day about the affair of bint [daughter of] Marwan. She had five sons, and when Umayr went to them from the apostle he said, "I have killed bint Marwan, O sons of Khatma. Withstand

---

৩৭. Ibn Sa`d. Haq, S. Moinul, ed. Kitab al-Tabaqat al-Kabir 2. pp. 30–31

me if you can; don't keep me waiting." That was the first day Islam became powerful among B. Khatma; before that those who were Muslims concealed the fact. The first of them to accept Islam was Umayr b. Adiy who was called the "Reader", and Abdullah b. Aus and Khuzayma b. Thabit. The day after Bint Marwan was killed the men of B. Khatma became Muslims because they saw the power of Islam[৩৮]

'মায়ের বুক থেকে দুধ পানরত শিশুকে সরিয়ে মাকে খুন' করার মাধ্যমে সারা আরব বিশ্বে মুহাম্মদের শক্তির প্রদর্শনী হয়ে যায়। এই ঘটনার পরপরই বানু খাতমা গোত্রের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কারণ তারা ইতোমধ্যে ইসলামের শক্তি দেখেছে। কারো কারো ভাষ্যমতে মার্চ মাসে কবি আসমা বিনত মারোয়ানকে হত্যার পর পরের মাসে এপ্রিলে একশত বছরের বৃদ্ধ কবি আবু আফাককে হত্যা করা হয় মুহাম্মদের আদেশে। কারণ, তাঁর অপরাধ তিনিও নাকি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছেন। বদর যুদ্ধের আগে কবি আবু আফাককে নবি একবার কবিতা আর না-লেখার জন্য সাবধান করে দেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরই ঘোষণা দেন, কে এই বদমায়েশটাকে হত্যা করতে পারবে? সলিম বিন উমায়ের নামের একজন নবির ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারি দিয়ে আবু আফাককে হত্যা করেন। আলী দস্তি তার 'মুহাম্মদের তেইশ বছর' বইয়ে লিখেন:
Abu Afak, a man of great age (reputedly 120 years) was killed because he lampooned Mohammad. The deed was done by Salem b. 'Omayr at the behest of the Prophet, who had asked, "Who will deal with this rascal for me?" The killing of such an old man moved a poetess, Asma b. Marwan, to compose disrespectful verses about the Prophet, and she too was assassinated.[৩৯]

বৃদ্ধ কবি আবু আফাকের পর টার্গেট হলেন মদিনার বানু নাদির গোত্রের ইহুদি কবি কাব বিন আল আশরাফ। বদর যুদ্ধের পর মক্কাতে গিয়ে মক্কার বীর সেনানির পক্ষ নিয়ে কবিতা লিখলেন।

---

৩৮. The Life of Muhammad. A translation of Ishaq's "Sirat Rasul Allah", pgs. 675–676, A. Guillaume, Oxford University Press, 1955

৩৯. Ali Dashti, "23 Years; A Study of the Prophetic Career of Mohammad", page 100

ঐ খবরটি এরই মধ্যে মুহাম্মদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর মাসে (৬২৪ সালে) কাব যখন মদিনাতে ফিরে এলেন, এর পরের ঘটনা আমরা হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহর (রাঃ) কাছ থেকেই জেনে নিই: "আল্লাহর রসুল (দঃ) বললেন, কে পারবে কাব বিন আল আশরাফকে হত্যা করতে, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের মনে আঘাত দিয়েছে? মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, হে আল্লাহর রসুল (দঃ), আপনি আমাকে অনুমতি দেন, আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রসুল বললেন, হ্যাঁ অনুমতি দেওয়া হল। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, তাকে খুন করতে যদি মিথ্যা বলা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়, আমি কি তা করতে পারবো? রসুল বললেন, হ্যাঁ তুমি তা করতে পারো। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা দুজন সঙ্গী (আবু বিন জবর আল হারিস বিন আউস এবং আব্বাদ বিন বশির) নিয়ে কাব বিন আল আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন, ঐ মানুষটি (নবি মুহাম্মদ) আমাদের কাছে কর (ট্যাক্স) দাবি করছে, সে আমাদেরকে বড়ই জ্বালাতন করছে। কাব বললেন, আল্লাহর কসম ঐ লোকটির উপদ্রবে তোমাদের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে ওঠবে। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, যেহেতু তাকে (মুহাম্মদকে) আমরা মেনে নিয়েছি, তাই সহজে ছেড়ে আসতে পারি না, আমরা এখন দেখার অপেক্ষায় আছি কোন পথে কিভাবে তার ধ্বংস হয়। আমরা এসেছি তোমার কাছে, তুমি যদি এক বোঝা খাদ্য কর্জ দিয়ে সাহায্য করো। কাব বিন আল-আশরাফ বললেন, ঠিক আছে, তবে তোমাদের কোনো কিছু আমার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। মাছলামা বললেন, কী দিতে হবে বলো? আশরাফ বললেন, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখতে পারো। মাছলামা এবং তাঁর সঙ্গীরা জবাব দিল, তা কীভাবে? তুমি তো এই আরবের একজন বিখ্যাত সুপুরুষ। কাব বললেন, তাহলে তোমার সন্তানদের? মাছলামা এবং তাঁর সঙ্গীরা বললেন, তা কীভাবে হয় লোকেরা আমাদের কি বলবে সামান্য কিছু খাদ্যের জন্য নিজের সন্তান পর্যন্ত বন্ধক রেখে দিলে? বরং আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে জামানত রাখবো। কাব বিন আল আশরাফ রাজি হলেন। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা যাবার আগে বললেন, আমরা আগামীকাল আসবো। পরের দিন গভীর রাতে তারা আসলেন। পথিমধ্যে মুহাম্মদ বিন্ মাছলামা তার সঙ্গীদেরকে বললেন, আমি যখন কাবের মাথায় দুহাতে চেপে ধরবো তখনি তোমারা তাকে আক্রমণ করবে। কাব ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, এতো গভীর রাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কাব বললেন, কোথাও না আমার বন্ধুরা এসেছে একটু সাহায্য চায়। আশরাফকে দেখে

মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, কি দারুন মিষ্টি সুগন্ধ তোমার চুলে, আমি কি একটু শুঁকে দেখতে পারি? সহাস্য মুখে গর্বিত কণ্ঠে কাব বললেন, আরব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আমার ঘরে, তাই। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা চুলের সুগন্ধ শুঁকার ভান করে চুলসহ কাবের মাথা শক্ত করে দুহাতে চেপে ধরেন। সাথে-সাথেই সঙ্গীদ্বয় দুদিক থেকে কাবের দুবাহু বরাবর তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মদ বিন-মাছলামা, কাব বিন আল আশরাফের মস্তক কেটে নবির পায়ের কাছে নিয়ে রাখলেন।" (ঈষৎ সংক্ষেপিত)। (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৩৬৯)

কিনান বিন আল রাবীকে হত্যা;

কিনান বিন আল- রাবীকে নবিজির কাছে নিয়ে আসা হলো, যার হস্তগত ছিল বনু আন-নাদিরের কিছু সম্পদ। আল্লাহর রাসুল (দঃ) ঐ সম্পদের ব্যাপারে কিনানকে জিজ্ঞেস করলেন। কিনান বললো, সে কিছুই জানে না। তারপর সাক্ষী হিসেবে একজন লোককে ডেকে আনা হলো। সাক্ষী বললো যে, সে কিনানকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন ঘুরাফেরা করতে দেখেছে। নবিজি বললেন, হে কিনান, যদি ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটির মাটির নিচে সম্পদ পাওয়া যায় তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো। আল্লাহর রাসুল (দঃ) ঐ জায়গার মাটি খোঁড়ার আদেশ করলেন। মাটির নিচে কিছু সম্পদ পাওয়া গেলো। নবি বললেন, কিনান বাকি সম্পদ কোথায়? কিনান উত্তর দিলো, আমি বলবো না। নবি তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, কিনানকে চরম যন্ত্রণাদায়ক, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সকল সম্পদ বের করে না দেয়। নবিজির আদেশ পেয়ে সাহাবি হজরত আল-জুবায়ের (রাঃ) জ্বলন্ত অগ্নিকাঠি দিয়ে কিনানের বুকে আঘাত করতে থাকেন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে কিনানের যখন মৃতপ্রায় অবস্থা, নবি তাকে মুহাম্মদ বিন-মাছলামার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এবার তোমার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নাও। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা কিনানের মস্তক কেটে দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন।[৮০]

বন্দী খুরায়েজ গোত্রের গণহত্যা;

---

[৮০]. Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, The History of Al-Tabari, Translated by Michael Fishbein, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA, Vol 8, Page 122.

হজরত আবু সাঈদ আল্ কুদরী থেকে বর্ণীত: বন্দী খুরায়েজ গোত্রের লোকজন সাহাবি হজরত সা'দ বিন্ মুয়াদের রায় মেনে নিবেন বলে রাজি হলেন। রাসুল (দঃ) হজরত সা'দকে আসতে খবর পাঠালেন। সা'দ একটি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি যখন মসজিদের নিকটে আসলেন, রাসুল (দঃ) মদিনার আনসারগণকে দাঁড়িয়ে সা'দ এর প্রতি সম্মান দেখাতে বললেন। নবিজি হজরত সা'দকে বললেন, "খুরায়েজ গোত্রের এই লোকজন তোমার দেয়া রায় গ্রহণ করবে বলে সম্মতি জানিয়েছে।" সা'দ রায় দিলেন, "এদের সকল পুরুষকে মেরে ফেলা হউক এবং সকল নারী ও শিশুদেরকে দখলকৃত গনিমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করা হউক।" আল্লাহর রাসুল (দঃ) বললেন, "তুমি রায় দিয়েছো আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী।" (দ্রষ্টব্য: সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৪৭)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সা'দের গাধায় চড়ে আসা, তাঁকে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো এবং তাঁর রায় কি নবি মুহাম্মদের পূর্ব পরিকল্পিত? সা'দ মুহাম্মদের উগ্রবাদী চরমপন্থী গ্রুপের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বনি খুরায়েজরা অনেক আগে থেকেই সা'দ ইবনে মুয়াদের চক্ষুশূল ছিল। অবরোধ চলাকালীন সময়ে সা'দ খোরাইজ গোত্রের হাতে মারাত্বকভাবে আহত হয়েছিলেন। বানি খুরায়েজ গোত্রের আটশো'র অধিক মানুষকে বন্দী করে হত্যার জন্যে শহরের বাজারের নিকটে খাল কাটা হলো। প্রত্যেক বন্দীর হাত পেছনে বেঁধে খালের ধারে নিয়ে, পাঁচজনের গ্রুপ করে গলায় ছুরি দিয়ে হত্যা করা হয়। সারা দিন পরে সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে চলে এই গণহত্যা। সেই বিভৎস গণহত্যা সম্পর্কে অনেক ইসলাম গবেষক লেখকেরা বলেছেন- বনি খুরায়েজ গণহত্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চলাকালীন নাৎসী বাহিনীর নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়।[৪১] বনি খুরায়েজ গোত্রের হত্যাকান্ডের পর সা'দ ইবন মুয়াদ মারা যান পূর্বের জখমের কারণে। নবি জানালেন, সা'দের মৃত্যুর জন্যে আল্লাহর সিংহাসন কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

আরো কিছু নৃশংস হত্যা;

হজরত আবু জিনাদ থেকে বর্ণীত, আল্লাহর রাসুল (দঃ) যখন ঐ লোকদের হাত-পা কেটে ফেল্লেন যারা তাঁর (নবির) উট চুরি করেছিল এবং আগুনে পোড়া বর্শা-ফলক দিয়ে তাদের চক্ষু

[৪১]. Karen Armstrong, Muhammad: a Western Attempt to Understand Islam, London, 1991, page 207.)

উপড়ে ফেল্লেন, আল্লাহ নবিজির উপর রাগান্বিত হলেন। (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩৮, নম্বর ৪৩৫৭)। আগুনের বর্শা-ফলক দিয়ে তাদের চক্ষু উপড়ে ফেলার পরে আল্লাহ বুঝতে পারলেন, উট চুরির শাস্তি হিসেবে হাত-পা কেটে চোখ উপড়ে ফেলা সঠিক নয়? এ সম্পর্কে ডিকশোনারি অফ ইসলাম থেকে জানা যায়-

"The Prophet ordered their hands and their feet to be cut off as a punishment for theft, and their eyes to be pulled out. But the Prophet did not stop the bleeding, and they died." And in another it reads, "The Prophet ordered hot irons to be drawn across their eyes, and then to be cast on the plain of al-Madinah; and when they asked for water it was not given them, and they died". [৪২]

হজরত আলি (রাঃ) থেকে বর্ণীত, একজন ইহুদি রমণী প্রায়ই আল্লাহর রাসুলকে (দঃ) ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো। একজন লোক ঐ মহিলার গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে টানতে থাকেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। নবিজি ঘোষণা দিলেন, "ঐ মহিলার জীবনের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না।" (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩৮, নম্বর ৪৩৪৯)।

মক্কা দখলের পর মুহাম্মদ আরো কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে গোপনে হত্যার জন্যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন; কারণ মুহাম্মদের সন্দেহ হয়েছিল যে, এরা একদিন তার নবিত্ব ও ইসলাম ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকজন মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য, কেউ পেশাদার কবি-সাহিত্যিক আবার কেউবা ক্রীতদাস ছিলেন। মুহাম্মদের গুপ্তহত্যার তালিকায়, যে দশ জন লোক ছিলেন তন্মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন ছিলেন নারী। নারীদের মধ্যে;

(১) হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা, (২) সারা (আমর ইবনে হাশিমের ক্রীতদাসী), (৩) ফারতানাহ, (৪) কারিবাহ।

আর পুরুষদের মধ্যে;

(১) ইকরিমা বিন আবু জেহেল, (২) হাব্বার ইবনে আল আসওয়াদ,

[৪২] Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895, Page 64

(৩) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ, (কোরান লেখক ও পরবর্তিতে মিশরের গভর্ণর) (৪) মিকাস ইবনে সাবাবা, (৫) আব্দুল্লাহ ইবনে হিলাল, (৬) হুরায়েস ইবনে নুকায়েদ।[৪৩]

নারীদের মধ্যে ফারতানাহ ও কারিবাহ উভয়েই আব্দুল্লাহ ইবনে হিলালের ক্রীতিদাসী ছিলেন। মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের আগে তারা মুহাম্মদের বিরোদ্ধে স্যাটায়ার ধর্মী গান গাওয়ার অভিযোগে নবি তাদেরকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়। একজনকে হত্যা করার পর অন্যজন দৌড়ে গিয়ে নবির পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। মক্কা বিজয়ের পরপরই আবু সুফিয়ান অস্ত্রের মুখে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করায় তার স্ত্রী হিন্দাকে মুহাম্মদ খুন করানো থেকে বিরত থাকেন। আমর বিন হাশেমের মুক্তদাসী সারা, বিভিন্ন কারণে মুহাম্মদের বিরক্তির কারণ ছিলেন তবে তিনি অনেক আকুতি মিনতি করে মুহাম্মদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলে তাকেও ছেড়ে দেয়া হয় কিন্তু পরে তাকে ওমর বিন খাত্তাবের ঘোড়ার নিচে পদদলিত করে মারা হয়।[৪৪] পুরুষদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ একসময় মুহাম্মদের অত্যন্ত প্রীয়ভাজন ও কোরান লেখক (ভাল সাহিত্যিক) ছিলেন।[৪৫] মুহাম্মদের দাবীকৃত 'আল্লাহর অহি' কোরান লিখতে গিয়ে একপর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সা সা'দ বিন আবি সারাহের মনে সন্দেহ জাগে যে এগুলোর অনেক কিছু মুহাম্মদ নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ীর (মৃত ১২৮৬) লিখিত 'আনোয়ার আল-তানজিল ওয়া আছরার আল তা'উইয়ীল' ("Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil") গ্রন্থ থেকে জানা যায়; একদা মুহাম্মদ ওহি প্রাপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন ২৩ নং সুরা মুমিনুনের ১২ থেকে ১৪ নং আয়াত। বাক্যগুলো ছিল-

১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।
১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

---

৪৩. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004, Page 136, 163

৪৪. The History of AlTabari, vol 8, translated by Michael Fishbein, Page 179

৪৫. The Spirit of Islam, page 295.

১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংশ দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি।

১৪ নং বাক্যের শেষ অংশটুকু শোনার পর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বলে উঠলেন- 'নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়'। মুহাম্মদ বললেন, 'এই বাক্যটিও লাগিয়ে দাও'। আব্দুল্লাহ বিন সা'দ চমকে উঠলেন। তার সন্দেহ আরো গাঢ় হলো, তার নিজের কথা কোরানে লাগানো যায় কীভাবে? আরেকবার এক আয়াতের শেষে মুহাম্মদ যখন বললেন- 'এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ' (আরবিতে 'আজিজ' ও 'হাকিম') আব্দুল্লাহ বিন সা'দ পরামর্শ দিলেন 'এবং আল্লাহ সব জানেন ও বিজ্ঞ ('আলিম' ও 'হাকিম') লেখার জন্যে। মুহাম্মদ কোন আপত্তি করলেন না, তিনি রাজি হলেন। এবার আব্দুল্লাহ বিন সা'দ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এ কোরান আল্লাহর বাণী হতে পারেনা, আল্লাহর বাণী কারো পক্ষে বা কারো পরামর্শে পরিবর্তন, সংযোজন সম্ভব হতে পারেনা। এরপর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কার কোরায়েশদের পক্ষে যোগ দিলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন যে, এ কোরান আল্লাহর বাণী নয় এটা মুহাম্মদ নিজেই রচনা করেছেন, এমন কি কিছু আয়াত তিনি নিজে সংশোধন করে দিয়েছেন।[৪৬]

বলা হয়ে থাকে, কোরানের ৬ নং সুরা আল আনআমের ৯৩ নং আয়াত আব্দুলাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে উদ্দেশ্য করে লিখা হয়েছিল। আয়াতটি ছিল: 'ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলেঃ আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহি আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাজিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাজিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর

[৪৬]. Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, page 98

আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে’।[৪৭] শেষ পর্যন্ত খলিফা উসমানের হস্তক্ষেপে আব্দুল্লাহ বিন সা'দ মুহাম্মদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইসলাম বা মুসলিমগণ নিজেদের কর্মকান্ডকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্যে, যতই মুহাম্মদ পূর্ববর্তি সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগ বা আরব জাতিকে নারীশিশু হত্যাকারী বর্বর অসভ্য জাতি বলে দাবি করেন না কেন, আসলে সেই সময় বা আরব জাতি সেরকম ছিলনা। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, ঐ সময়ে আরবে যথেষ্ট মুক্তচিন্তার পরিবেশ বিরাজ করছিল। দক্ষিণের নাজরান শহর, মক্কার নিকটে মাজনাতে, আরাফাত পাহাড়ের নিচে কবিতা মেলা হতো। তবে সব চেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় প্রতিযোগীতা হতো মক্কার পূর্বে নাখালা উপত্যকার পাশে বাণিজ্য নগরী ‘ওকাজ’ এ। জিলকাদ মাসে সাতদিনব্যাপি (ভিন্ন মতে বিশদিন) ওকাজে বিশাল মেলার আয়োজন করা হতো। বলা বাহুল্য, এ মাসে আরববাসীর কাছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ওকাজের মেলা সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদবাক্য ছিল ‘ওকাজ আজকে যা বলে, সারা আরবে আগামীকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়’। ওকাজের ঐ মেলা ছিল আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র, বহু ধর্মের মানুষের সমন্বয়শীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। মুক্ত আলোচনা, যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক, জনপ্রীয় কবিদের ‘কসিদা’ (গীতিকবিতা) প্রতিযোগীতা (সাহিত্য সম্মেলন) ছিল মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। স্বাভাবিকভাবেই এই সাহিত্য সম্মেলনের ফলাফল সারা আরব পেনিনসুলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো। এখানে এসে কবিতা পাঠ করা কবিদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার, জীবনের আরাধ্য একটি বিষয় ছিল। বিজয়ী কবিতাকে স্বর্ণাক্ষরে পর্দার কাপড়ে লিখে কাবা ঘর সহ অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দিরের দেয়ালে টানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েস (যার একটি কবিতার পংতি মুহাম্মদ কোরানে ঢুকিয়েছেন) সহ আমর ইবনে কুলসুম, তারাফা, নাবিঘা, জুহাইর, আসা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের মোয়ালাকাত বা ঝুলন্ত কবিতা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে কাবা ঘরের দেয়ালকে অলংকৃত করেছে। মুহাম্মদ জানতেন কোন দেশ বা জাতির ওপর নতুন কোন ধর্ম বা মতবাদ চাপিয়ে দিতে হলে প্রথমেই সে দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দিয়ে জাতিকে মেধাশুন্য করতে হবে। মক্কা

---

৪৭. আরব জাতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৬৭, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, Vol 2, page 174

দখলের পরপরই মুহাম্মদ আরবের 'অলিম্পিক' হিসেবে পরিচিত দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা 'ওকাজ' এর মেলা সহ সকল প্রকার কবিতা উৎসব, সাহিত্য সম্মেলন বন্ধ করে দেন।[৪৮]

মক্কায় থাকাকালীন কোরানে মুহাম্মদ (দঃ) বলেছিলেন: "আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুজুরি চাই না।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৫৭)। মদিনায় এসে কোরানের মধ্যে যুদ্ধের নামে অর্থ সংগ্রহ, গনিমতের মাল, কল্পিত জান্নাতের লোভনীয়-লাস্যময়ী জীবন ও যুদ্ধপ্রেরণা প্রাধান্য পায়। পূর্বেকার বহু নবিদের কাহিনি দিয়ে ভর্তি কোরানের কোথাও উল্লেখ নেই যে, মুহাম্মদের (দঃ) পূর্বে কোনো নবি-রসুল সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তারপরও কিছু সংখ্যক মানুষ সকল সময়ের জন্যে বোকা হয়ে বেঁচে থাকার পথটাই বেছে নেবেন। তারা তাকিয়ে দেখবেন, কিন্তু বুঝবেন না, পড়বেন কিন্তু শিখবেন না, জানবেন কিন্তু মানবেন না, শুনবেন কিন্তু চিন্তা করবেন না। কিছু কিছু পতঙ্গ যেমন আগুনে পোড়ে আত্মাহুতি দেয়, এই মানুষগুলোও যেন তাঁদের মস্তিষ্কে 'বিশ্বাসের ভাইরাসে' আক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অভিজিৎ রায় নিরপরাধ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর জেহাদিদের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের উৎস বা প্রেরণার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামক বইয়ে। ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের 'ধর্মের উপযোগিতা' ও ডেনিয়েল ডেনেটের 'ব্রেকিং দ্যা স্পেল' বই এর উধৃতি দিয়ে অভিজিৎ রায় লিখেছেন:

"মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয় এ আমরা জানি। ধরা যাক একটা শিশু চুলোয় হাত দিতে গেল অমনি তার মা বলে উঠলেন, চুলোয় হাত দিও না, ওটা গরম। শিশু সেটা শুনে আর হাত দিল না, হাত সরিয়ে নিল। 'মায়ের কথা শুনতে হবে' এ বিশ্বাস আমরা পরম্পরায় বহন করি, নইলে যে টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে, সেই ভাল মা-ই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেন 'শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে', কিংবা 'রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না, গেলে গোল্লা পাবে' তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভাল

[৪৮]. David Samuel, Mohammed and The Rise of Islam, Page 63

উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দ বিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয় কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় বিশ্বাসের ভাইরাসের।"
কিন্তু 'মন্দ বিশ্বাস' কি কোনো প্রকার সংক্রামক রোগব্যাধির নাম যে, ভাইরাসের রূপ ধারণ করতে পারে?

ডেনিয়েল ডেনেটের বই থেকে অভিজিৎ রায় উদাহরণ দিচ্ছেন:

"আপনি নিশ্চয়ই ঘাসের ঝোপে কিংবা পাথরের উপরে কোন কোন পিঁপড়াকে দেখেছেন, সারাদিন নিচ থেকে ঘাসের গা বেয়ে কিংবা পাথরের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর আবার ঝুপ করে পড়ে যায় নিচে, তারপর আবারো (ঘাসের বা পাথরের) গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই বেআক্কেল কলুর বলদের মত পণ্ডশ্রম করে পিঁপড়াটি কি এমন বাড়তি উপযোগিতা পাচ্ছে, যে এই অভ্যাসটা টিকে আছে? কোন বাড়তি উপযোগিতা না পেলে সারাদিন ধরে সে এই অর্থহীন কাজ করে যাচ্ছে কেন? আসলে এই কাজের মাধ্যমে সে বাড়তি কোন উপযোগিতা তো পাচ্ছেই না, বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। গবেষণায় দেখা গেছে পিঁপড়ার মগজে থাকা 'ল্যাংসেট ফ্লুক' নামের এক ধরনের 'প্যারাসাইট' এর জন্য দায়ী। এই প্যারাসাইট বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধু তখনই যখন কোন গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইটটা নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আসলে ঘাস বেয়ে উঠানামা পিঁপড়ের জন্যে কোন উপকার করছে না বরং ল্যাংসেট ফ্লুক কাজ করছে এক ধরনের ভাইরাস হিসেবে, যার ফলশ্রুতিতে পিঁপড়াটি বুঝে বা না বুঝে নিজের অজান্তেই ভাইরাস দ্বারা চালিত হচ্ছে'।

বুঝা গেল পিঁপড়াটি গরু বা ছাগলের পেটে ঢুকে শহীদ হয় বা আত্মহত্যা করে নিজের কোনো উপকারের জন্য নয়, বরং ল্যাংসেট ফ্লুক নামক ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য। কিন্তু মানুষ তো আর পিঁপড়া, পতঙ্গ বা ইঁদুর নয়, মানুষ তো ল্যাংসেট ফ্লুক ভাইরাস নিয়ে জন্মায় না, সকল মানুষের বুকে বোমা বেঁধে একশো বিলিয়ন ডলার দিয়েও টুইনটাওয়ারে ঢুকানো যাবে না। 'বিশ্বাসের ভাইরাস' এর উৎস কোথায় আর তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয় কীভাবে? অভিজিৎ রায় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছেন তাঁর ভাষায়:

'ধর্মগ্রন্থের যে অংশগুলোতে জিহাদের কথা আছে (২:২১৬, ২:১৫৪), উদ্ভিন্ন যৌবনা হুরীদের কথা আছে (৫২: ১৭-২০, ৪৪: ৫১-৫৫, ৫৬: ২২), মুক্তসদৃশ গেলমানদের কথা আছে (৫২:২৪), সে বাণীগুলোকে ছোটবেলা থেকে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কিংবা বছরের পর বছর সৌদি পেট্রোডলারে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা নামক আগাছার চাষ করে বিভিন্ন দেশে তরুণ সমাজের কিছু অংশের মধ্যে এক ধরনের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' তৈরি করা হয়; ফলে এই ভাইরাস-আক্রান্ত জিহাদিরা স্বর্গের ৭২টা হুর-পরীর আশায় নিজের

বুকে বোমা বেঁধে আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। ল্যাংসেট ফ্লুক প্যারাসাইটের মত তাদের মনও কেবল একটি বিশ্বাস দিয়ে চালিত। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের মত কোরানেও বেশ কিছু ভাল ভাল কথাবার্তা আছে যেগুলো নিয়ে ইসলামিস্টরা যারপর নাই গর্ববোধ করেন। যেমন, ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই (২:২৫৬), তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার (১০৯:৬), এমনকি কোরানের নির্দেশ আছে শত্রুর প্রতি ভাল ব্যবহার করার (২:৮৩) ইত্যাদি। কিন্তু সেই কোরানেই আবার আছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যায়, তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫) তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। কোরান শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। কোরানে ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছে (৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯:২৩, ৩:২৮)। কোরানের পরস্পর বিরোধিতার এর চেয়ে ভাল নমুনা আর কী হতে পারে? কোরান কেন প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই আসলে এরকম। ভাল মানুষেরা ভাল ভাল বাণীগুলো থেকে ভাল মানুষ হবার অনুপ্রেরণা, আবার সন্ত্রাসবাদীরা ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পায় সন্ত্রাসী হবার। সেজন্যই তো ধর্মগ্রন্থগুলো একেকটি 'ট্রোজান হর্স' ছদ্মবেশী ভাইরাস। কিভাবে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে আধুনিক 'মিম' তত্ত্বকে। আমরা তো 'জিন' এর কথা ইদানীং অহরহ শুনি। 'জিন' হচ্ছে মিউটেশন, পুনর্বিন্যাস ও শরীরবৃত্তিক কাজের জন্যে আমাদের ক্ষুদ্রতম অভিবাজ্য একক। সহজ কথায় 'জিন' জিনিষটা হচ্ছে শরীরবৃত্তিয় তথ্যের অখণ্ড একক যা বংশগতীয় তথ্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়। 'জিন' যেমন আমাদের শরীরবৃত্তিয় তথ্য বংশপরম্পরায় বহন করে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক তথ্য বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে যায় 'মিম'। কাজেই 'মিম' হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক তথ্যের একক যা ক্রমিক অনুকরণ বা প্রতিলিপির মাধ্যমে একজনের মন থেকে মনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি 'মিম' টি বহন করে তাকে 'মিম' টির হোস্ট বা বাহক বলা যায়। 'মেমেপ্লেক্স' হল একসাথে বাহকের মনে অবস্থানকারী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একদল 'মিম'। কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি, কোন দেশীয় সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক মতাদর্শ এগুলো সবই 'মেমেপক্সের' উদাহরণ। কিছু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যখন কোন নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত, এই ধারণা থেকে যে এটি প্রাসাদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্য জন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমন কি খেয়েও ফেলত। কোন কোন সংস্কৃতিতে কোন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে

*'ভাকাতোকা' নামে এক ধরনের বিভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অঙ্গগুলো খাওয়া হত। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ভারতে সতীদাহের নামে হাজার হাজার মহিলাদের হত্যা করার কথা তো সবারই জানা। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে। এগুলো সবই সমাজে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর কিছুই নয়'। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)। এ নিয়ে অভিজিৎ রায়ের আরো একটি চমৎকার লেখা; 'ধর্ম কেন ভাইরাসের সমতুল্য'? (প্রেক্ষিত: পেশোয়ার এবং শার্লি এবদো) অন্তর্জালিক ঠিকানা-*https://blog.mukto-mona.com/2015/01/18/44188/

অভিজিৎ রায়ের 'প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের মত কোরানেও বেশ কিছু ভাল ভাল কথাবার্তা আছে' এবং 'ভালমানুষেরা ভাল ভাল বাণীগুলো থেকে ভালমানুষ হবার অনুপ্রেরণা পায়' বক্তব্যদ্বয় ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ধরা যাক একজন নাস্তিক মা, যিনি কোনোদিন কোনো প্রকার ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে দেখেননি বা পড়েননি, তিনি যখন তাঁর সন্তানকে উপদেশ দেন, আগুনে হাত দিও না, জলে ঝাঁপ দিও না, সদা সত্য কথা বলিবে, পরনিন্দা ভাল নয়, পরের ধন চুরি করো না, সেই নাস্তিক মায়ের এই মানবিক মূল্যবোধ-নৈতিকতা আসে কোথা হতে? তাঁর কি ধর্মগ্রন্থের কোনো প্রয়োজন আছে? ধর্মগ্রন্থ মানবকল্যাণের লক্ষ্যে রচিত হয় নি, হয়েছে যুগে যুগে কতিপয় ব্যক্তিস্বার্থপর মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে। ধর্মগ্রন্থ পড়ে, ধর্মচর্চা করে একজন মানুষ ভাল ধার্মিক, ভাল হিন্দু, ভাল খ্রিস্টান, ভাল মুসলমান হতে পারে, কিন্তু ভাল মানুষ হতে পারে না। বিশ্বজগৎ ও প্রাণের উৎস বা শুরু কোথায়, জীবন বা প্রাণের সংজ্ঞা কী, মন বা আত্মা বলতে আদৌ কোনো জিনিস আছে কি, কখন কী কারণে কীভাবে প্রাণহীনে প্রাণ আসে, আবার কেন চলে যায়, কোথায় যায়?

এবার আমরা মনোনিবেশ করবো সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে, যা আজও বিশ্বাসীগণ বিজ্ঞানের প্রতি পাহাড়সম ওজনের চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন। 'এলাম আমরা কোথা হতে'? বিশ্বাসীগণ এ প্রশ্নটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেন ঈশ্বরের প্রতি, কিন্তু নিষেধ করেন পাল্টা প্রশ্ন করতে। 'ঈশ্বর এলেন কোথা হতে' এই প্রশ্ন করা যাবেনা। আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) আজ জীবিত থাকলে তাঁর বয়স হত প্রায় পাঁচ হাজার নয়শত পঁচাত্তর বৎসর। হজরত আদমের বয়সের হিসেবটা ইঞ্জিল কেতাব (Bible) থেকে নেওয়া উত্তম; যেহেতু কোরান গ্রন্থখানি তৌরাত,

জবুর, ইঞ্জিল কেতাব এবং মুহাম্মদের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকদের গদ্য-পদ্য থেকে কপি-পেস্ট করে রচিত। বাইবেলে রয়েছে: 'প্রথম মানব হজরত আদম পৃথিবীতে বাস করেছিলেন ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এবং ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তার সপ্তাহব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর বয়সও ছয় হাজার বৎসর। আজ থেকে প্রায় ১৪৩৯ বৎসর পূর্বে, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম এবং আজ যদি মুহাম্মদের নিকটতম নবি হজরত ঈসা (Jesus) জীবিত থাকতেন তার বয়স হত দুই হাজার নয় বছর। হজরত ঈসা (আঃ) থেকে তার পূর্বপুরুষ মরিয়ম, ইয়াহিয়া, জাকারিয়া, সুলেইমান, দাঊদ, ইয়াকুব, ইসহাক হয়ে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) পর্যন্ত সময়কাল ২০১৮ বছর। একইভাবে হজরত মুহাম্মদের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিম পুত্র ইসমাইলের বংশধর কোসাইদ, আবদে মনাফ, হাশিম, আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল্লাহ হয়ে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত সময়কাল ২৫৮৮ বৎসর। হজরত নুহের জন্মের ৮৯২ বছর পর নবি ইব্রাহিমের (আঃ) জন্ম আর আদি পিতা আদমের জন্মের ১০৫৬ বছর পরে নুহ নবির জন্ম। সুতরাং হিসেবটা দাঁড়ালো এই: আদম থেকে নুহ ১০৫৬ বছর + নুহ থেকে ইব্রাহিম ৮৯২ বছর + ইব্রাহিম থেকে ঈসা ২০১৮ বছর + ঈসা থেকে মুহাম্মদ ৫৭০ বছর আর মুহাম্মদ থেকে আজ ১৪৩৯ বছর = ৫৯৭৫ বছর প্রথম মানব-মানবী আদম-হাওয়া ও আমাদের পৃথিবীর বয়স। সুতরাং এদিক-সেদিক করেও হজরত আদমের জন্মসন ছয় হাজার বৎসরের পূর্বের কোন সন-তারিখে নেওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য ধর্মগ্রন্থ মতে হজরত নুহের (আঃ) ছয়শত বছর বয়সে মহাপ্লাবন ঘটেছিল (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে) এবং ঈশ্বর কর্তৃক আদম সৃষ্টির ১৬৫৬ বছর পরে।[৪৯]

'এলাম আমরা কোথা হতে' এ প্রশ্নটির মধ্যে খাদ আছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন এমন প্রশ্ন করা হয়, তখন আগেই ধরে নেওয়া হয় যে, আধুনিক মানুষ আমাদের রূপ-রঙ, আকার-আকৃতি, গড়-গঠন, ভাষা-ব্যবহার, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা সবসময় সমান ও একই অবস্থায় ছিল। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। বিজ্ঞান বলেছে: 'আমাদের মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ১৩-১৫শ কোটি বছর আগে আর পৃথিবীসহ আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি ঘটে সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। তারপর আরো ১শ কোটি বছর লেগেছে আমাদের

[৪৯]. তৌরাত শরিফ, জেনেসিস, ৫: ১-৩২; The Christian News, March 26, 2001, page 18; World Book, vol.6 page 270

পৃথিবী নামক গ্রহটির মহাপ্রলয়ঙ্করী উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণের উৎপত্তির জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা যায় পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হতে শুরু করেছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে'।

মহাবিশ্বের উদ্ভব চৌদ্দশো কোটি বছর আগে, সৌরজগতের বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছর, আর সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে প্রাণের উৎপত্তি। তবে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মাত্র ছয় হাজার বছর পূর্বে জগৎ ও জীবন সৃষ্টি কি মিথ্যে? সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে প্রাণের উৎপত্তি না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু তার জন্যে মালমশলা আসলো কোথা হতে? অন্তত মালমশলা জোগানদাতার কৃতিত্বটুকু 'ঈশ্বরকে দিলে ধর্মের মুখটা রক্ষে হয়। কিন্তু অলুক্ষণে বিজ্ঞান এটুকু কৃতিত্বও দিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ-রসায়ন (Geo-Chemistry) জৈব-রসায়ন (Bio-Chemistry) এর গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে: 'সূর্য যখন প্রথম দৃষ্টিপাত করেছিল পৃথিবীর ওপর, যে পৃথিবী 'অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিল' 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে' আজ থেকে সাড়ে চারশো কোটি বছর অতীতে, 'অগ্নিতে বাষ্পেতে ঘুলিয়ে উঠেছি' তখনকার আকাশ বাতাস। পৃথিবী তখন আগুনের সমুদ্র, ...। পদার্থবিদ্যার নিয়মে যথাসময়ে যখন আগুন নিভে এল, তখন সেই পদার্থ-রসায়নবিদ্যার নিয়মেই তৈরি হল জীবনের আদি ভিত্তি। মালমশলাগুলির প্রধানতম উপাদান হল এক অদ্ভুত নতুন ধরনের মালা। আমরা চিনির স্বাদ পাই আখে, মধুতে, আঙুরের রসে, ইক্ষুশর্করা, মধুশর্করা, আঙুরশর্করা। মালাটি যেন দুটি ফুল দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে প্রধান হল চিনি। আরবদেশের বাবুল গাছের গঁদের আঠায় এক ধরনের চিনি পাওয়া যায়। যেহেতু এটি আরবি চিনি, নামকরণ হল আরাবিনোস (arabinose) ইক্ষুশর্করা ও দ্রাক্ষাশর্করার নাম যেমন সুক্রোস (sucrose) ও ফ্রুকটোস (sucrose) । পরে আরেকটি চিনির সন্ধান পাওয়া গেল, যেটির রাসায়নিক সংকেত অবিকল আরাবিনোসের মতো, কিন্তু তার ত্রিমাত্রিক চেহারা অর্থাৎ স্থাপত্য ভিন্ন প্রকৃতির। আরাবিনোস নামটি ভেঙ্গে এটির নাম হল রাইবোস (ribose) শর্করা। এই রাইবোস চিনি হল মালাটির একটি উপ-অণু (sub-molecule)। অন্য ফুলটি হল ফসফেট উপ-অণু; যার জোগান আমাদের শরীরে না থাকলে মৃত্যু অবধারিত। চাষের কাজে ফসফেটের জোগান না থাকলে ফসল মার খাবে। বিনিসুতোর মালাটিতে একটি রাইবোসের পর একটি ফসফেট, তারপর পরপর রাইবোস-ফসফেটের সুদীর্ঘ

কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় আণবিক মাপের মালা, যা সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। যেন অদৃশ্য গোলাপ ও চাঁপার মালা। দীর্ঘ এই মালায় এক সার পেন্ডেন্টের মতো ঝুলছে চারটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার, যার এক একটি চিনির সঙ্গে লটকানো। ক্ষার হল অ্যাসিড বা অম্লের রাসায়নিক প্রতিপক্ষ, যেমন সোডাচুন। মজার ব্যাপার, অম্ল আর ক্ষার দুইই ক্ষয়কারক, চিনি ক্ষয়কারক নয়। চিনির একদিকে ফসফেট (যার অম্লিক গুণ আছে) অন্যদিকে ক্ষার, সব মিলিয়ে কিছুটা স্থিতিস্থাপক। বলছি বটে বিনিসুতোর মালা, বাস্তবে ইলেকট্রনিক-রাসায়নিক বন্ধনশক্তি এদের বেঁধে রেখেছে। এই মালাটির নাম হল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে 'আরএন' বহুশ্রুত RNA ডিএন এর বড়ভাই অর্থাৎ পূর্বজ। আদি পৃথিবীর আগুন যখন নিভে যায় তখন আরএনএ প্রথম সৃষ্টি হয় তারপর ডিএনএ। 'আরএনএ' 'ডিএনএ'র নিজস্ব কোনও প্রাণসত্তা নেই, ল্যাবরেটরিতে চিনির মতোই বহুকাল বোতলজাত করা যায়, কিন্তু এরাই জীবনের প্রধানতম ভিত্তি, এরাই প্রথম'।[৫০]

যার নিজস্ব কোনো প্রাণসত্তা নেই সে'ই জীবনের প্রধানতম ভিত্তি সে'ই প্রথম। কি আজব কাণ্ড! তারপর পৃথিবী বহুকালে ধীরে ধীরে শীতল হলো, উদ্ভব ঘটলো এককোষী জীবের। আস্তে আস্তে বহুকোষী জীবে ছড়িয়ে পড়া এবং সালোক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদের দান 'মুক্ত-অক্সিজেন' পেয়ে জগতে মানুষসহ অক্সিজেন গ্রহণকারী সকল জীবের মহাযাত্রা শুরু। তাই বলে জীবের সংজ্ঞায় মানুষ আর পশু কি সমান? অন্যান্য জীবের বৈশিষ্ট বা গঠনের সাথে মানুষের কি কোনো মিল আছে? বিবর্তনবিদ্যা বলছে: 'মানুষের হাতের হাড় আর এত অন্যরকম দেখতে একটা তিমি মাছের সামনের পাখার হাড় প্রায় একই রকম। আবার, জন্ম-পূর্ববর্তী ভ্রূণাবস্থায় বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাচ্চাদের দেখতে অনেকটা একইরকম দেখায়। শিম্পাঞ্জিদের সাথে আমাদের ডিএনএ প্রায় ৯৮.৬%, ওরাংওটাঙের সাথে ৯৭%, আর ইঁদুরের সাথে ৮৫% মিলে যাচ্ছে। এ কারণেই ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ওষুধের বা চিকিৎসার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তা পরবর্তীতে আবার মানুষের দেহে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আর এসব সাদৃশ্যের পেছনে কারণ একটাই, পৃথিবীর সব প্রাণীই একই আদি জীব বা পূর্বপুরুষ থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে। যে জীব যত পরে আরেক জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে

---

৫০. ড. নারায়ণ সেন, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর

অন্য প্রজাতি বা জীবে পরিণত হয়েছে তার সাথে ঐ জীবের ততই বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়'।[৫১]

তাহলে কি আমরা বুদ্ধিমান আধুনিক মানুষেরা 'আশরাফুল মখলুকাত' সৃষ্টির সেরা মানবজাতি নই বরং মানব-প্রজাতি? মানুষের শ্রেষ্টত্বটা রইলো কোথায়? আমরা কি অন্য কোনো প্রাণীর বিবর্তিত রূপ? কে আমাদের পূর্বপুরুষ আর কখন হলো পৃথিবীতে মানব-প্রজাতির মহাযাত্রার শুরু? প্রথমে দেখা যাক ধর্মগ্রন্থে এ ব্যাপারে কী লেখা আছে। ধর্মগ্রন্থগুলোর দাবি, ঈশ্বর নিজ হাতে স্বযতনে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তারই মতন করে। আল্লাহ একদিন ফেরেস্তাদের সাথে এক বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির প্রস্তাব করলে একবাক্যে সকল ফেরেস্তা প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। শতভাগ 'না' ভোটের তোয়াক্কা না করেই আল্লাহ তাঁর প্রস্তাব নিজেই পাশ করলেন। মালমশলা আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল আরব দেশের তায়েফ শহরের এক কোণে। মাটির পুতুল বা মূর্তি তৈরির দায়িত্ব কোনো ফেরেস্তাই নিতে রাজি হলেন না। অনিচ্ছাকৃতভাবে আজরাইল রাজি হলেন, কিন্তু মাটি তাকে ফিরিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ক্ষুদ্ধ চেহারা দেখে মাটি রাজি হলো আর আজরাইল এক থাবায় ৪০ মণ মাটি তোলে নিলেন। মূর্তির নকশা সামনেই ছিল, সেই রূপেই তৈরি হল ৯০ ফুট লম্বা আদমের মূর্তি। তায়েফ শহরের মাটিতে চিৎ করিয়ে আদমের প্রাণহীন মূর্তিটি রাখা হল ৪০ দিন। তারপর আজরাইল মূর্তিটিকে কাঁধে করে নিয়ে আল্লাহর ঘরের সামনের উঠানে চিৎ করিয়ে রাখলেন আরো ৪০ দিন। এক পর্যায়ে আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নিজের রুহ্-ভর্তি মুখ আদমের মূর্তির মুখে লাগিয়ে ফুঁক দিলেন আর অমনি নিস্প্রাণ আদম প্রাণ পেয়ে নড়েচড়ে উঠলেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণীত হাদিসের ৯০ ফুট লম্বা আদমের মূর্তি মেনে নিতে বিশ্বাসী মুসলমানদের, চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নি। বিজ্ঞানের আলোকছটা যখন তাদের চোখেও এসে পড়লো, তাঁরা তখন হাদিসটি মেরামতে মনযোগ দিলেন। তারা নতুন ব্যাখা দিলেন, 'আল্লাহ যখন আদমকে অবাধ্যতার কারণে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দুনিয়ায় পাঠাবেন, তখন দেখা গেল আদমের পা দুখানি দুনিয়ার মাটিতে আর মাথা আকাশে লেগে যায় তাই আল্লাহ আদমকে ছোট করে ৯০ ফুট করে নেন। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ৬ হাজার বছরে হজরত আদম থেকে হজরত মুহাম্মদ পর্যন্ত সময়ে মানুষ

[৫১] বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, পৃষ্ঠা ৯

৯০ ফুট থেকে ৫-৬ ফুটে এসে ঠেকেছে এবং এর ধারাবাহিকতার এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু মৃত্যুর পরে আবার মুসলমানগণ যখন বেহেস্তে যাবেন তাদের উচ্চতা হবে ৯০ ফুট'। (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৫, নম্বর ৫৪৩, ৫৪৪; এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৪, নম্বর ২৪৬; মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৬, বুক ৪০, নম্বর ৬৭৯৫-৬৭৯৬, এবং মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১১, বুক ৪০, ৬৮০৯)।

Sahih Bukhari shareef;

Volume 4, Book 55, Number 543:

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "Allah created Adam, making him 60 cubits tall. When He created him, He said to him, "Go and greet that group of angels, and listen to their reply, for it will be your greeting (salutation) and the greeting (salutations of your offspring." So, Adam said (to the angels), As-Salamu Alaikum (i.e. Peace be upon you). The angels said, "As-salamu Alaika wa Rahmatu-l-lahi" (i.e. Peace and Allah's Mercy be upon you). Thus the angels added to Adam's salutation the expression, 'Wa Rahmatu-l-lahi,' Any person who will enter Paradise will resemble Adam (in appearance and figure). People have been decreasing in stature since Adam's creation.

Volume 4, Book 55, Number 544:

Narrated Abu Huraira:

Allah's Apostle said, "The first group of people who will enter Paradise, will be glittering like the full moon and those who will follow them, will glitter like the most brilliant star in the sky. They will not urinate, relieve nature, spit, or have any nasal secretions. Their combs will be of gold, and their sweat will smell like musk. The aloes-wood will be used in their centers. Their wives will be houris. All of them will look alike and will resemble their father Adam (in statute), sixty cubits tall."

বিশ্বাসীরা হাদিসে বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞান বুঝতে গিয়ে তারা বিবর্তনবাদকেই বিকৃত করে ফেললেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন সময়ে মানুষ রচনা করেছে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে হরেক রকমের কাহিনি। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলো মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের নিছক কল্পকাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয়; কারণ জৈববিবর্তনবাদের দৃষ্টিতে: বানর, বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও আরো প্রজাতি ছিল। ...জীববিজ্ঞান অনুজীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিজ্ঞানীরা মানুষের পূর্বসূরি প্রজাতিগুলোকেও সনাক্ত করতে পেরেছেন। তারা আজ সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, এক ধরনের বনমানুষ বা এপ থেকে আসলে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, এদের সাথে আমাদের ডিএনএ'র প্রায় ৯৮.৬% মিল রয়েছে'।[৫২]

জৈববিবর্তন এবং প্রজাতির প্রজনন ক্ষমতা সম্বন্ধে অনবিহিত ধর্মবিশ্বাসীরা শেষ মরণকামড় বসাতে সচেষ্ট হন এই বলে: 'আজ কেন কোনো বানরের গর্ভে মানুষ কিংবা কোনো মানুষের গর্ভে বানর জন্মায় না'? চটকদার প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ধূর্ত প্রয়াস। এ প্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখা এখানে দেওয়া নিস্প্রয়োজন। বির্বতনবিদ্যা, আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স কিংবা জিনোমিক্সের কোথাও বলা হয়নি বর্তমানকালের বানর বা এপের গর্ভে 'মানুষ' জন্ম নিয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে জৈববিবর্তনবাদ হচ্ছে: The cumulative changes that occur in a population over time. These changes are produced at the genetic level as organisms' genes mutate and/or recombine in different ways during reproduction and are passed on to future generations. Sometimes, individuals inherit new characteristics that give them a survival and reproductive advantage in their local environments; these characteristics tend to increase in frequency in the population, while those that are disadvantageous decrease in frequency. This process of differential survival and reproduction is known as natural selection. Non-genetic changes that occur during an organism's life span, such as increases in muscle mass due to exercise and diet, cannot be passed

[৫২]. বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, পৃষ্ঠা ৫

on to the next generation and are not examples of evolution. আর একটি প্রজাতি তার নিজের প্রজাতি ছাড়া অন্য কোনো প্রজাতির জীবের সাথে প্রজনন ঘটাতে পারে না। বিখ্যাত জৈববিবর্তনবাদী আর্নস্ট মায়ার (Ernst Mayr) প্রজাতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে: 'প্রজাতি হচ্ছে এমন একটি প্রাকৃতিক জনপুঞ্জ যার সদস্যগণ বাস্তবে নিজেদের মধ্যে অবাধ জননরত অথবা জনন করার ক্ষমতা রাখে, যাদের আছে একটি 'কমন' জিন ভাণ্ডার (gene pool) এবং অনুরূপ অন্যান্য দল থেকে যৌনজননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন'। অর্থাৎ জৈববিবর্তন একটি Cumulative পরিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া বা ঘটনা, ব্যক্তিবিশেষের (Individual) ওপর নির্ভরশীল কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়া নয়। কোনো প্রজাতির সমগ্র প্রাণীর বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর (population) মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, ইকোলজির পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, অভিযোজন, জিন মিউটেশন, ক্রোমোসোম মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, জেনেটিক ড্রিফট ইত্যাদি ফ্যাক্টরের প্রভাবে দীর্ঘ সময়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে; যেমন আজ থেকে প্রায় ৪০ মিলিয়ন বছর আগে হোমিনয়ডিয়া (Hominoidea) সুপার ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত এক ধরনের Common Ancestor থেকে গিবন, ওরাংওটাঙ, গরিলা, বানর, বনমানুষের পূর্বপুরুষরা আলাদা আলাদা Common Ancestor এ ভাগ হয়ে যায় এবং এরপর ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে আরেক Common Ancestor থেকে মানুষ ও শিম্পাঞ্জি আলাদা আলাদা প্রজাতিতে 'বিবর্তনের পথ ধরে' বিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানকালের শিম্পাঞ্জি ও মানুষে এসে পৌঁছেছে।

আমরা তাওরাত, বাইবেল, Exodus, Leviticus, বৃহৎসংহিতা, মনুসংহিতা, ঋদবেগ থেকে এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি যদিও সঙ্গত কারণেই সম্পূর্ণ লেখাটিতে কোরান এবং হাদিসের আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থানুসারী সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্মের কারণে এখন আর তেমন বিশৃংখলা মারামারি হানাহানি নেই, কিন্তু কোরান হাদিস অনুসারী সমাজ বা রাষ্ট্র, ধর্মের নামে মুসলমানগন নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি, হত্যা সন্ত্রাস তো করেনই সারা বিশ্বের জন্যে ইসলাম আজ এক আতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ধর্মগ্রন্থই নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেনি, করেছে ভোগ্য সম্পদ হিসেবে। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থেই মানুষের রক্তের দাগ আছে, কোন ধর্মই মানুষের রক্ত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া প্রতিষ্ঠা পায়নি। সকল ধর্মগ্রন্থই একেকটি খুনের দলিল। যুগেযুগে ক্ষমতা, সম্পদ ও নারলোভী কিছু ধূর্ত মানুষ

ধর্মগ্রন্থ রচনা করে কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেই ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে ধর্মের নামে, কাল্পনিক ঈশ্বরকে খুশী করে, বোকার স্বর্গ লাভের আশায়, আজও কিছু মানুষ অকাতরে নিজেকে বলি দেয় অপরকেও খুন করে স্বানন্দচিত্তে। এই প্রবন্ধে ইসলামী স্কলারদের লেখা কোরান হাদিসের তাফসির, ব্যাখ্যা, ইসলামী ইতিহাসবিদদের লেখা ইতিহাস, ও নবি মুহাম্মদের জীবনীকারদের লেখা গ্রন্থ সমুহ থেকে, মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের ৪০ বছর পরবর্তী, তাঁর ২৩ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করার পর 'ইসলাম' ধর্মের যে চিত্র ভেসে ওঠে, তা ইসলাম বিশেষজ্ঞ Sir William Muir এভাবে প্রকাশ করেন:

The sword of Mahomet, and the Coran, are the most fatal enemies of Civilization, Liberty, and Truth, which the world has yet known.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই 'ম'-এর নারী-শিক্ষা

'Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion' আইনের পাথরে জেলখানা তৈরি আর ধর্মের ইটে বেশ্যালয়। -আর্নলড জোসেফ টয়িনবি (১৮৮৯-১৯৫৭)

নারী বিষয়ে হিন্দুদের ভগবান মনু ও মুসলমানদের নবি মুহাম্মদের দৃষ্টিতে বা ধারণায় মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। যদিও মনু ছিলেন শুধুই একজন চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারক, নারী বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল একমাত্রিক; পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছিলেন একজন বিচক্ষণ সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাই সব বিষয়েই মুহাম্মদের (দঃ) ধারণা ছিল বহুমাত্রিক। সে জন্যেই মুহাম্মদের (দঃ) কথায়, কর্মে ও হাদিসসমূহে স্ববিরোধী বক্তব্য নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। মুহাম্মদের (দঃ) বক্তব্যে-আচরণে নারী সম্পর্কে মাঝেমাঝে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নজরে এলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নারী সম্পর্কে কঠোর পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বিভিন্ন ইসলামি-চিন্তাবিদ বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য, 'একটা হাদিস আরেকটা হাদিসকে সমর্থন করে না' অভিযোগে কিছু হাদিসকে দুর্বল (জয়িফ) আর কিছু হাদিসকে সবল বলে থাকেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একজন চতুর এবং দক্ষ রাজনীতিবিদের এরকম পদক্ষেপ নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

যেকোনো দেশের বা কালের সমাজব্যবস্থা কতটুকু উন্নত, কতটুকু মানবিক, কতটুকু গণতান্ত্রিক তা পরিমাপ করতে হলে শাষক-শোষিতের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ে, শোষিতদের জীবনমান নিয়ে যেমন আলোচনা করতে হয়, তেমনি সেই সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কোথায়, সমাজ নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করতে হয়, না হলে সেই সমাজব্যবস্থা কতটুকু মানবিক ছিল তা বুঝা যায় না। পুরুষ কর্তৃক ধর্মীয় ব্যবস্থা বহাল রাখার অন্যতম কারণ অবাধ নারীভোগ। নারীকে জগতের কোনো ধর্মই 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করেনি, করেছে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নারীজাতি শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই দুর্বল,

অক্ষম, অপরিপক্ক, বুদ্ধিহীন, অসংযত'। তাই স্বামী শুধু তার স্ত্রীর দেহের মালিকই নয়, স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত টাকা-পয়সা এমন কি তার পিতার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সম্পত্তিরও মালিক। যদিও আমাদেরকে জন্মের পর থেকে শোনানো হয়, মস্তিষ্কের ভিতর গেঁথে দেবার চেষ্টা করা হয়, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো অপৌরুষেয়; এগুলো ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরই নারী-পুরুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুরা মনুকে ভগবান মানেন, হিন্দু আইনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মনুসংহিতা। আর মুসলমানদের কাছে মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর প্রেরিত সকল সৃষ্টির সেরা মানুষ। মুসলমানগন আল্লাহর সমালোচনা সহ্য করতে পারেন কিন্তু মুহাম্মদের সমালোচনা কতল যোগ্য অপরাধ। ইসলাম ধর্মীয় ভাষ্য মতে আল্লাহর 'ওহি' জিবারাইল মারফত মুহাম্মদের কাছে এসেছে যা অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। পনেরশত বছর আগের এই কথিত আল্লাহর 'ওহি' হলো কোরান শরিফ, আর মুহাম্মদের জীবনাচরণ, বক্তব্য, দর্শন হলো হাদিস, যা আজকে সারা পৃথিবীর প্রায় একশত কোটি মুসলমানদের ঈমানের স্তম্ভ, এবং মুসলিম আইনের ভিত্তি। তাই এই দুই ধর্মের নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই দুই ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে 'নারী' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সেটা দেখতে হবে।

প্রথমেই আমরা দেখি হিন্দুদের কথিত ভগবানের মর্যাদা পাওয়া ব্রাহ্মণ মনু 'নারী' সম্পর্কে আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিস্তৃত আলোচনার সুবিধার্থে হিন্দু ধর্মের আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের 'নারী' সম্পর্কে ভাষ্যটিও জেনে নিব। চতুর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রায়ই বলে থাকেন মনুসংহিতা হচ্ছে মানবধর্মশাস্ত্র। সেই মানবধর্মশাস্ত্রে 'নারী' সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন, (নবম অধ্যায়, চৌদ্দ নম্বর শ্লোক; সংক্ষেপে ৯:১৪):

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।

অর্থাৎ,

স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই,
রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই সম্ভোগ করিতে চায়।

মনু বলেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে (৫:১৫৪):

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।

অর্থাৎ,

পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক
সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

আর স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্মপ্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় (৫/১৬৪)। স্ত্রীর আগে স্বামী মারা গেলে মনু স্পষ্ট ঘোষণা দেন (৫/১৫৭): "স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।" কিন্তু স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে মনুর নিয়মটি ঠিক উল্টো (৫/১৬৮-১৬৯):

"পূর্বে মৃত স্ত্রীকে অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ায় আগুন দিয়ে (স্বামী) পুনরায় বিবাহ করবেন; বিবাহ করে আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহে বাস করবেন।"

আবার স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডের ৬০ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে:

'নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশষতঃ

অশৌচং নির্ঘৃণতৃঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ'।

অর্থাৎ,

নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ ও নির্ঘৃণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজাত।

স্কন্দপুরাণের এই শ্লোকের সাথে মিল রয়েছে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৩ নং শ্লোকের; সেখানে মনু বলেন,

"স্বভাব এস নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্

অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।"

অর্থাৎ,

নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা...।

অশৌচদের ব্যাপারে হাদিস শরিফে আছে, একবার ঈদুল ফিতরের দিনে কয়েকজন মহিলা নবি মুহাম্মদের (দঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবিজি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "হে রমণীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে দান-খয়রাত করো, কারণ আমি মেরাজের সময় জাহান্নাম ভ্রমণকালে দেখেছি দোজখের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী। একজন রমণী জিজ্ঞেস করেন-হে আল্লাহর নবি, কেন এমনটি হবে? নবিজি উত্তর দেন: 'তোমরা নির্দয়, দ্রোহী। অভিশাপ করা ও স্বামীর অবাধ্যতা তোমাদের স্বভাব। ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় তোমরা দূর্বল, নির্বোধ। তোমাদের কুটিলতায় একজন সৎপুরুষ চোখের পলকে অসৎ হতে পারে।' একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেন- নবিজি আমরা ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান তার প্রমাণ কী? নবি উত্তর দেন: 'আল্লাহপাক স্বাক্ষীর ব্যাপারে তোমাদের দুইজনকে এক পুরুষের সমান করেছেন, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার প্রমাণ। তোমাদের মাসিক রক্তস্রাবের কারণে নামাজ পড়তে পারো না, রোজাও রাখতে পারো না, এটা কি তোমাদের অক্ষমতা নয়?' (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৬, নম্বর ৩০১)

মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোকদিগকে অপবিত্র, নাপাক ঘোষণা দিয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান-হাদিস স্পর্শ করতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ-রোজা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দোয়া দরুদ পড়তে বা ব্যবহারিক কোনো বস্তু বা স্বামী সেবা কিংবা তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে ভগবান মনু বলেন (৯:১৮):

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রীয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।

অর্থাৎ,

ব্রাহ্মণসহ সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বেদ-স্মৃতি পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে কোনো অধিকার নেই। নারীরা মন্ত্রহীন, মিথ্যার ন্যায় অশুভ।

আবার মনু বলেন (৯:১৫):

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্তৃস্বেতা বিকুর্বতে।

অর্থাৎ,

পুরুষ দর্শনমাত্র স্ত্রীদের পুরুষের সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা জাগে এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবত স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করে।

ভগবান মনুর এই স্বর্গীয় বাণী, স্ত্রী, মা, বোন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। পদ্মপুরাণে আরও উল্লেখ পাই (সৃষ্টিখণ্ড, ৯১ নম্বর শ্লোক)

"দাসীং হাত্যাতু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে-কামার্তে
মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।"

অর্থাৎ,

শিবলিঙ্গ সেবিকা দাসী হরণ করলে চিরকাল নরক ভোগ হয়ে থাকে। কামার্ত হয়ে বরং মাতৃগমন করবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করবে না।

এমন জঘন্য, অশ্লীল, নোংরা বাক্যও ধর্মগ্রন্থে স্থান পায়?

মুহাম্মদ (দঃ) কখনো কামার্ত হয়ে মায়ের সাথে সঙ্গমের অনুমতি দেন নাই, তবে সাময়িক-অস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। ঘটনাটা এরকম- ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের এক অভিযানে যুদ্ধরত মুসলিম সৈনিকগণ সুদীর্ঘ ১৩ দিন নারীবিহীন রজনী অতিবাহিত করার পর নবিজির কাছে একটা বিহিত করার আবদার করলেন: 'নবিজি দুটি শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি দিলেন; শর্তদ্বয় হলো: (১) যে মেয়ের সাথে অস্থায়ী বিয়ে চুক্তি হবে তাকে একটা কিছু (মূল্য বা মোহরানা) দিতে হবে, তা যতই ন্যূনতমমানের হোক। (২) তিন রাতের বেশি ঐ মহিলাকে রাখা যাবে না।

অস্থায়ী বিয়ের ওপর অনেক হাদিস রয়েছে, সেখান থেকে শুধুমাত্র দুটো হাদিস এখানে ইংরেজিতে দেওয়া হলো:

Abdullah (b. Mas'ud) reported: "We were on an expedition with Allah's Messenger and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? The Prophet forbade us to do so. He then granted us permission that we should contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and 'Abdullah then recited this verse: 'Those who believe do not make unlawful the

good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah does not like transgressors" (al-Qur'an, 5:87) (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৪৩)। বুঝা গেল শুধু নবি মুহাম্মদেরই নয় এতে আল্লাহরও সম্মতি আছে।

আরেকটি হাদিস দেখা যাক- Sabra Juhanni reported: “Allah's Messenger permitted temporary marriage for us. So I and another person went out and saw a woman of Bana 'Amir, who was like a young long-necked she-camel. We presented ourselves to her (for contracting temporary marriage), whereupon she said: What dower would you give me? I said: My cloak. And my companion also said: My cloak. And the cloak of-my companion was superior to my cloak, but I was younger than he. So when she looked at the cloak of my companion she liked it, and when she cast a glance at me I looked more attractive to her. She then said: Well, you and your cloak are sufficient for me. I remained with her for three nights, and then Allah's Messenger said: He who has any such woman with whom he had contracted temporary marriage, he should let her off.”

হাদিসটির বাংলা হচ্ছে- ‘হজরত সাবরা জোহানি (রাঃ) বলেন: “নবিজির অনুমতি পেয়ে আমি বনি সোলায়েম গোত্রের আমার এক বন্ধুকে নিয়ে মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আমরা বনু-আমির বংশের একজন সুন্দরী যুবতীর সম্মুখীন হলাম যার ছিল উষ্ট্রীর মতো লম্বা গলা। আমরা তাকে অস্থায়ী বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাবে মহিলাটি জানতে চাইলো তাকে দেবার মতো আমাদের কী আছে? আমরা বললাম, গায়ের চাদর ব্যতীত আমাদের কিছুই নেই। আমার বন্ধুর চাদরখানি আমার চাদরের চেয়ে অতীব সুন্দর ও মূল্যবান ছিল তথাপি মেয়েটি আমাকেই গ্রহণ করলো। আমি তিনদিন মহিলার সাথে থাকার পর নবিজি আদেশ দিলেন, অস্থায়ী বিয়ের যাদের সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে তাদের মহিলাদিগকে ছেড়ে দেয়া হোক। ‘(দ্রষ্টব্য: সহি মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৫২)’
এই হাদিসটি নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই। দুইজন সাহাবি যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নারীর খোঁজে বেরিয়ে যান; আর অপরিচিত এক সুন্দরী যুবতীকে রাস্তায় পেয়ে দুইজনে একসাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাও দুই-তিন দিনের জন্যে। যে মহিলা জেনেশুনে এক টুকরা চাদরের

মূল্যে তিন রাতের বিছানা-সঙ্গিনী হয়, তাকে 'বেশ্যা' ছাড়া আর কী বলা যায়? আর তিন রাত সাধ মিটিয়ে যে মহিলাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, সে অভাগিনীদের গর্ভে সাহাবিদের পবিত্র বীর্যে কি কোনো সাহাবি জন্ম নিয়েছিল? মডার্ন ইসলামিস্টগণ এই হাদিসের কী রকম ব্যাখ্যা দেন জানার আশা রইলো।

আরবি ভাষায় এই ধরনের অস্থায়ী বিবাহকে মুতা বলা হয়। হিন্দু ধর্মের এক প্রকার বিবাহের নাম 'নিয়োগ প্রথা'। এই দুই ধর্মের দুই প্রকার বিবাহের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা প্রায় অভিন্ন। পরবর্তীতে উভয় প্রথাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও 'মুতা' বা অস্থায়ী বিবাহের সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী অনেক সাহাবি ছিলেন, তথাপি চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের যুগে মুতা প্রথা অবৈধ হয়ে যায়। আর 'নিয়োগ প্রথা' হিন্দু মুনি পরাশর নিষিদ্ধ করে দেন। মুতা বিবাহ ইসলাম ধর্মে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে। হজরত ইবনে আব্বাস, আব্দুল মালিক বিন রাবি, ইবনে আবু আমরাহ আল আনসারি, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইয়াহিয়া বিন মালিক প্রমুখ সাহাবিগণ মুতা প্রথার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের ও হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে তা টিকে থাকতে পারেনি। 'নিয়োগ-প্রথা' বিষয়ে একটু পরে আলোচনা হবে, তার আগে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক:

স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ডের ৬১ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে:

অন্তবিষঃ ময়া-হোতা...বহির্ভাগে মনোরমাঃ।

গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি।

অর্থাৎ,

নারী জাতি সর্বদাই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাইরে মনোহর। নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর (ঠোঁট) আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন (প্রহার) করা কর্তব্য।

নারীর শুধু হৃদয়ে পীড়ন করাই নয়, শারীরিক নির্যাতনের কথাও বলা হয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোকে:

"বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার থাকতে না পারে"।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন: "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।" (দ্রষ্টব্য: ৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)।

নারীকে প্রহার করার জন্য নবি মুহাম্মদ (দঃ) কোরানের সুরা নিসায় একটু ঘুরিয়ে বলেছেন:

"নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতেও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো। (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)।

ইসলামে নারীকে পেটানোর আইডিয়াটা বোধকরি খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) আবিষ্কার। নারীর প্রতি হজরত ওমরের (রাঃ) চিরদিনের ক্রোধ লক্ষ্য করা যায় তার পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনায়। একবার হজরত হাফসাকে স্বীয় স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বেয়াদবি করার কারণে হজরত ওমর মেরেই ফেলতেন, যদি না নবিজি তাকে বারণ করতেন। আবার একটি হাদিসে হজরত ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণীত হয়েছে: "নবিজি নারীকে পেটাতে নিষেধ করেছেন বহুবার কিন্তু একদিন হজরত ওমর (রাঃ) যখন নবির কাছে এসে বললেন যে, দেশের স্ত্রীগণ স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে তখনই রসুল নারী পেটানোর এই আয়াত নাজিল করেন। সাথে সাথে অনেক মহিলা নবির পরিবারকে ঘিরে প্রতিবাদ জানান। নবিজি তাদেরকে বলেন, প্রতিবাদী নারী আল্লাহর অপছন্দ।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৪১)

পরের হাদিসে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন: "নবীজি বলেছেন, নারীকে পেটানোর কারণে পুরুষকে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না।" (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ, বুক ১১, নম্বর ২১৪২)। কারণ আল্লাহ তো আগেই বলে রেখেছেন: "পুরুষ নারীর কর্তা ও রক্ষক। আল্লাহ একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। যেহেতু পুরুষ তার উপার্জনের কিছু অংশ নারীর জন্য খরচ করে তাই নারীকে পুরুষের বাধ্য থাকা উচিৎ। আর তারাই উত্তম নারী যারা তাদের সতীত্ব হেফাজত করে চলে।" (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, মুহাম্মদের (দঃ) জীবনে দুইজন বিদ্রোহী রমণী তাঁকে জীবনের শেষপ্রান্তে অতিষ্ট করে তুলেছিলেন। তাদের একজন হজরত আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা, আরেকজন হজরত ওমরের দুলালী হজরত হাফসা।

মনুসংহিতাতে মনু ঘোষণা দেন (৯:৩):

‘পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি’।

অর্থাৎ,

স্ত্রীলোককে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীলোক (কখনো) স্বাধীনতার যোগ্য নয়।

আবার একটু পরেই বলা হয়েছে (৯:৮৮):

“উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।”

অর্থাৎ,

কুলে আচারে উৎকৃষ্ট, স্বজাতি ও স্বরূপী বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্য না হলেও তাকে যথা-বিধানে সম্প্রদান করিবে।

‘সম্প্রদান’ মানে কী? মানে হচ্ছে বস্তু বা মালের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বদল। নারী প্রথমে তার পিতার মাল এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর মাল। বিবাহিত নারীর ওপর তার স্বামীর আজীবন মালিকানা থাকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে তার মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে যায়। বাল্যবিবাহ বিধিসম্মত কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রমতে মহাপাপ। নবি মুহাম্মদ নিজেই ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে বাল্যবিবাহ জায়েজ করে গেছেন। ‘সম্প্রদান’ ব্যাপারে হজরত আয়েশার উক্তি: “আল্লাহর রাসুল যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয়। নয় বছর বয়সে নবিজি আমাকে তাঁর ঘরে তোলে নেন। শাওয়াল মাসের একদিন আমি আমার সঙ্গীদের সাথে খেলছিলাম। আমার মা উম্মে রুমান যখন আমার কাছে এসে চিৎকার করে ডাক দেন, আমি তখনও দোলনায় দোলছিলাম। মা আমাকে হাতে ধরে ধরে নিয়ে যান, আমি তখন গুন গুন করে গান গেয়েছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, মা আমাকে দিয়ে কি করতে চান। সকালে যখন আল্লাহর রসুল আসেন, মা আমাকে তাঁর হাতে ‘সম্প্রদান’ করেন।” (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯, ৩৩১০)

হিন্দু ধর্মে নারীকে গুঞ্জাফল ও গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর ইসলাম ধর্মে তুলনা করা হয়েছে সম্পদ (মাল) ও উটের সাথে। মুহাম্মদ যে নারীকে 'সম্পদ' (মাল) হিসেবে গণ্য করতেন, হাদিস শরিফ থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণীত:
Allah's Messenger set out on an expedition to Khaibar and we observed our morning prayer in early hours of the dawn. The Apostle of Allah then mounted and so did Abu Talha ride, and I was seating myself behind Abu Talha. Allah's Apostle moved in the narrow street of Khaibar (and we rode so close to each other in the street) that my knee touched the leg of Allah's Apostle. (A part of the) lower garment of Allah's Apostle slipped from his leg and I could see the whiteness of the leg of Allah's Apostle. As he entered the habitation he called: Allah-o-Akbar (Allah is the Greatest). Khaibar is ruined. And when we get down in the valley of a people evil is the morning of the warned ones. He repeated it thrice. In the meanwhile the people went out for their work, and said: By Allah, Muhammad (has come). Abd al-'Aziz or some of our companions said: Muhammad and the army (have come). He said: We took it (the territory of Khaibar) by force, and there were gathered the prisoners of war. There came Dihya and he said: Messenger of Allah, bestow upon me a girl out of the prisones. He said: Go and get any girl. He made a choice for Safiyya daughter of Huyayy (b. Akhtab). There came a person to Allah's Apostle and said: Apostle of Allah, you have bestowed Safiyya bint Huyayy, the chief of Quraiza and al-Nadir, upon Dihya and she is worthy of you only. He said: Call him along with her. So he came along with her. When Allah's Apostle saw her he said: Take any other woman from among the prisoners. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) then granted her emancipation and married her. Thabit said to him: Abu Hamza, how much dower did he (the Holy Prophet) give to her? He said: He granted her freedom and then married her. On the way Umm Sulaim embellished her and then sent her to him (the Holy Prophet) at night. Allah's Apostle appeared as a bridegroom in the morning. He (the Holy Prophet) said: He who has anything (to eat) should bring

that. Then the cloth was spread. A person came with cheese, another came with dates, and still another came with refined butter, and they prepared hais and that was the wedding feast of Allah's Messenger (may peace be upon him). (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১৪, বুক ৮, নম্বর ৩৩২৫)

উপরের এই হাদিস থেকে কিছু প্রশ্ন তোলা যায়। হাদিসের বর্ণনানুযায়ী- গতরাত পর্যন্ত শাফিয়া ছিলেন একজন সম্মানিত গোত্রনেতার স্বাধীন-সুন্দরী কন্যা। তার ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, মা-বাবা সবই ছিল। পরের রাতে সর্বস্ব লুট করে তাকে বন্দী করে 'গনিমতের মাল' হিসেবে নবিজির হেরেমে নিয়ে আসা হলো কেন? মুহাম্মদ (দঃ) তার সাহাবিকে বল্লেন: 'বন্দীশালা থেকে যাকে পছন্দ হয় তাকে নিয়ে যাও।' পরে আরেকজনের বেছে নেয়া নারী শাফিয়াকে নিজের পছন্দ হওয়ায় বললেন 'ওকে নয়, অন্য কাউকে নিয়ে যাও'। তো এখান থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি? নারী কি মানুষ, না বেচাকেনার গাভীর মত ব্যবহারিক সম্পদ, 'উপভোগ্য মাল'?

মনুর দৃষ্টিতে সরাসরিই নারী ছিল গাভীর মতো। মনু বলেন (৯:৫০): "যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমন পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয়না, ক্ষেত্রীরই হয়।" পরবর্তী শ্লোকে মনু বলেন:

তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্।

অর্থাৎ,

যদি কোনো স্ত্রীর স্বামীভিন্ন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বীজ বপন করে ঐ স্ত্রীর পতির অর্থ সৃষ্টি করে; যার বীজ সে ফল লাভ করে না।

এর পরের শ্লোকে (৫২ নং) বলেন:

"ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী।

অর্থাৎ,

নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্রী (স্ত্রীর স্বামী) ও বীজ (সন্তানোৎপাদক) উভয়ের হবে বলে অভিসন্ধি না থাকলে উৎপাদিত সন্তান প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান।

উল্লেখ্য, 'নিয়োগ প্রথায়' স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো মনুসংহিতাসহ হিন্দু ধর্মের আরেক ধর্মগ্রন্থ মহাভারত অনুযায়ী বৈধ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে (৯:৫৯):

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া
প্রজেস্পিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।"

অর্থাৎ,

সন্তানের অভাবে স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর অথবা অন্য যেকোনো সপিণ্ড হইতে অভিলাষিত সন্তান লাভ করিবে।

আর কাশিরাম দাস কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্বে রয়েছে: "শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা (পরবর্তীকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি স্বপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেন। ভীষ্মদেব ইতিপূর্বে কোনো কারণে জীবনে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অনন্যোপায় হয়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (আরেক নাম বেদব্যাস) নামে যে তার (জারজ?) সন্তান হয়েছিল তাকে আহ্বান করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম দান করেন'।

অন্যত্র মনু ভ্রাতৃবধূকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধূর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিংবা ভাইয়ের সন্তান না থাকলে ভাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনের জন্য সঙ্গম করার কথাও বলা হয়েছে। (৯:৫৯)। মনুর ভাষ্যানুযায়ী তাহলে তো পরোক্ষভাবে

মায়ের সাথেই সঙ্গম করা। আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। মনু বলছেন (৯:৫৭):

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু ভার্য্যা যাষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা।

অর্থাৎ

'জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী হলো, কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূতুল্য'।

এবার পুত্রোৎপাদনের জন্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য বিধবার সঙ্গে আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে পুত্রবধূতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। বিষয়টি উল্টোভাবেও করা যায় যেমন, একজন সন্তানহীন বিধবা পুত্রোৎপাদনের জন্যে তার পুত্রতুল্য দেবরের সাথে এবং একজন সন্তানহীন বিধবা পিতৃতুল্য তার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে সঙ্গমের প্রস্তাব করতে পারবেন। এ বিশেষ সঙ্গমটি কিভাবে হবে তাও ভগবান মনু বলে দিয়েছেন (৯:৬০):

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তত্ ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।"

অর্থাৎ,

বিধবাতে নিযুক্ত হইয়া ঘৃতাক্ত-শরীরে, মৌনতা অবলম্বন করতঃ, রাত্রিবেলা, একটিমাত্র পুত্রোৎপাদন করিবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদন করিবে না।

গভীর অন্ধকারে পুত্রোৎপাদন করার জন্যে নিশিথ রাতের অর্থ বুঝা গেল, কিন্তু নারীকে মৌনতা অবলম্বন আর তার শরীরকে ঘৃতাক্ত করার মানেটা কী? মানে হতে পারে, নিঃসংকোচে যৌনকার্য চালিয়ে নিখুত সন্তান লাভ করা। তাইতো মহাভারতে আমরা দেখতে পাই:

'বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যখন মহাপুরুষ বেদব্যাসকে নিয়োগ করা হয় তখন অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেছিল এবং অম্বালিকার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়েছিল। ফলে অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত পাণ্ডুর জন্ম হয়। নবজাত পুত্রদ্বয়ের এই অবস্থা দেখে সত্যবতী খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি পুত্র

বেদব্যাসকে অম্বিকা অথবা অম্বালিকার গর্ভে গন্ধর্বের মতো সুন্দর পুত্রোৎপাদনের জন্যে অনুরুধ করেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই তাতে অসম্মতি জানান এবং উভয়ে পরামর্শ করে নিজেদের জনৈক শূদ্রাণীকে (দাসী) রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা করতঃ অম্বিকার বিছানায় শয়ন করান। যেহেতু বেদব্যাসের সাথে সঙ্গমের সময় এই দাসীর মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ বা ভয় ছিল না অতএব তার গর্ভে এক সুন্দর পুত্রের জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় 'বিদুর' '।

এখানে রাতের পর রাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার পরেও সে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'পুত্রবধূ', আর ওদিকে নবি মুহাম্মদ তার পালক পুত্র জায়েদ জীবিত থাকাকালেই 'আল্লাহর অনুমতি' নিয়ে এসে পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করে তার সাথে আজীবন রতিক্রিয়া করেন। (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য নবি মুহাম্মদের পরে তাঁর কোনো উম্মত অদ্যাবধি এই ধরনের কাজ করেছেন বলে কখনো জানা যায়নি।

সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো স্বামীর মৃত্যুকালে যদি নারীর যোনি অক্ষত থাকে। (৯:১৭৬)। কীভাবে সম্ভব? সম্ভব এভাবেই যদি ঐ নারীর কোনো নপুংসক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, অথবা বাগদত্তা কন্যার পতি মৃত হয়, কিংবা বিয়ের সাথে-সাথেই স্বামী মারা যায়, বা মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়। মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে! হায় ধর্ম, কিন্তু বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখটুকুও পরাশর মুনির সইলো না। নিয়োগ প্রথা বা দেবরাদির দ্বারা সন্তানোৎপাদনের কাজ যতই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাক্যারজনক হোক না কেন, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের স্বাভাবিক শারীরিকচাহিদা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মহামুনি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেন না, তিনি তাঁর আইনে (পরাশর সংহিতা) ঘোষণা দিলেন, 'অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞ, সনড়বাস অবলম্বন, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে'।

নবি মুহাম্মদ বলেন: "আদ্দুনিয়া কুল্লুহুল মাতা ওয়া খাইরু মাতা-ইদ্দুনিয়া আল-মারআ-তুসসালিহা।" বাংলা হচ্ছে, হে পৃথিবীর মানব জাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ; আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (মাল) তোমাদের আমলদার সতী নারী। (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৭, বুক ৮, নম্বর ৩৪৬৫)। উল্লেখ্য আরবি এই 'মাতা' শব্দটি বলতে সম্পত্তি, সম্পদ, সামগ্রী, বস্তু বা দখলকৃত বা ক্রয়কৃত মাল বা ধন বুঝায়। 'মাতা'

শব্দটি কোনো অবস্থাতেই, কোনো অর্থেই 'মানুষ' হয় না, হতে পারে না। আধুনিক যুগের তথাকথিত শিক্ষিত মুসলিমগণ সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য 'মাতা' শব্দের ইসলামি পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন 'অমূল্য সম্পদ'। 'সতী নারী' বলতে কী বুঝায় আর নারীর সতীত্বই বা কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? সতী নারীর প্রতি সকল ধর্মেরই প্রবল আগ্রহ লক্ষণীয়। ধর্মের দৃষ্টিতে সতী মানে সৎ চরিত্রের অধিকারী নয়; সতী বলতে অক্ষত যোনি বা যে নারীকে পূর্বে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি বুঝায়। বিবেককে ধোঁকা দিয়ে অনেক মুসলমান বলেন কোরানের বহু শব্দই নাকি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। মানুষের কাছে 'যুক্তিহীন-অগ্রহণযোগ্য কথা' গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মূলত ইসলামি পরিভাষা, রূপক, ভাবার্থক এসব বলা হয়। মুহাম্মদের কাছে নারী নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয় আর তা শ্রেষ্ঠ হয় 'সতী' শর্ত সাপেক্ষে? হাদিসে নবিজি বলেন:

(আব্দুললাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস হতে বর্ণিত) "আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাসী তোমাদের যারা দাসী খরিদ করে বিবাহ করতে চায়, তারা যেন এই বলে দোয়া করে, 'হে প্রভু এই মহিলাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, সে যেন আমার জন্য উপকারী হয়, তার মধ্যে যেন ভাল গুণ থাকে। আর এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন উট খরিদ করবে।" (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৫৫)।

নারীকে ভোগের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিষ্কার, 'পুরুষ যখন যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ করবে।' সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ, এখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ। পুরুষের লিঙ্গ জীবন্ত-সক্রিয় আর নারীর যোনি প্রাণহীন আবাদভূমি। চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছেমত যখন-তখন। নারীর যোনি যে পুরুষের চাষক্ষেত্র, এ ব্যাপারে ভগবান মনুর সাথে নবি মুহাম্মদের মতের মিল আছে, কোরানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলছেন, "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শষ্যক্ষেত্র, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২২৩)। এই আয়াতের পটভূমি সম্পর্কে জানা যায়, একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন সদ্য বিবাহিত আনসারিদের এক মহিলা। মক্কা মোহাজিরিনগণ যখন মদিনায় আসেন তন্মধ্যে একজন মোহাজির এক আনসারি (মদিনাবাসী মুসলিম) মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ মহিলা পূর্বে ইহুদিদের সাথে বসবাস করতেন

বিধায় ইহুদিদের সঙ্গম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। কোরায়েশ বংশীয় স্বামী যখন তার সাথে তার পেছন দিক থেকে সঙ্গম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন মহিলাটি এই বলে প্রতিবাদ করলো: “আমি উপুড় হয়ে শুইতে যাবো না, তোমার পছন্দ না হয় বিছানা ত্যাগ করতে পারো।” সমস্যাটার সংবাদ আল্লাহর রসুলের কান পর্যন্ত পৌঁছিল। নবিজি কোরানের বাণী দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করে দিলেন। আর স্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো, কোনো অবস্থাতেই স্বামীগণ যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে না যায়। হাদীসে উল্লেখ আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রসুল বলেছেন, যখন একজন স্বামী সঙ্গম করার জন্য তার স্ত্রীকে আহ্বান করেন, তখন সে স্ত্রী যদি বিছানায় না এসে অন্যত্র রাত কাটায়, ফেরেস্তারা ঐ নারীকে সমস্ত রজনী অভিশাপ দিতে থাকেন। (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২০, বুক ৮, নম্বর ৩৩৬৬)। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন। (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২২২)। তবে বলেছেন: “কেউ যদি ঐ সময় তা থেকে বিরত না থাকতে পারে, তাহলে সে যেন এক মুঠো খেজুর দান করে অথবা একজন ভিক্ষুক খাওয়ায়।” (দ্রষ্টব্য: আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৬৪)। ভিক্ষুক খাওয়ানো অথবা এক মুঠো খেজুর দান করার মধ্যে বেচারী স্ত্রীর লাভ-ক্ষতি মোটেই বুঝা গেলো না। এদিকে মিশকাত শরিফে পাই, ‘রজঃস্বলা স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ সঙ্গম করলে, তাকে এই কাজের জন্য এক দিরহাম সদকা দিতে হবে। রক্তের রঙ কিছুটা হলদে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্ধদিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার'। (দ্রষ্টব্য: মিশকাত শরিফ, ৫৫৩-৫৫৪)।

এতক্ষণ গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করে আমরা ‘নারী’ বিষয়ে এই শিক্ষা পেলাম যে, নারী পুরুষের উপভোগ্য ‘সম্পদ’ বই কিছু নয় (মুহাম্মদ) এবং নারীগণ কেবলই মিথ্যা পদার্থ (মনু)।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবি আয়েশা (রাঃ) এবং নবি মুহাম্মদ (দঃ)

মক্কায় কোরায়েশ বংশের বনি তায়িম গোত্রে ইসলাম ধর্মের অন্যতম সাহাবি এবং প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের (রাঃ) জন্ম। তাঁর পিতার নাম উসমান (আরেক নাম আবু কাহাফ) ও মাতার নাম ছিল সালমা (আরেক নাম উম্মুল খায়ের)। আবু বকরের (রাঃ) স্ত্রী কুতাইলা যখন কোনো অবস্থাতেই নিজের পিতৃপুরুষের 'পৌত্তলিক ধর্ম' ত্যাগ করে মুহাম্মদের প্রচারিত নতুন ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, আবু বকর তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। আবু বকরের (রাঃ) আরেক স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে হজরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদের (দঃ) পরামর্শ অনুযায়ী আবু বকর (রাঃ) যখন প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন, কোরায়েশগণ তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে আবু বকর (রাঃ) তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশার নিরাপত্তার জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোরায়েশদের অসহযোগিতা, রক্তচক্ষু, গালমন্দে অতিষ্ট আবু বকর (রাঃ) দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন; আবু বকর (রাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ইয়েমেন ও পরে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যান। কিছুদিন পরে আবার স্বপরিবারে মক্কায় ফিরে আসেন। একই বছর (৬১৯ খ্রিস্টাব্দে) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। খাওলা বিনতে হাকিম নামক মুহাম্মদের (দঃ) এক বান্ধবী তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দেন। খাওলা বললেন:

- আপনি কি আরেকটা বিয়ে করবেন?

- কাকে করবো?

- আপনি চাইলে একজন সতী (Virgin) কে করতে পারেন কিংবা একজন তালাক প্রাপ্ত বা বিধবাকেও করতে পারেন।

- এরা কারা?

- অবিবাহিত কুমারী বিয়ে করতে চাইলে আপনারই প্রীয় বন্ধুর ছয় বছরের কন্যা আয়েশা বিনতে আবু বকর আর বিধবা করতে চাইলে সওদাহ বিনতে জামাহ।

- তুমি তাদের কাছে আমার প্রস্তাব নিয়ে যাও।

মুহাম্মদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে খাওলা প্রথমেই আয়েশার মা উম্মে রোমানের কাছে গেলেন। নবির কাছে থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন উম্মে রোমান। আবু বকর বাড়ি আসার পর তিনি তার স্বামীকে ঘটনাটা শুনালেন। আবু বকর বললেন, উনি তো আমার ভাই, তা সম্ভব হয় কীভাবে? আয়াশার মা উম্মে রোমানের মতো পিতা আবুবকরও যে প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে নিচের হাদিসে-

Narrated 'Ursa:

The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry." (Sahih Bukhari 7.18)

এই হাদিস স্পষ্টই প্রমাণ করে ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মদের প্রস্তাব বহনকারী মহিলা (ঘটক) খাওলা ব্যর্থ হওয়ার পর। এখানে মুহাম্মদ নিজে এসে প্রস্তাব করছেন এবং আবু বকর ও মুহাম্মদ সামনা সামনিই কথা বলছেন। তবুও আবু বকর চেষ্টা করেছিলেন অজুহাত খুঁজছিলেন যেন এই বিয়েটা না হয়, এবং এটাই স্বাভাবিক কারণ একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তার ছয় বছরের শিশুকে পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধার সাথে কোনকালেই বিয়ে দিতে রাজি হবেনা। মা উম্মে রোমান আবু বকরকে অনুরোধ করলেন, মুতিম বিন আদির কাছে যাওয়ার জন্যে। মুতিম বিন আদি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ও সম্পর্কে মুহাম্মদের চাচাতো ভাই ছিলেন। আবুবকর দম্পত্তির আশা ছিল একদিন মুতিম বিন আদির ছেলে জুবায়েরের সাথে আয়েশার বিয়ে দিবেন। আবু বকর পুনরায় মুতিম বিন আদির কাছে পূর্বেকার সিদ্ধান্তের কথা শুনালেন। জুবায়েরের মা উত্তরে জানালেন যে, এখন আর এই বিয়ে সম্ভব না কারণ আমরা আমাদের সন্তানকে ধর্মত্যাগ করতে দিবোনা। জুবায়ের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হলোনা, আবু বকর নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন। এখানে মুতিম বিন আদির একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। মুহাম্মদ প্রথম যেদিন মানুষ জড়ো করে তার মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করেন মুতিম বিন আদি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটা ছিল এ রকম; ‘After Muhammad stated that he had undergone the Isra and Mi‘raj, Mut‘im said: All of your affair before today was bearable, until what you said today. I bear witness that you are a liar. We strike the flanks of the she-camels for one month to reach the Hallowed House (বায়তুল মোকাদ্দাস, জেরুজালেম),

then for another month to come back, and you claim that you went there in one night! By Allat, by al-'Uzzá! I do not believe you' (দ্রষ্টব্যঃ Muhammad `Alawi alMaliki al-Hasani, al-Anwar al-bahiyya min isra' wa mi`raj khayr al-bariyya. The Collated Hadith of Isra' and Mi'raj)

এর পর মুহাম্মদ যখন তার স্বপ্নের কথা জানালেন, আয়েশাকে মুহাম্মদের কাছে বিয়ে দেয়া ছাড়া আবুবকরের আর কোন উপায় রইলোনা। আয়েশা নিজে সেই স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন;

Narrated 'Aisha:

Allah's Apostle said (to me), "You have been shown to me twice in (my) dreams. A man was carrying you in a silken cloth and said to me, 'This is your wife.' I uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, 'If this dream is from Allah, He will cause it to come true." (Bukhari Shareef, Volume 7, Book 62, Number 15)

বোখারি শরিফের অন্য একটি হাদিসে আছে-

Narrated 'Aisha:

Allah's Apostle said to me, "You were shown to me twice (in my dream) before I married you. I saw an angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said to him, 'Uncover (her),' and behold, it was you. I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen.' Then you were shown to me, the angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said (to him), 'Uncover (her), and behold, it was you. I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen.' "(Bukhari: Book 9: Volume 87: Hadith 140)

"আল্লাহর নবি আমাকে বলেছিলেন, বিয়ের আগে আল্লাহতায়ালা স্বপ্নে দুবার তোমাকে দেখিয়েছিলেন। আমি দেখলাম বেহেস্তের সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে একজন ফেরেস্তা তোমাকে কোলে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত। আমি বললাম, কাপড় উঠাও। অমনি দেখি জিব্রাইলের কোলে জীবন্ত তুমি বসে আছো। আমি মনে মনে বললাম এই যদি হয় আল্লাহর ইচ্ছে, তাহলে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৭, নম্বর ১৪০)।

আবু বকর নিজেকে মুহাম্মদের ভাই ও আয়েশাকে ভাতিজির সম্পর্ক দেখায়েও বিয়ে আটকাতে পারেন নি, অথচ মুহাম্মদ তার এক ভাতিজির বিয়ের প্রস্তাব পরবর্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ঘটনাটি এরকম: হামজা (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ছিলেন পরস্পর বৈমাত্রীয় ভাই। মুহাম্মদের (দঃ) নবম স্ত্রী রামালা (রাঃ) (আবু সুফিয়ানের মেয়ে, অন্য নাম উম্মে হাবিবা) বলেছেন:

Narrated Um Habiba:

I said, "O Allah's Apostle! Do you like to have (my sister) the daughter of Abu Sufyan?" The Prophet said, "What shall I do (with her)?" I said, "Marry her." He said, "Do you like that?" I said, "(Yes), for even now I am not your only wife, so I like that my sister should share you with me." He said, "She is not lawful for me (to marry)." I said, "We have heard that you want to marry." He said, "The daughter of Um Salama?" I said, "Yes." He said, "Even if she were not my stepdaughter, she should be unlawful for me to marry, for Thuwaiba suckled me and her father (Abu Salama). So you should neither present your daughters, nor your sisters, to me." (Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 42)

আবু বকর (রাঃ) যিনি চাঁদের দিকে না তাকিয়েই বলতে পারেন মুহাম্মদ (দঃ) আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, মুহাম্মদকে (দঃ) জিজ্ঞাসা না করেই সাক্ষী দিতে পারেন মুহম্মদ (দঃ) স্বশরীরে সপ্ত-আকাশ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন, তিনি এবার নবির মুখে স্বপ্নের কথা শুনে আয়েশাকে বিয়ে দিতে রাজি না হয়ে পারলেন না। তবে শর্ত দিলেন ‘কন্যাদান’ হবে তিন বছর পর। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ বিধবা সওদা বিনতে জামাহকে বিয়ে করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর তাঁর দুই মেয়ে আয়েশা ও আসমাকে মক্কায় রেখে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে রাতের অন্ধকারে মদিনায় পালিয়ে যান। এর কিছুদিন পর আসমাও ছোট বোন আয়েশাকে নিয়ে মদিনায় চলে যান। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে নববধূ আয়েশাকে ঘরে তোলে নেন। মুহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৫২ বছর, আর নববধূ আয়েশা ৯ বছরের বালিকা। হাতে বিয়ের আঙটি নয়, খেলার পুতুল নিয়েই বাসর ঘরে ঢুকলেন দোলনার বালিকা আয়েশা। পাশে রাখা দুধের গ্লাস থেকে মুহাম্মদ (দঃ) এক চুমুক দুধ পান করে আয়েশাকে দিলেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে পুতুল খেলার সাথীগণ তাঁর সাথে খেলতে আসবে, সেই আশায় রাত প্রভাতের পানে চেয়ে ক্লান্ত আয়েশা এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) পরবর্তীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"আল্লাহর নবি আমাকে ৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন। আমরা (আসমা ও আয়েশা) মদিনায় যাওয়ার পর হারিস বিন খাজরাজের ঘরে আশ্রয় নেই। সেখানে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায়। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যখন আমার সঙ্গীদের নিয়ে দোলনায় খেলছিলাম, আমার মা এসে আমাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি বুঝতেই পারিনি কেন আমাকে ডেকে নেয়া হচ্ছে। আমার তখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মা আমাকে কিছুক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আমার মাথা ও মুখমণ্ডল জল দিয়ে মুছে দেয়ার পর যখন কিছুটা শান্তবোধ করলাম, মা আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখি মদিনার বেশ কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। তারা আমাকে দেখে সমস্বরে বলে উঠলেন, শুভেচ্ছা! আয়েশা তোমার ওপর আল্লাহর রহমত ও মঙ্গল হউক। মা আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আর তারা আমাকে বিয়ের সাজে সাজালেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখি আল্লাহর নবি এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন আর মা আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৮, নম্বর ২৩৪ এবং মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯) ।

দোলনার বালিকা আয়েশা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি আর বালিকা নন বরং পরিপূর্ণ বয়সী এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। বিয়ের পরেও সাথীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতেন। আয়েশা বলছেন: "আমি যখন আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম, মাঝেমাঝে আল্লাহর নবি তা দেখে ফেলতেন। নবিকে দেখে আমার বান্ধবীরা লুকিয়ে যেতো কিন্তু নবি তাদেরকে ডেকে এনে বলতেন, তোমরা আয়েশার সাথে খেলতে থাকো।" (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৩, নম্বর ১৫১)।

সাবালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্যে পুতুল অথবা এই ধরনের কোনো নিস্প্রাণ বস্তু নিয়ে খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু আয়েশার বেলা তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ আয়েশা তখন নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী তার 'ফাতেহ আল-বারি'তে লিখেন: The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for A'isha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. (দ্রষ্টব্যঃ Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, Vol 13, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Page 143) আয়েশা তাঁর ছোটকালের বর্ণনায় আরও বলেন:

“মসজিদের পাশে যখন কয়েকজন ইথোপিয়ানদের খেলা আমি উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ নবি এসে তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে দেন। তথাপি খেলা দেখার তৃপ্তি মেটার আগ পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুতরাং এ থেকে তোমরা বুঝে নিও, ছোট্ট নাবালেগ মেয়ে (Who has not reached the age of puberty) খেলাধুলার প্রতি যার এমন আগ্রহ, তাকে সেভাবেই দেখা উচিৎ।” (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৬৩)।

Narrated 'Aisha:

The Prophet was screening me with his Rida' (garment covering the upper part of the body) while I was looking at the Ethiopians who were playing in the courtyard of the mosque. (I continued watching) till I was satisfied. So you may deduce from this event how a little girl (who has not reached the age of puberty) who is eager to enjoy amusement should be treated in this respect. (Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 163)

আয়েশার মতো একজন বালিকাবধূ যার সাংসারিক অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা, ‘রান্নাবাটি’ খেলার বয়স পার হয়নি তার সাথে খেলার কী আনন্দ, তা হাদিস শরিফে বর্ণীত আছে: সাহাবি হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর (রাঃ) ভাষায়- “এক অভিযানে আমরা আল্লাহর রসুলের (দঃ) সঙ্গে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার পথে যখন মদিনার নিকটবর্তী হলাম, আমার অলস উটটাকে আর কোনো মতেই চালাতে পারিনা। একজন লোক এসে আমার উটের পিছনে একটি খোঁচা দিলেন, অমনি উটটি তড়িৎ বেগে ছুটে চললো। পিছনে তাকিয়ে দেখি, এতো আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (দঃ)। নবি আমায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, জাবির এতো তাড়া কিসের? আমি বললাম, আল্লাহর রসুল, ঘরে আমার নতুন বৌ রেখে এসেছি। রসুল (দঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি বিয়ে করেছো? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিবাহিতা? আমি বললাম, জ্বী না, কুমারী নয়। তিনি বললেন, ‘অল্প বয়সের কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে খেলতো।’ যখন আমরা উটে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করবো, রসুল (দঃ) বললেন, সন্ধ্যা-রাতে ঘরে ঢুকার পূর্বে একটু থামো, যাতে মহিলা, যার মাথার চুল অগোছালো সে তা চিরুনি দিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে, আর যে মহিলার স্বামী কিছুদিন দূরে ছিল সে মহিলা তার গোপনাঙ্গের লোম কামিয়ে নিতে পারে।” (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৭৪)।

Narrated Jabir bin 'Abdullah:
We were with the Prophet in Ghazwa, and when we returned and approached Medina, I wanted to hurry while riding a slow camel. A rider overtook me and pricked my camel with a spear which he had, whereupon my camel started running as fast as any other fast camel you may see. I looked back, and behold, the rider was Allah's Apostle. I said, "O Allah's Apostle! I am newly married " He asked, "Have you got married?" I replied, "Yes." He said, "A virgin or a matron?" I replied, "(Not a virgin) but a matron" He said, "Why didn't you marry a young girl so that you could play with her and she with you?" When we reached (near Medina) and were going to enter it, the Prophet said, "Wait till you enter your home early in the night so that the lady whose hair is unkempt may comb her hair and that the lady whose husband has been away may shave her pubic hair." (Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 174)
রূপ-লাবণ্যে অতুলনীয় আয়েশাকে পেয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যারপর নাই খুশি হলেন। আয়েশার প্রতি নবির অতিরিক্ত মনযোগের কারণ বৃদ্ধা সওদা অনুমান করতে পেরে একদিন নবিকে জানালেন, 'আল্লাহর রাসুল, আজ থেকে আমার সকল রাত আমি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম, আমার চেয়ে আপনার আয়েশাকে বেশি প্রয়োজন'। সওদার এমন মহানুভবতা বা উদারতার কারণ নিরুপণে মুহাম্মদের জীবনীকারকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অনেকে মনে করেন সওদা এক পর্যায়ে টের পেয়েছিলেন যে, কোন এক কারণে মুহাম্মদ তাকে তালাক দিয়ে দিবেন এই ভয়ে তিনি তা করেছিলেন।
সেদিন ৯ বছরের আয়েশা এই রাত ভাগাভাগির ব্যাপারটা কতটুকু বুঝেছিলেন বা কিছুই অনুমান করতে পেরেছিলেন কিনা আমরা জানতে পারবোনা তবে আমরা জানি তার সুদিন আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ পরবর্তি কয়েক বছরেই আয়েশার দুই সতীনের ঘর তেরো সতীনের মিলনমেলায় পরিণত হয়ে যায়। আর সেই সতীনেরা আয়েশার মতো ৯ বছরের শিশু বা ৫০ বছরের বৃদ্ধা ছিলেন না, তারা প্রায় সকলেই ১৬ থেকে ৩০ বছরের যুবতী ছিলেন। মুহাম্মদ তার পুত্রবধু জয়নাবকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে আনার পর থেকে রাত ভাগাভগির বিষয়টা প্রকট হয়ে

দাঁড়ায়। কয়েকজন স্ত্রী মিলে তারা নবির কাছে সমানভাবে রাত বণ্টনের দাবি করে বসলেন। নবি কোরানের আয়াত নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।
You can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomever you disire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better' that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-Konwing Most Forbearing. (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫১)।
ধীরে ধীরে আয়েশা (রাঃ) কৈশোরে উত্তীর্ণ হলেন। আয়েশার কুঞ্জবনের অপ্রস্ফুটিত মুকুল, অকালে দলিত-মথিত হয়ে যখন প্রস্ফুটিত হবে, মুহাম্মদ (দঃ) তখন ভিন্ন কাননে মধু আহরণের সন্ধানে। তিনি তাঁর শ্বাশুর আবু বকরের (রাঃ) কাছে মনের গোপন বাসনা ব্যক্ত করলেন। আবু বকর (রাঃ) সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) জামাতা হজরত উসমানকে (রাঃ) জানালেন। মুহাম্মদ (দঃ) এবার ওমরের (রাঃ) বিধবা কন্যা ২০ বছরের হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করবেন। ওমর (রাঃ) তা জানতেন না। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করছেন এভাবে: "ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আমার মেয়ে হাফসার (রাঃ) স্বামী খুনাইজ বিন্ হুদাফা আসশামীর মৃত্যুর পর যখন আমি হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে দেয়ার জন্যে উসমান বিন আফফানের (রাঃ) কাছে নিয়ে গেলাম, উসমান (রাঃ) বললেন, ভেবে দেখবো। কিছুদিন পর যখন তার সাথে আবার দেখা হলো তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপাতত হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমি হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করার জন্যে আবু বকরকে (রাঃ) অনুরোধ করলাম। আবু বকর (রাঃ) আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। উসমানের (রাঃ) চেয়ে আবুবকরের (রাঃ) প্রতি আমার ভীষণ রাগ হলো। এর কিছুদিন পর, আল্লাহর রসুল এসে হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। রসুলের সাথে হাফসার (রাঃ) বিয়ের পর একদিন আবু বকরের (রাঃ) সাথে আবার দেখা হয়। আবু বকর (রাঃ) বললেন ওমর (রাঃ), তুমি বোধ হয় তোমার মেয়ে হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে না করায় আমার উপর রাগ করেছো। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আবু বকর (রাঃ) বললেন, সমস্যা আসলে কিছুই ছিল না, শুধু আমি জানতাম যে রসুল (দঃ) হাফসাকে বিয়ে করতে চান আর আমি তো রসুলের (দঃ) গোপন কথা প্রকাশ

করতে পারি না, তবে রসুল (দঃ) যদি তাঁর মত পরিবর্তন করতেন, আমি নিশ্চয়ই হাফসাকে বিয়ে করতাম।" (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৫৫)।

ওমর (রাঃ) জানতেন আয়েশা (রাঃ) এখন আর ৯ বছরের অবোধ ছোট্ট বালিকা নয়। মুহাম্মদের (দঃ) মাত্রাতিরিক্ত সোহাগ, প্রেম আয়েশাকে বানিয়েছে মারাত্মক অহংকারী। রূপের গরবিনী আয়েশার ব্যাপারে হজরত ওমর (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন; হজরত ইবনে আব্বাস হতে হাদিসে বর্ণীত আছে, "হজরত ওমর মেয়ে হাফসার ঘরে ঢুকে বললেন, মা হাফসা, রসুলের মাত্রাতিরিক্ত সোহাগের কারণে রূপের অহঙ্কারিণী আয়েশার ব্যবহার দেখে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। ওমর (রাঃ) আরও বললেন, কথাটি আমি রসুলকেও শুনিয়েছি। তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিলেন।" (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১১৯)।
সওদা, আয়েশা, হাফসা, জয়নাব বিনতে খোজাইমা ও উম্মে সালমার মধ্যকার বয়সের তারতম্যের কারণে এই সতীনদের ঘরে হিংসার অনল ধুকে-ধুকে জ্বলছিল তবে দাবানলে পরিণত হয়নি যতক্ষণ না মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর পালিত-দত্তকপুত্র জায়েদ ইবনে হারিথের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে (রাঃ) বিয়ে করেন। আয়েশা ও হাফসা কোনো অবস্থাতেই পালক পুত্রের স্ত্রীর সাথে এ বিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। নবি কোরানের আয়াত নিয়ে আসলেন: "স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭)। বিয়ে আটকাতে না পেরে আয়েশা ও হাফসা স্বামীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হলেন; অভিযোগ করলেন, নবি জয়নাবের ঘরে খুব বেশি সময় কাটান। জয়নাবের কাছে কিছু সুস্বাদু মধু ছিল, যা তিনি নবিকে খাওয়াতেন তাঁর ঘরে এলে। একদিন আয়েশা হঠাৎ করেই নবিকে প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনি কার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন আপনার মুখ থেকে যে গন্ধ

বেরুচ্ছে?” নবি বুঝতে পারলেন, এ প্রশ্নের অর্থ কি? তিনি খুব মনোক্ষুণ্ন হলেন। পরের দিন জয়নাবের ঘরে উপস্থিত হলে জয়নাব (রাঃ) নবিকে মধু খাবার জন্যে দিলে তিনি তা খেতে রাজি হলেন না। পরবর্তীতে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে নবি দীর্ঘ দিনের পুরানো অভ্যাসানুযায়ী কোরানের বাণী নিয়ে আসলেন: “কোন মুসলমান নর-নারীর জন্যে উচিৎ নয়, যে বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার ওপর মন্তব্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের (দঃ) অবাধ্য হয় সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে।” (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৬)।[৫৩]

আল্লাহর কালাম দিয়ে সকল স্ত্রীর মুখ বন্ধ করা গেলো, কিন্তু সমাজে ঘটনাটি অন্যভাবে প্রচার হয়ে গেলো; এর জন্যে জয়নাব (রাঃ) কিছুটা দায়ী, কারণ তিনি মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বিয়ের আগে মানুষের কাছে বলে দিয়েছিলেন, তাঁর শশুর কিভাবে তাঁকে কাপড় বদলানোর সময় অর্ধোলোঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। মুহাম্মদ (দঃ) আগে তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কারো অবর্তমানে কারো গৃহে পদার্পণ না করে; অথচ ৬২৬ সালে তিনি নিজেই জায়েদের গৃহে গমন করেন এবং জায়েদের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীকে মনোহর মূর্তিতে দেখতে পান।[৫৪]

আয়েশা (রাঃ) কোথায় বৃদ্ধ স্বামীকে একটু সেবা-যত্ন করবেন উল্টো তাঁর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) মিলে আরেকটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন, পুরোপুরি নারী কেলেঙ্কারি ঘটনা। ঘটনাটি আয়েশার (রাঃ) প্রায় সমবয়সী ১৮ বছরের খ্রিস্টান ক্রীতদাসী ম্যারিয়া কিবতিয়াকে নিয়ে। ৬২৮ সালে কিশোর বয়সী, অত্যন্ত সুন্দরী কোঁকড়ানো চুলের ম্যারিয়াকে মিশরের সম্রাট মুকাওকিস মুহাম্মদকে (দঃ) উপহারস্বরূপ দান করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) কোনোদিনই ম্যারিয়াকে মুহাম্মদের (দঃ) ‘স্ত্রী’ হিসেবে স্বীকার করেন নি। ম্যারিয়াও কোনোদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ঘটনাটি ঘটেছিল নবির স্ত্রী হাফসার ঘরে। হাফসার ঘরে নবির রাত কাটাবার পালার দিন মুহাম্মদ (দঃ) হাফসাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন এই বলে যে তার পিতা ওমর নাকি তাকে দেখতে চেয়েছেন। হাফসা তার বাপের

---

[৫৩] The Early History of Islam, Page 219

[৫৪] Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, New Delhi, India, 2002, Page 123.এবং বেঞ্জামিন ওয়াকার (সাদুল্লাহ অনুদিত) ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, সময় প্রকাশনী| ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৬|

বাড়ি গিয়ে দেখেন তার পিতা বাড়িতে নেই এবং তিনি হাফসাকে দেখতেও চান নি। হাফসা বাড়ি ফিরে এসে মুহাম্মদকে (দঃ) ম্যারিয়ার সাথে যুগলবন্দী অবস্থায় তার বিছানায় দেখতে পান। বিব্রত মুহাম্মদ (দঃ) হাফসাকে অনুরোধ করেন এ ঘটনা আয়েশার (রাঃ) কানে না তুলতে। কিন্তু হাফসা ঘটনাটি চেপে রাখতে না পেরে আয়েশাকে বলে দিলেন। ব্যস, দুজনে মিলে রটিয়ে দিলেন মুহাম্মদ (দঃ) ম্যারিয়াকে বিয়ে না করেই তাঁর সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছেন।[৫৫]

যে আয়েশাকে (রাঃ) মুহাম্মদ (দঃ) আদরে-আহলাদে আগলে রাখতেন, কোরানের আয়াত দিয়ে সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন, অসতীর অপবাদ থেকে রক্ষা করলেন, সেই আয়েশা (রাঃ) বড় হয়ে তাঁর নামে এমন অপবাদ রটাবেন মুহাম্মদ (দঃ) তা ভাবতেই পারেন নি। যে রমণীগণকে মুহাম্মদ (দঃ) 'উম্মুল মোমেনিন' (মুসলমানদের মা) বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখালেন, তারা কখনো ভাত-কাপড় চেয়ে বিরক্ত করবেন, কখনো রাত ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করবেন, কখনো মধু কেলেঙ্কারি, কখনো নারী কেলেঙ্কারি রটাবেন, আবার কখনো একে-অন্যকে অসতীর অপবাদ দেবেন, এ আর কতো সহ্য করা যায়? রাগ করে মুহাম্মদ (দঃ) পুরো এক মাসের জন্যে সকল স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করলেন। ঐ ঘটনা সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন:

Narrated Ibn 'Abbas:

I had been eager to ask 'Umar bin Al-Khattab about the two ladies from among the wives of the Prophet regarding whom Allah said 'If you two turn in repentance to Allah, your hearts are indeed so inclined (to oppose what the Prophet likes). (66.4) He said, "I am astonished at your question, O Ibn Abbas. They were 'Aisha and Hafsa." Then 'Umar went on narrating the Hadith and said, We, the people of Quraish used to have the upper hand over our wives, but when we came to the Ansar, we found that their women had the upper hand over their men, so our women also started learning the ways of the Ansari women. I shouted at my wife and she retorted against me and I disliked that she should answer me back. She said to me, 'Why are you so surprised at my answering you back? By Allah,

---

[৫৫]. ibn Sad, Tabaqat v. 8 p. 223

the wives of the Prophet answer him back and some of them may leave him throughout the day till the night.' The (talk) scared me and I said to her, 'Who ever has done so will be ruined!' Then I proceeded after dressing myself, and entered upon Hafsa and said to her, 'Does anyone of you keep the Prophet angry till night?' She said, 'Yes.' I said, 'You are a ruined losing person! Don't you fear that Allah may get angry for the anger of Allah's Apostle and thus you will be ruined? So do not ask more from the Prophet and do not answer him back and do not give up talking to him. Ask me whatever you need and do not be tempted to imitate your neighbour (i.e., 'Aisha) in her manners for she is more charming than you and more beloved to the Prophet'. (সংক্ষেপিত)

কোরানের তিনটি সুরা নবির তিনজন স্ত্রীকে ঘিরে বিশেষ তিনটি ঘটনা নিয়ে রচিত। সুরা আহজাবে জয়নাব, সুরা নূরে আয়েশা ও সুরা তাহরিমে ম্যারিয়া। অবশ্য সুরা আহজাবে পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে এসেছেন নবির আরেক স্ত্রী হাফসাও। পুত্রবধু জয়নাবের সাথে নবির বিয়ে, সৈনিক সাফওয়ানের সাথে আয়েশার রাত কাটানো ও হাফসার ঘরে ম্যারিয়ার সাথে নবির মিলন, এই ছিল সুরা তিনটির মূল বিষয়। উপরোল্লেখিত সুরা তিনটির বেশ কয়েকটি বাক্য বা আয়াত মূলত হজরত ওমরের পরামর্শ ও কথা। মুহাম্মদ (দঃ) ওমরের (রাঃ) পরামর্শ ও কথাগুলোই আল্লাহর বাণী বা নির্দেশ বলে তাঁর স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) দেখেছেন নবি (দঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়াও আরও চারজন রমণীর (খাওলা, জয়নাব, উম্মে শারিক ও মায়মুনা) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। চঞ্চল দুষ্টমতি আয়েশার বয়স তখন পনেরো কি ষোল। দেহে যৌবনভরা নদীর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ। একদিন খাওলা বিনতে হাকিম নামের এক মহিলা নিজেকে মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থাপন করে যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, আয়েশা ততক্ষণাৎ বলে উঠলেন: "মহিলার কি লজ্বা হয়না যে নিজেই এসে পুরুষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে'? ঘটনাটি হাদিসে বর্ণীত হয়েছে এভাবে-

Narrated Hisham's father:

Khaula bint Hakim was one of those ladies who presented themselves to the Prophet for marriage. 'Aisha said, "Doesn't a lady feel ashamed for presenting herself to a man?" But when the Verse: "(O Muhammad) You may postpone (the turn of) any of them (your wives) that you please,' (সুরা আহজাব, আয়াত ৫১) (33.51) was revealed, " 'Aisha said, 'O Allah's Apostle! I do not see, but, that your Lord hurries in pleasing you.' "(Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 48)

বিবি আয়েশার (রাঃ) কথিত ‘বেশরম লজ্জাহীন’ মহিলারাই শুধু মুহাম্মদের (দঃ) সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন না, মুহাম্মদ নিজেও মাঝে মাঝে পরনারীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন। হজরত আবু উসায়েদ (রাঃ) বলছেন: We went out with the Prophet to a garden called Ash-Shaut till we reached two walls between which we sat down. The Prophet said, "Sit here," and he went in (the garden). The Jauniyya (a lady from Bani Jaun) had been brought and lodged in a house in a date-palm garden in the home of Umaima bint An-Nu'man bin Sharahil. When the Prophet entered upon her, he said to her, "Give me yourself (in marriage) as a gift." She said, "Can a princess give herself in marriage to an ordinary man? The Prophet raised his hand to pat her so that she might become tranquil. She said, "I seek refuge with Allah from you." He said, “You have sought refuge with one who gives refuge”. Then the Prophet came out to us and said, "O Abu Usaid! Give her two white linen dresses to wear and let her go back to her family. (দ্রষ্টব্য: Sahih al-Bukhari 5255, Book 68, Hadith 5,
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 63, Hadith 182
বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৩, নম্বর ১৮২)।
মুহাম্মদ (দঃ) একজন পরনারীর গায়ে হাত দিতে চাইলেন কেন? তবে নবি (দঃ) কিন্তু একেবারে অপছন্দের কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন না এবং বিয়েও করতেন না, সে যতই এতিম, অসহায়, নিরাশ্রয়, নিরুপায় হোক না কেন। হজরত সোহেল ইবনে সাদ আস-সাইদি (রাঃ) এমনি একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন: “একজন মহিলা (আত্মীয়-স্বজনহারা, ভিটে-মাটিহীন) নবির কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আমি আমাকে মোহর

মুহাম্মদ (দঃ) ও বিবি আয়েশার (রাঃ) স্নান শিক্ষা

নবি মুহাম্মদের স্ত্রী হজরত মায়মুনা (রাঃ) বলেছেন: ‘সঙ্গম-পরবর্তী স্নানকালে আল্লাহর রসুল প্রথমে নামাজের জন্যে ওজুর (ablution) মতো ওজু করতেন, তবে পা ধুতেন না। অতঃপর তাঁর পুরুষাঙ্গে স্খলিত বীর্যের দাগ ধুয়ে সাফ করতেন, তারপর সারা দেহে জল ঢালতেন এবং সবশেষে অন্যত্র সরে গিয়ে পা ধুতেন। এটাই ছিল নবির সঙ্গম-পরবর্তী স্নানের নিয়ম।’ (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৫, নম্বর ২৪৯)।

হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: ‘একজন লোক নবিকে জিজ্ঞেস করেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে এবং বীর্যপাতের আগেই তার পুরুষাঙ্গ সরিয়ে নেয়, তাহলে তার উপর কি গোসল ফরজ হয়। (বিবি আয়েশা তখন নবির পাশেই বসা ছিলেন) নবি উত্তর দিলেন আমি আর আয়েশা তা করি, অতঃপর আমরা গোসল করি।’ (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২১, বুক ৩, নম্বর ৬৮৫)।

হজরত আবু সালামাহ (রাঃ) বলেছেন: ‘অমি আর আয়েশার (বৈমাত্রীয়) ভাই একদিন আয়েশার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নবি গোসল করতেন কীভাবে-কোন নিয়মে? হজরত আয়েশা (গোসলের নিয়ম দেখাতে) এক বালতি জল নিয়ে আসলেন। যখন তিনি নিজের মাথায় জল ঢাললেন তখন তাঁর আর আমাদের মাঝখানে পর্দা ছিল।’ (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৫, নম্বর ২৫১)।

পর্দার আড়ালে থেকে নিজের শরীরে জল ঢেলে দুই পুরুষকে বিবি আয়েশার এই ‘স্নান শিক্ষা’ প্রদান এক অভিনব অত্যাশ্চার্য ঘটনাই বটে।

হজরত আবু মুসা (রাঃ) বলেছেন: ‘সঙ্গম-পরবর্তী গোসল নিয়ে একবার একদল মোহাজির (মক্কার শরণার্থী) ও আনসারদের (মদিনাবাসী) মধ্যে তুমুল তর্ক শুরু হয়। আমি বললাম, তোমাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে আসছি। এই বলে আমি বিবি আয়েশার কাছে চলে গেলাম। তাঁকে বললাম, মা, আমি তোমার কাছে এসেছি এমন কিছু জিজ্ঞেস করতে যা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, লজ্জার কিছু নেই, তোমার মাকে যা জিজ্ঞেস করতে পারো আমাকেও তা জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি বললাম, কোন্ ব্যক্তির উপর স্নান করা ফরজ (অবশ্যই করণীয়) হয়? বিবি আয়েশা জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি কোনো মহিলার গুপ্তাঙ্গের সম্মুখে বসেন এবং তার পুরুষাঙ্গের খৎনাংশ (Circumcised parts) মহিলার গুপ্তাঙ্গে লাগালেই গোসল ফরজ হয়ে যায়।’ (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২১, বুক ৩, নম্বর ৬৮৪)।

ছাড়াই আপনার হাতে সমর্পন করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। নবি মহিলাটিকে আপাদমস্তক ভালভাবে পরখ করলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। রসুলকে (দঃ) নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসুল (দঃ) ঐ মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না হয়, আমাকে দিয়ে দিন আমি তাকে বিয়ে করবো। রসুল (দঃ) বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে তাকে দেয়ার মতো? লোকটি বললো, কিছুই নেই। রসুল (দঃ) বললেন, তুমি কি কোরানের কিছু আয়াত মুখস্ত বলতে পারবে? সে বললো, হ্যাঁ, পারবো। কোরানের ঐ আয়াতগুলোকে মোহরানা ধরে রসুল (দঃ) লোকটির কাছে মহিলার বিয়ে দিয়ে দিলেন।” (বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ২৪)।

Narrated Sahl bin Sad As-Sa'idi:

A woman came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! I have come to give you myself in marriage (without Mahr)." Allah's Apostle looked at her. He looked at her carefully and fixed his glance on her and then lowered his head. When the lady saw that he did not say anything, she sat down. A man from his companions got up and said, "O Allah's Apostle! If you are not in need of her, then marry her to me." The Prophet said, "Have you got anything to offer?" The man said, "No, by Allah, O Allah's Apostle!" The Prophet said (to him), "Go to your family and see if you have something." The man went and returned, saying, "No, by Allah, I have not found anything." Allah's Apostle said, "(Go again) and look for something, even if it is an iron ring." He went again and returned, saying, "No, by Allah, O Allah's Apostle! I could not find even an iron ring, but this is my Izar (waist sheet)." He had no rida. He added, "I give half of it to her." Allah's Apostle said, "What will she do with your Izar? If you wear it, she will be naked, and if she wears it, you will be naked." So that man sat down for a long while and then got up (to depart). When Allah's Apostle saw him going, he ordered that he be called back. When he came, the Prophet said, "How much of the Quran do you know?" He said, "I know such Sura and such Sura," counting them. The Prophet said, "Do you know them by heart?" He replied, "Yes." The Prophet said,

"Go, I marry her to you for that much of the Quran which you have." (Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 24:)

নারী কি খোলা বাজারের পণ্য যে, একজনের পছন্দ না হলে আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া যায়? বিদ্রোহী মনের আয়েশা (রাঃ) যুক্তিসঙ্গত কারণেই এ সমস্ত বিষয় সহ্য করতে পারতেন না। এজন্য তাঁকে নানা সময় শারীরিক নির্যাতন সইতে হয়েছে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বর্ণনা করেছেন: "একদিন বিবি আয়েশা (রাঃ) ও মুহাম্মদের (দঃ) মধ্যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। হজরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বিচারকের ভূমিকা নিলেন। আয়েশা (রাঃ) মুহাম্মদকে (দঃ) উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কথা বলিতে পারেন, কিন্তু যাহা বলিবেন সত্য বলিবেন।' সাথে সাথে আবু বকর (রাঃ) আয়েশার গালে সজোরে এমন থাপ্পড় মারেন যে আয়েশার মুখ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়।" [৫৬]

বিবি আয়েশা শুধু পিতা কর্তৃক মুখেই আঘাতপ্রাপ্ত হন নি, স্বামী কর্তৃক বুকেও আঘাত পেয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২০২, বুক ৪, নম্বর ২১২৭)।

আয়েশা (রাঃ) তাঁর সতীনদের প্রায়ই কটাক্ষ করে বলতেন যে, তিনিই এই পরিবারে একমাত্র কুমারী মহিলা যাকে কোনো পরপুরুষ কোনোদিন স্পর্শ করেনি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, সতীত্বের অহংকারিণী আয়েশার (রাঃ) কপালে একদিন নিন্দুকেরা অসতীর কলঙ্ক লাগিয়ে দিল। ঘটনাটি আয়েশার (রাঃ) মুখ থেকেই শুনা যাক। বিবি আয়েশা (রাঃ) বলছেন: "তখন ষষ্ঠ হিজরির (৬২৭ খ্রিস্টাব্দের) শাবান মাসের এক কালো রাত্রি। বানু মুস্তালিক গোত্রকে আক্রমণ করা হবে। নবিজি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন। লটারিতে আমার নাম উঠলো। নবি সেনাপতির দায়িত্বে আর আমি তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নিশীথ রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার মতো সময় ওদেরকে দেয়া হয়নি। ঘুম থেকে জেগে ওঠে বানু মুস্তালিক গোত্র দেখতে পেলো তাদের ঘরবাড়ি, এলাকা সবকিছু মুসলমানগণ দখল করে নিয়েছেন। তাদেরকে বন্দী করে গনিমতের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদিনার অদূরে 'মুরাইস' নামক এক জায়গায় আমরা বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের (রাঃ) চাকরের সাথে মদিনার কিছু লোকের ঝগড়া হয়।

---

[৫৬]. ইহয়্যাউলমুদ্বীন, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৭, ইংরেজি অনুবাদ মৌলানা ফজলুল করিম, Chapter 'The secrets of marriage'

ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, মদিনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ বলতে শুরু করলেন, "মদিনাবাসী দেখো শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। আদর করে তাদেরকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায়-সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচমনাদেরকে তাড়াতে হবে।" আব্দুল্লাহ বিন উবেহ রীতিমতো মদিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। নবি কোনো রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার মালপত্র উটের মাচায় উঠানো হলো কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলো না যে, আমি উটের উপরে নেই। আমার সাথে একখানা চাদর ছিল। উটের উপর আমাকে না দেখে, দলের লোকজন নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আসবে, এই আশায় চাদর গায়ে দিয়ে আমি সেখানে শুইয়ে পড়ি। ভোরবেলা সৈনিক সাফওয়ান বিন আল-মুত্তাল যিনি সৈন্যদলের পেছনে ছিলেন, আমার জায়গায় এসে পৌঁছুলেন। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে চিনতে পারলেন, কারণ নবি আমাদের জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক করার আগে সাফওয়ান আমাকে বহুবার দেখেছেন। সাফওয়ান চিৎকার দিয়ে বললেন, 'হায় সর্বনাশ! নবির স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো'। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। আল্লাহর কসম, আমরা একে অন্যের সাথে কোনো কথা বলি নাই। তিনি তার উটটিকে আমার সামনে নত করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহণ করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের মূল দলের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হই। মূল দলের কেউ জানতে বা বুঝতে পারেনি আমি যাত্রার অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলাম না। মদিনায় পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে থাকি। আমি লক্ষ্য করলাম এই একমাসের মধ্যে নবি আমাকে দেখতেও আসেন না, আমার সাথে কথাও বলেন না। আমার সন্দেহ হলো বিষয়টা কি? অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি মায়ের কাছে চলে যাই। এক রাতে মিসতাহর (বদর যুদ্ধে নবির এক সৈনিক) মায়ের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে মিসতাহর মা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান; চিৎকার করে বললেন, 'মিসতাহ তোর ধ্বংস হউক!' আমি বললাম, 'তুমি এ কেমন মা, নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিচ্ছো।' তিনি বললেন, 'আয়েশা তুমি কি শুনো নাই, মিসতাহ অন্যান্যদের সাথে তোমার নামে কেমন

কেলেঙ্কারি রটাচ্ছে?’ মিসতাহর মায়ের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। দৌঁড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে সারারাত কাঁদলাম। ভোরে উঠে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেঙ্ককারি রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় আছেন আমার সতীন জয়নাবের বোন (মুহাম্মদের শালিকা) হামনাহ্ বিনতে জাহাশ, নবির বিশ্বস্ত কবি হাসান বিন থাবিত, বদর যুদ্ধের সৈনিক (আয়েশার চাচা) সাহাবি হজরত মিসতাহ বিন হাসাসা ও আব্দুল্লাহ বিন উবেহ।” (ঈষৎ সংক্ষেপিত)।[৫৭] (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৬২)

ঘটনাটি বর্ণনায় আবুল আলা মৌদুদি আরো লিখেন:

“অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, যখন সৈনিক সাফওয়ান আয়েশাকে (রাঃ) নিয়ে ভোর বেলা কাফেলার সামনে এসে পৌঁছুলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম এই মহিলা আর সতী হতে পারেন না, দেখো নবির স্ত্রীর অবস্থা, সারারাত সাফওয়ানের সাথে কাটিয়ে কেমন বেপর্দা হয়ে তার সাথে ফিরে এসেছেন।”

এ ঘটনায় নবি (দঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। একমাস অতিবাহিত হয় আয়েশার (রাঃ) সাথে দেখা নেই, কথা নেই। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ (দঃ) এ বিষয়ে হজরত আলি (রাঃ), হজরত আবু বকর (রাঃ), আয়েশার গৃহদাসী ও উসমা বিন জায়েদসহ একান্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। হজরত আলি (রাঃ) ব্যতীত প্রায় সকলেই বললেন যে, তাঁরা আয়েশাকে চরিত্রহীনা মনে করেন না, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনার দরকার নেই, এখানেই বিষয়টির সমাপ্তি হওয়া ভাল। শুধু আলি (রাঃ) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, ‘নবি আপনি এই অসতী নারীকে এখনই তালাক দিয়ে দিন।’ নবি (দঃ) এ ব্যাপারে আরো তথ্য-খবর নিয়ে এক মাস পরে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ‘সুরা নুর’ আবৃত্তি করলেন: ‘ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকে বিয়ে করে, আর ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করে, আর এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি

[৫৭] মৌলানা মউদুদি, তাফহিমুল কোরান, তাফসির, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব সুরা আল-নূর
http://www.englishtafsir.com/quran/24/index.html

বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান'। (সুরা ২৪, নুর, আয়াত ৩-৪)
এরপর নবি (দঃ) আর কখনো কোন অভিযানে আয়েশাকে একা সঙ্গে নেন নি। তবে গুজব ছড়ানোকারীদের মধ্যে কবি হাসান বিন থাবিতসহ কয়েকজনকে চাবুক মারা হয় কিন্তু আব্দুলাহ ইবনে উবেহ্-কে পদমর্যাদার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫৮]

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, আয়েশা নবিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জানাতে। বুদ্ধিমান মুহাম্মদ উত্তরে বলেছিলেন 'তুমি যদি অন্যায় না করে থাকো আল্লাহ তোমাকে ওহীর দ্বারা নির্দোষ প্রমাণ করবেন আর যদি অন্যায় করে থাকো তাহলে ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল'। আয়েশা ব্যভিচারিণী ছিলেন কি না, তা প্রমাণ করা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, তবে কিছু প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়: (১) অপবাদ রটনায় যারা জড়িত ছিলেন, একমাত্র আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ ছাড়া বাকি সকলই তো ছিলেন আয়েশা ও মুহাম্মদেরই আপনজন মুসলমান এবং সাহাবি। (২) আয়েশার জবানবন্দি হজরত আলি (রাঃ) না হয় বিশ্বাস করলেন না, স্বয়ং নবি কি আয়েশাকে বিশ্বাস করেছিলেন? (৩) জয়নাব ও ম্যারিয়া কিবতিয়ার সাথে বিয়ের পয়গাম নিয়ে আল্লাহর ওহি আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না, সেখানে নবির প্রিয় স্ত্রী আয়েশার ওপর এমন বিপদে ওহি আসতে ১ মাস লেগে যায় কেন? এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে একান্ত বিশ্বস্ত সাহাবিদের সাথে পরামর্শ কেন? (৪) আর চারজন লোক সাক্ষী রেখে কেউ কি কোনদিন ব্যভিচারী কাজ করে?

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে মুহাম্মদ (দঃ) মৃত্যুবরণ করেন। আয়েশা তখন আটারো বছরের যুবতী। বিধবা মুসলিম নারীদের জন্যে পুনঃবিবাহ বৈধ হলেও মৃত্যুর আগে নবি কোরানের সুরা আহজাবের ৫৩ নম্বর আয়াত দিয়ে তাঁর স্ত্রীগণের জন্যে পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। সাহাবি ইবনে সাদ (রাঃ) এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ একবার বলেছিলেন, মুহাম্মদ (দঃ) মারা গেলে তিনি আয়েশাকে বিয়ে করবেন; মুহাম্মদ (দঃ) এ কথা শুনার কিছুদিন

---

৫৮. Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Page 126 এবং বাংলা অনুবাদে ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩৪

পরে তাঁর পত্নীদের 'মোমেনগণের মাতা' হিসেবে ঘোষণা করে কোরানের আয়াত (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৬) নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ভাতিজী আয়শাকে নিজের স্ত্রী বানাতে পারেন, আবার তালহার শালী আয়েশাকে তালহার মা বানাতে পারেন, একজন নবির জন্য তা সহজ ব্যাপার! মাত্র ১৮ বছরের যুবতী আয়েশা আর কোনদিন বিয়ে করতে পারবেন না, কারো মা হতে পারবেন না। এ সুন্দর পৃথিবী তাঁর কাছে বড়ই কুৎসিত মনে হলো। এই অল্প বয়সে আয়েশা প্রত্যক্ষ করেছেন মিথ্যে ভালোবাসার প্রতারণা, এক ডজনেরও অধিক নবিপত্নীর অপমান-অপবাদ, নোংরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপর সমাজের লাঞ্ছনা, অন্যায় অবিচার। সমাজের প্রতি পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ধীরে ধীরে আয়েশাকে বিদ্রোহী করে তোলে। ১৪ বছর পর হজরত আলির (রাঃ) খেলাফত অস্বীকার করে আয়েশা সকল আবরণ-অবরোধ-বন্ধন ছিন্ন করে, মুহম্মদের (দঃ) সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাজ্য করে তলোয়ার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। মুহাম্মদ (দঃ) নারীকে কোরানের বাণী দিয়ে গৃহে অবরোধ করেছিলেন, আয়েশাই প্রথম নারী যিনি কোরান অবমাননা করেন: And stay quietly in your houses, and make not a dazzling display, like that of the former Times of Ignorance...(সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৩)।

মুহাম্মদ (দঃ) নারী নেতৃত্ব নিষেধ করেছিলেন, বিবি আয়েশাই সম্ভবত প্রথম নারী যিনি মুহাম্মদের (দঃ) নিষেধ অমান্য করেন। (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৭০৯)। A female leader would either be contravening the rules and regulation of Hijâb or neglecting the welfare of her subjects. Mohammed (pbuh) said: "A nation that has entrusted its affairs to a woman can never be successful." (Bukhari vl.5, pg.136, Bukhari vl. 4 Page 97, Nisai vl. 8 Page 227, Tirmidhi vl. 5 Page 457) তিরমিজি শরীফে আরো উল্লেখ আছে; Rasulullah (pbh) said: "When your rulers are the best among you, your wealthy are generous, and your matters are decided by mutual consultation, then the surface of the earth is better for you than the belly of the earth. However, when your rulers are the worst among you, your wealthy are miserly and your matters are in the hands of your women, then the belly of the earth is better for you than its surface." (Tirmidhi vl.4, pg.459)

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে কতিপয় বিদ্রোহী মুসলমান খলিফা হজরত উসমানকে (রাঃ) হত্যা করে। উসমান (রাঃ) হত্যায় হজরত আলির (রাঃ) ইন্ধন রয়েছে, এরকম একটি অভিযোগে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা (রাঃ) আলির (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইসলামের ইতিহাসে তা 'জঙ্গে জামাল' নামে অভিহিত। ইরাকের বসোরায় আলির (রাঃ) সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে আয়েশা (রাঃ) পরাজয় বরণ করেন। আলি (রাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদিনায় নিয়ে যান। রাষ্ট্রপ্রধান আলির (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় আয়েশাকে (রাঃ) আজীবন গৃহবন্দীর শাস্তি দেওয়া হয়। এরপর আয়েশা (রাঃ) আর কোনোদিন রাজনীতিতে ফিরে আসতে পারেন নি। ছয় বছর বয়সে বালিকাবধু ১৮ বছর বয়সে যুবতী বিধবা বিবি আয়েশা, ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

(2) P. De Lacy Johnstone, Muhammad and His Power, Kessinger Publishing, New york, 1901

(3) M. R. M. Abdur Raheem, Muhammad the Prophet, Pustaka Nasional Pte Ltd, 1988.

(4) Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1 & 2, Kitab Bhavan, India.

(5) Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Volume 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, (First Published 1933), Reprinted 2006.

(6) Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895.

(7) Muhammad Encylopaedia, Vol-II, Seerah Foundation, London. (8) S.A. Mawdudi, Tafhimul Quran, Tarjuman-ul-Quran Publisher, page 3

(8) Imam Mohibbuddin Tabari 'The Mothers Of The Believers' দারুল ইশাত, করাচী, পাকিস্তান।)

(9) Muhammad `Alawi alMaliki al-Hasani, al-Anwar al-bahiyya min isra' wa mi`raj khayr al-bariyya. The Collated Hadith of Isra' and Mi'raj)

চতুর্থ অধ্যায়

'ইসলামের জন্ম, বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র'

কোরায়েশ বংশের দুই শাখায় নবি মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত ওসমানের (রাঃ) জন্ম। তাঁদের দুজনরেই পূর্বপুরুষ আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্র ছিলেন: আবদে শামস ও আবদে হাশিম। আবদে শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া নেতৃত্বের দাবি করায় চাচা আবদে হাশিমের সাথে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদে কোরায়েশ বংশ দুই দলে বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়; হাশিমি গোত্র ও উমাইয়া গোত্র। বিবাদের মূল কারণ সম্পদ। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভাগাভাগি করা হয় এইভাবে; কাবা গৃহের স্বত্তাধিকার ও তত্ত্বাবধান এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) মৌসুমে আয়কৃত অর্থের মালিকানা থাকবে হাশিমি গোত্রের হাতে। আর দেশ প্রতিরক্ষা-প্রশাসন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা উমাইয়া দলের হাতে। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশ বুঝতে পারলো এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। নবি মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম পূর্ববর্তী আরবে যুদ্ধবিগ্রহ বা ধর্মীয় জেহাদ তেমন ছিল না বললেই চলে। নগর শাসনে উমাইয়াদের অর্থোপার্জন, কাবা গৃহের আয়ের তুলনায় ছিল অতি নগন্য। ধনে-মানে উমাইয়া গোত্র, হাশিমিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গেল। এবার অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বুদ্ধিমান উমাইয়াগণ ঝাপিয়ে পড়লো ব্যবসা-বাণিজ্যে। কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থোপার্জনে প্রচুর উন্নতি করে, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উমাইয়া ও হাশিমি দুই দলের মধ্যকার বৈষম্য, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ দিনদিন বাড়তে থাকে। আর তা এক পর্যায়ে হাশিমি দলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, একাদশ সন্তানের জনক আব্দুল মোত্তালিবের সময়ে এসে চরমাকার ধারণ করে। আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবুতালিবের ওরসে যথাক্রমে মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলির (রাঃ) জন্ম।

উমাইয়ার দুই পুত্র ছিলেন। হারিব ও আবুল আস। হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান আর আসের ঘরে হাকাম ও আফফান। ৫৭০ খৃস্টাব্দের যে বছর ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেন, সে বছর হাশিমি গোত্রের আব্দুল্লাহর গৃহে মুহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার ছয় অথবা সাত বৎসর পর উমাইয়া বংশের আফ্ফান পত্নী উর্দির গর্ভে হজরত উসমানের (রাঃ) জন্ম হয়। শিশু বয়সে যেমন মুহাম্মদ (দঃ) পিতা আব্দুল্লাহকে হারিয়ে চাচা আবুতালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হোন, হজরত উসমানও (রাঃ) কিশোর বয়সে পিতা আফফানকে হারিয়ে চাচা হাকামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উমাইয়া ও হাশিমিদের আত্মকলহ, গোত্রীয় সংঘাত, বহুঈশ্বরবাদ আর ধর্মীয়-উপাসনালয়ের মালিকানা জবর-দখল নিয়ে আরব যখন অবনতির চরম পর্যায়ে তখনই বিপরীতমুখী মুক্তবুদ্ধি এবং উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একদল মুক্তমনার আবির্ভাব ঘটে। যাদের তৎকালীন সময়ে 'হানিফি' নামে আখ্যায়িত করা হতো। মুহাম্মদ (দঃ) তখন যুবক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ও জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন সেই 'হানিফি' দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহস এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথ প্রমুখ ছিলেন 'হানিফি' দলের অন্যতম সদস্য। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে ওয়ারাকা বিন নোফেল মুহম্মদ (দঃ) এর প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজার (রাঃ) চাচাতো ভাই ও মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম-প্রচারের' ধর্মগুরু। জানা যায়, তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। জায়িদ বিন ওমর আরবের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীতে তিনি এই পৌত্তলিক ধর্মমত ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী 'আব্রাহামিয় মতবাদ' গ্রহণ করেন। হানিফি দল এক সময় মক্কার প্রভাবশালী 'পৌত্তলিক ধর্মে'র ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা ঘোষণা করে বসে। ফলে কোরায়েশদের রোষে পড়ে তাদের অনেককেই দেশান্তরী হতে হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহস প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টানরাজ্য আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন; তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে নবি মুহাম্‌মদ (দঃ) পরবর্তীতে বিয়ে করেন। উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথও কোরায়েশদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাইজেন্টাইন রাজ্যে গমন করেন; তিনিও সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন।

ওয়ারাকা বিন-নোফেল ছিলেন ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক তাওরাত, জবুর ও ইনজিল কেতাবে বিশেষজ্ঞ আর জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরআনের কাব্যিক রূপ,

ছন্দ ও শব্দচয়ন জায়িদ বিন-ওমরের কাছ থেকে অনেকাংশেই ধারকৃত। মুহাম্মদ (দঃ) হয়তো কিছুটা গরিব পরিবারে থেকে লালন-পালন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি 'নিরক্ষর' ছিলেন, এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ চাচা আবুতালিবের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই শ্যাম (বর্তমান সিরিয়া) সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সাথী হতেন, এবং ব্যবসার হিসাব-নিকাশের পূর্ণ দক্ষতার কারণেই বিত্তশালী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খাদিজা মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণা দেন। মক্কা নগরীতে আগুন জ্বলে উঠলো। হাশিমি বংশোদ্ভূত মুহাম্মদের (দঃ) এই নতুন ধর্ম ঘোষণায় অপমানবোধ করলো উমাইয়া দল, আর মুহাম্মদের (দঃ) স্বীয় গোত্রের লোকজন পৌত্তলিকতার অবসানের দুশ্চিন্তায়, দেব-দেবীর কল্যাণে কাবা গৃহ থেকে বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় হলো উৎকণ্ঠিত। এদিকে হজরত উসমান (রাঃ) চাচা হাকামের সহযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর উন্নতি করার ফলে দেশ-বিদেশে সুপরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার সূত্র ধরেই একদিন মক্কার ব্যবসায়ী আবু-বকরের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগপ্রবণ, কিছুটা সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলেও মনে-প্রাণে সুখ ছিল না। পিতা আফফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান (রাঃ) তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন। উসমান (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালোবাসতেন এবং মনে-মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবুবকর (রাঃ)।

মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দুবার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদিজাকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন, বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম 'সূতিকা ঘরে'-ই মারা যাবে; যেমনটা হয়েছে হানিফিদের অবস্থা। তাই আপন কন্যাদ্বয়কে আতিবা ও উতবা ইবনে আবুলাহাব নামের দুই অমুসলিম সহোদর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে-কলসুম বিবাহকালে

অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। নবি কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক অবশ্যই ছিল না; কারণ আবু লাহাব বা তার দুই পুত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, এমন কি এই ধর্মকে তারা মেনে নিতে পারেননি, তাদের আশঙ্কা ছিল এটি তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই আতিবা ও উতবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্মের সংবাদ শুনে নবিজির প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণাই শুধু প্রকাশ করলো না উপরন্ত তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিল না, শুধু অভিশাপ দেওয়া ছাড়া (কোরআন শরিফের 'সুরা লাহাব দ্রষ্টব্য)। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবুবকর (রাঃ) জানতেন এবং নবি কন্যাদ্বয়ের তালাক হয়ে যাওয়ার সুবাদে 'উসমানের বাসনার' সংবাদটা তিনি (আবু বকর) মুহাম্মদের (দঃ) কানে পৌঁছালেন। মুহাম্মদও এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বাহুবল অর্জনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এবারে অর্থবলের সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না। মুহাম্মদ (দঃ) উসমানকে নবপ্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্ত মেনে নিলে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন। উসমান (রাঃ) ও খুশি মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রোকেয়ার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত পরিবারে, 'সোনার চামচ' মুখে নিয়ে যে উসমানের (রাঃ) জন্ম, সেই উসমান (রাঃ) এমন কাণ্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে সম্পন্ন করার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নববধূকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রাসাদে উসমানের (রাঃ) আর যাওয়া হলো না। কিছুদিন পরেই তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত নব্য মুসলিম দলের সাথে নববধূকে নিয়ে উসমান পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায় উসমান (রাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না।

আবিসিনিয়ায় সুদীর্ঘ আট বছর সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এককালের আরবের স্বনামধন্যা মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, মা জননী খাদিজা অতিশয় অভাব অনটনের মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্যবিহীন অবস্থায় মারা গেছেন। মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভাঙেনি, তাঁর দেহও ভেঙে যায়; তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ কর্তৃক তাঁর

প্রাণনাশের আশঙ্কায় রাতের অন্ধকারে আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তীতে হিজরি সন গণনা শুরু করা হয়। তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর তাঁর প্রচারিত ধর্মের চলছিল তেরো বছর। মদিনায় এসেই মুহাম্মদ তাঁর এতোদিনকার বৈরাগী লেবাসের অন্তরালে লুকায়িত রাজনৈতিক ইসলাম প্রকাশের প্রস্তুতি নেন। এক হাতে তসবিহ আর এক হাতে তলোয়ার!

উসমান (রাঃ) হিজরি দুই সনে আবিসিনিয়া থেকে স্বস্ত্রীক মদিনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হতে থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বছরের তৈরি তিনশ তেরোজন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তে যুদ্ধরত। মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখী একদল কোরায়েশ বণিকের পথ রুখে দাঁড়ান। যুদ্ধের জন্য মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ আক্রমণে বণিকদল হতভম্ব হয়ে যায়। বাহক মারফত মক্কার কোরায়েশগণ জানতে পারলো যুদ্ধ ব্যতীত বণিকদলকে মুহাম্মদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বদর প্রান্তে সংঘটিত হলো ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ। মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং মুহাম্মদ সেনাপতির দায়িত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। আর এই রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার অপূর্ব স্বাদ। উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তরজন মানুষকে খুন ও ততোধিক মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনায় গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা মুহাম্মদের (দঃ) আর হলো না। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতিসত্তর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। আর পত্নী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সুপরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায়

রাতারাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্ত মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবিজির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হলো। নবি মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে উসমান (রাঃ) 'যিন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী উপাধি লাভ করলেন।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র এক বছর পরেই, হিজরি তৃতীয় সনে, মদিনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এবারে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলো না, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃতস্বাদও গ্রহণ করলো। লাগাতার তিনটি যুদ্ধে (বদর, ওহুদ, আহযাব) বিজয়ী মুসলমানগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন এবং শত্রুপক্ষের অনেক শিশু-কিশোর, নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন: যুদ্ধ একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা। উসমান (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুদ্ধ 'বদর যুদ্ধ' বাদে ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে সেনাপতি মুহাম্মদের (দঃ) পাশে-পাশে ছিলেন। পরাজিত কোরায়শগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরববিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরিতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুস্তালিক গোত্রের ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইহুদিগণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নিজ শহরের বাইরে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ 'আত্মরক্ষামূলক' হয় না। মুহাম্মদ কর্তৃক বেশিরভাগ যুদ্ধই ছিল 'অফেন্সিভ'। বনি-মুস্তালিক গোত্র বা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে বাড়ি ফেরার পথে কোরায়েশ বণিকদল মদিনা আক্রমণ করে নাই। মুহম্মদ (দঃ) সৈন্যবল নিয়ে যে রাতের আঁধারে ধন-সম্পদ লুন্ঠনের উদ্দেশ্যে উটের কাফেলায় 'অফেন্সিভ' আক্রমণ চালাতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক হাদিসে। এমনি একটি হাদিস পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে দেয়া হল-

Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before meeting them in fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam. The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the

water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops." (সহিহ মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ৪২৯২)

এবারে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দশত সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে ছয় মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। অনেক দেরীতে হলেও মক্কাবাসী দেখতে পেলো 'সন্ন্যাসী-বৈরাগী' লেবাসের ভেতরে মুহাম্মদের ভয়ানক রাজনৈতিক চেহারা। এক সাথে চৌদ্দশত সৈনিক নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিলেন। মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে উসমান (রাঃ) কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেন নি, এসেছেন কাবা ঘর দর্শন করতে! কোরায়েশদের মন থেকে বদরের রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি। উসমান (রাঃ) কে বন্দী করা হলো। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। নবিজির হাতে হাত রেখে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না; ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ 'বাইয়্যাতে রেজওয়ান' নামে অভিহিত। হজ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুইপক্ষ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরুদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, তখন আবু-বকর তনয়া, নবির প্রিয় পত্নী আয়েশার বয়স আটারো।

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন মুহাম্মদের শশুর হজরত আবুবকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে মক্কা থেকে পালিয়ে আসা কোরায়েশ নেতাগণ মদিনার আনসারিদের কথা ভুলে গেলেন। মদিনাবাসীর কোন দাবি ও প্রতিবাদ তারা কানেই তুললেন না। মদিনার মুসলমান নেতা হজরত সাদ (রাঃ) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদিনার আনসারিদের ভেতর থেকে। মদিনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদিনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজি হলেন। তাদের এ দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদিনার ঘরে বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলি ও মুহাম্মদের কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) আবুবকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। মুহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানায়, মদিনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবি করায় এ নিয়ে আবুবকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে আলি (রাঃ) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেয়ায় ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আবুবকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত 'জিজিয়া' কর দিতে অস্বীকার করলো। মুহাম্মদ কর্তৃক সৃষ্ট দশ বছরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক নব্য মুসলমান তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে গেলো। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রাণ রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। অম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। আবুবকর (রাঃ) জনগণের ওপর স্বৈরাচারী স্টিমরোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োগ করলেন দুধর্ষ সাহাবি খালিদ বিন অলিদকে (রাঃ)। উল্লেখ্য, 'মুতা' যুদ্ধে যায়েদ নামক, মুহাম্মদের (দঃ) এক ক্রীতদাস নিহত হয়েছিলেন; এর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর (মুহাম্মদের) মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবুবকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমণ করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ, যিনি একসময় মুহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। আবুবকরের (রাঃ) নির্দেশে খালিদ

প্রথম খলিফা নির্বাচন কি কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটেছিলো?

মুসলিমদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নবির (দঃ) মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আবুবকরকে (রাঃ) খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করে তারপর তারা নবির শেষকৃত্য করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসেও তাই পড়ানো হয়, যদিও এর স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন সুত্র নেই। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য মুহাম্মদের (দঃ) প্রথমদিককার জীবনীকারদের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গন্য করা হয়। কারণ তাদের বর্ণনা অতিরঞ্জন এবং বিকৃতিমুক্ত। মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম জীবনীকার হচ্ছেন ইবনে ইসহাক। তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ছিলো ‘সিরাত-আল-নবি’ বা সংক্ষেপে ‘সিরাত’। এছাড়া,ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় সবচেয়ে প্রমান্য দলিল হিসেবে গন্য করা হয় ইবনে সাদের তাবাকাত, সহিহ বুখারি, এবং তারিখ আল্ তাবারি’র তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককে। সহি বুখারি ৮ম খন্ড,হাদিস নং ৮১৭; সিরাত (পৃঃ ৬৮৪);এবং তারিখ আল তাবারির তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককের তথ্য থেকে পাওয়া বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে,খলিফা নির্বাচন মোটেই 'গণতান্ত্রিক' কোন প্রক্রিয়ায় হয়নি, বরং তুমুল হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ করেই হয়েছিল। জনগণ আগে থেকে মোটেও অবগত ছিলেন না, এবং দশ জন আশারা মোবাশ্শারার মধ্যে ঘটনাক্রমে মাত্র চার জন উপস্থিত ছিলেন, বাকি ৬ জন এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

নবির (দঃ) মৃত্যুর পরেই যখন সবাই নবির মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন ওমরের (রাঃ) কাছে খবর আসলো যে আনসাররা বনু সাদ গোত্রের চত্বরে একজোট হয়ে নেতা বানাবার পরামর্শ করছে। ওমর (রাঃ) উদ্বিগ্ন হয়ে আবুবকরকে (রাঃ) নিয়ে ছুটলেন বনু সাদ -এর চত্বরে। পথে আরো দু’জন আশারা মোবাশশারা’র সাথে দেখা হলে তাঁরাও সঙ্গে চললেন। তারপর বাকি ৬ জন আশারা মোবাশশারা ও বেশিরভাগ সাহাবির অনুপস্থিতিতে এবং জনগণকে আগে থেকে কিছুই না জানিয়ে মাত্র কিছু লোকের উপস্থিতিতে তুমুল গালাগালি ও ঝগড়ার মধ্যে হজরত ওমর (রাঃ) হঠাৎ আবুবকরকে (রাঃ) খলিফা ঘোষণা করে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত জনগনের মধ্যে নিদারুন ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল যা মারামারি ধাক্কাধাক্কিতেও রূপ নেয়। এমনকি ওমরের (রাঃ) দেয়া ভাষণেও এই আকস্মিক বা 'হঠাৎ করে' ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। সহিহ বুখারির একটা দীর্ঘ হাদিসে *(Volume 8, Book 82, Number 817)* এর উল্লেখ পাওয়া যায় ।

বিন অলিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে আরবের একের পর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালাতে থাকেন। এক সাথে আবুবকরের (রাঃ) জঙ্গি কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে; বাহরাইনে গেলেন আলা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন অলিদ ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বছরের স্বৈরশাসনে আবুবকর গোটা আরবকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে একেবারে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন অলিদের চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও মোতানার মতো সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন সামরিক ভার। ইরাক ও ইরানের কত শত জীব, কত মানুষ আর পশু যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসাব হয়তো কেউ কোনোদিন আর জানতে পারবে না। মৃত্যুর পূর্বে ওমর (রাঃ) তাঁর নিজের ও আবুবকরের স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর (ওমরের) পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন মুহাম্মদের দুই কন্যার স্বামী সত্তর বছর বয়স্ক উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলি (রাঃ) চিৎকার করে বললেন 'না-আমি মানি না, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা!'

আরবি নববর্ষ, হিজরি ২৪ সনের মহরমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উসমানের খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো মক্কার উমাইয়াগণ, বিব্রতবোধ করলো হাশিমিগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরাভিসন্ধি সম্বন্ধে অভাগা মদিনাবাসীদের বুঝতে বাকি রইলো না। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদিনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মদিনাবাসীর কোনো স্থান নেই। এতদিন পরেও মুহাম্মদের (দঃ) কথিত 'সাম্যবাদী' ইসলাম মক্কা-মদিনার মুসলমান ও উমাইয়া-হাশিমিদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলো না। উসমানের খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ

জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার (রাঃ) যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। এই প্রবেন্ধর শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কাণ্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবিদের মতে যা ছিল মুহাম্মদের (দঃ) রচিত সংবিধান 'আল-কোরআনে'-র পরিপন্থী। খলিফা উসমানকে একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ একদিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম: হজরত ওমরের কাছে, ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি, তার ওপর আরোপিত করের পরিমাণ কমানোর আবেদন জানায়। পারসিয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিলেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর ফিরোজের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ কাঠমিস্ত্রি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদিনায় চলে আসে। একদিন ওমরকে নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার তিনদিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পরদিন হজরত ওমরের ছেলে ওবায়দুল্লাহ, প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান ও হজরত সাদের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও জুফাইনাকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়িতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। খলিফা ওমরপুত্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামি আইনের সুবিচার দেখবে। খলিফা উসমানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরআন-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলি সহ বেশ কয়েকজন শরিয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবি। (অবশ্য কোরআন-হাদিস তখনো পুস্তাকাকারে ছিলনা; মুহাম্মদের মুখের কথা ও কাজ যে যেভাবে শুনেছেন, বুঝেছেন, দেখেছেন তাই শরিয়ার আইন বলে মানতেন।) গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ শাস্ত্রকারগণ একমত যে, ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে; কারণ, নিহত তিন ব্যক্তির একজন পারস্য থেকে আগত হরমুজান ছিলেন মুসলমান। শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবির ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে খলিফা

ওমরের খুন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। হজরত আলি (রাঃ) অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও তাঁর মতো হজরত ওমরের তৈরি কয়েকজন নামকরা ঘাতক সন্ত্রাসী বিচার চলাকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে হজরত আলির দেয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। বিচারক খলিফা উসমান (রাঃ) কোরআন-হাদিস অনুসরণ করলেন না। শরিয়া আইন ও বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খুনী ওবায়দুল্লাহকে দণ্ডমুক্ত করে দিলেন। ওমরের (রাঃ) আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি হলেও দুঃখিত হলো মদিনাবাসী। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার বিখ্যাত মুসলিম কবি যিয়াদ ইবনে লবিদ খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন, লোকে প্রকাশ্যে মদিনার রাস্তায়-রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন।

কিছুদিন পরেই মদিনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শূন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলে না। সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হলো মদিনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবী। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। গনিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতো না। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কাবা ঘরের সেবাযত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশরসহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি পদে অধিষ্ঠিত। মেষ পালক-পুরোহিত থেকে রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় স্বপ্নের মতোই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। মদিনা থেকে খলিফা উসমানের কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিঠি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্নরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানোতো দূরের কথা, তারা ইসলামি শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) উসমানের (রাঃ) চিঠির উত্তরে লিখলেন: 'উষ্ট্রী এর বেশি দুধ দিতে অপারগ'। তিনিই সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যিনি হজরত ওমরের খুনি পুত্র ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দেয়ার জন্য খলিফা উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের ট্যাক্স দেয়ার অপারগতায় খলিফা উসমান ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি আমর ইবনুল আসকে

পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পৌর্ট সাঈদের সামরিক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহকে সমগ্র মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ সম্পর্কে পূর্বের একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজনবোধ করছি: মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এককালের শুভাকাংখীদের তালিকা তৈরি করলেন। আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ তাদের একজন, তাদেরকে হত্যা করা হবে; কারণ মুহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর 'নবিত্ব' ও 'ধর্ম' কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলবে। আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ মুহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরান লিখে রাখতেন। মুহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘটনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন, এবং আবদুল্লাহ্ বিন সাদ সেটা ধরে ফেলতেন। আবদুল্লাহ্ বিন সাদের কপাল ভাল যে, হজরত উসমান বিষয়টি আগে টের পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সাদ ছিলেন খলিফা উসমানের পালিত ভাই (Foster Brother)। উসমান মোহাম্মদের (দঃ) কাছে আবদুল্লাহ বিন সাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মুহাম্মদের (দঃ) আদেশ পেয়ে আবদুল্লাহ্ বিন সাদকে হত্যার জন্যে ঘাতক শাণিত তরবারি হস্তে তার শিরোপরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর দুই মেয়ের স্বামী, জামাতা উসমানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না। আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। মুহাম্মদের (দঃ) এক সময়ের প্রীয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কোরআন লেখক আবদুল্লাহ বিন সাদের (রাঃ) অপরাধের প্রমান আজও কোরানেই আছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আল্ বাদাওয়ী তাঁর তাফসির-গ্রন্থ 'আনোয়ার আল-তানজিল ওয়া আছরার আল তাউইল ' "Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil"[৫৯] এ বর্ণনা করেন- একদিন মুহাম্মদ (দঃ) সুরা আলমুমিনুন এর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত বাক্যগুলো লিখার জন্যে আবদুল্লাহ বিন সাদকে বললেন। বাক্যগুলো ছিল-

'আর আমরা নিশ্চয়ই মানুষকে সৃস্টি করেছি কাদার নির্যাস থেকে'। (আয়াত ১২) 'তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে'। (আয়াত ১৩) 'তারপর আমরা শুক্রকীটকে তৈরি করেছি একটি রক্তপিন্ডে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে মাংশপিন্ড তৈরি করেছি,

---

[৫৯]. The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation edited by H. O. Fleischer. 2 vols., Leipzig, 1846-1848; indices ed. W. Fell, Leipzig, 1878)

তারপর 'মাংশপিন্ড থেকে হাড় তৈরি করে, অতঃপর হাড়গুলোকে মাংশ দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে নতুন রুপে দাঁড় করিয়েছি'। (আয়াত ১৪)
মুহাম্মদ (দঃ) ১৪ নং বাক্য এতটুকু বলার পর আবদুল্লাহ বিন সাদ তার সাহিত্যিক ভাষায় বলে উঠলেন - 'নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়'। মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, 'এই বাক্যটাও লাগিয়ে দাও'। আবদুল্লাহ বিন সাদ হতবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন বিষয়টা কী, আমার মুখের কথা আল্লাহর বাণী হয় কীভাবে! আরেকবার এক আয়াতের শেষে মুহাম্মদ যখন বললেন- 'এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ (আরবিতে 'আজিজ ও 'হাকিম) আব্দুল্লাহ বিন সাদ পরামর্শ দিলেন 'এবং আল্লাহ সব জানেন ও বিজ্ঞ ('আলিম ও 'হাকিম) লেখার জন্যে। মুহাম্মদ কোন আপত্তি করলেন না, তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কোরানের ২৩ নং সুরা আলমুমিনুন এর ১৪ নং আয়াতের শেষ অংশ 'ফাতাবা-রাকাল্লাহু আহসানুল খা-লিকিন'।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

বাক্যটি আবদুল্লাহ বিন সাদ এর মুখনিঃসৃত কথা। এবার আবদুল্লাহ বিন সাদ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, কোরান মুহাম্মদ লিখছেন, এসব কোন ঐশী-বাণী নয়। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ থেকে দূরে সরে গেলেন। (আরো পড়ুন-"Asbaab Al-Nuzool" by Al-Wahidi Al-Naysaboori – Page 126 – Beirute's Cultural Libary Edition "Tub'at Al-Maktabah Al-thakafiyyah Beirut)

মুহাম্মদের নবিত্বে সন্দেহ করার পর থেকে মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ ইসলাম গ্রহন করেন নি। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া তার প্রাণে বাঁচার আর কোন উপায় ছিলনা। একই অবস্থা হয়েছিল মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের বেলায়ও। আবি সারাহ'-র ঘটনা হাদিস শরিফে বর্ণীত হয়েছে এভাবে-

Narrated Sa'd: On the day when Mecca was conquered, the Apostle of Allah gave protection to the People except four men and two women and he named them. Ibn AbuSarh was one of them. He then narrated the tradition. He said: Ibn AbuSarh hid himself with Uthman ibn Affan. When the Apostle of Allah called the people to take the oath of allegiance, he brought him and made him stand before the

Apostle of Allah. He (Uthman ibn Affan) said: Apostle of Allah, receive the oath of allegiance from him. He raised his head and looked at him thrice, denying him every time. After the third time he received his oath. He (Apostle of Allah) then turned to his Companions and said: Is not there any intelligent man among you who would stand to this man (Ibn AbuSarh) when he saw me desisting from receiving the oath of allegiance, and kill him? They replied: We do not know, Apostle of Allah, what lies in your heart; did you not give us a hint with your eye? He said: It is not proper for a Prophet to have a treacherous eye. (Jihad (Kitab Al-Jihad)' of Sunan Abu-Dawud, 2677)

এবার এখানে সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরিচিতি জেনে নিলে পরবর্তী ঘটনা ঝুঝতে সুবিধা হবে। হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বললো, আবুবকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবে না। ওমর (রাঃ) বললেন, খালিদ বিন অলিদের চেয়েও বিচক্ষণ শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আস শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। হজরত ওমর খুশি হয়ে তাকে মিশর দখল করার দায়িত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আস প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি খালিদ বিন অলিদের চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আস খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিঠি লিখলেন:

'আমিরুল মুমেনিন, আজ আমি এমন একটি জাতিকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনোদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে, যেখানে এসে গ্রিক-রাজপুত্রগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিতো। এই নগরীর এক প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্‌ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্তে বিখ্যাত সিজারির মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল'। চিঠি পেয়ে ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশি হলেন। চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আস (রাঃ)

রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরি বিশ সনে। গ্রিকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলো না। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃতুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন।

পাঁচ বছর পর হিজরি পঁচিশ সনের কথা। ইতিমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আস (রাঃ) মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রিক সম্রাট কনস্টানটাইন, এক বছরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেন নি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসনমুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান। বাধ্য হয়ে আবার সাহাবি আমর ইবনুল আসের (রাঃ) শরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনরুদ্ধারের অনুরোধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আসকে মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে দেন; কিন্তু গভর্নর থাকলেন আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ। মিশরে আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ (রাঃ) ও আমর ইবনুল আসের (রাঃ) দ্বৈত শাসন চললো। এই দুই সাহাবি একে অপরের চক্ষুশূল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা একে অপরের ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ জারি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্তের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান। হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদের অভিযোগ হলো: হজরত আমর ইবনুল আস গ্রিকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুণ্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রিক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রেখে দিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন। পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আসের (রাঃ) অভিযোগ হলো: আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) ঔদ্বত্যপূর্ণ ও রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। তিনি নবিজির অভিশপ্ত লোক এবং কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে বিশ্বাস করেন না। আবদুল্লাহ বিন সাদের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সম্ভবত হজরত উসমানের চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর পালিত ভাইকে তিনদিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মুহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) বিচারে হজরত আমর ইবনুল আসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবারো বহিষ্কার করে উসমান (রাঃ) যেন সর্পের গুহায় হাত দিলেন। হজরত আমর ইবনুল

আস, খলিফা উসমানের স্বজনপ্রীতিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদিনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

মাত্র এক বৎসর হলো হজরত উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় বসেছেন। এরই মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের কর প্রদানে অনিয়ম, হাশিমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা এবং সর্বোপরি মদিনায় খাদ্যাভাবে খলিফা ভীষণ চিন্তিত হলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সিরিয়ার গভর্নর হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। পরামর্শ দিলেন আর্মানিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর আক্রমণ করতে হবে। উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় আরও কিছুদিন থাকার ভরসা পেলেন, অন্তত আয়ের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। হজরত মোয়াবিয়ার কথামত খলিফা উসমান কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মানিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রিসের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চল আর্মানিয়া চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মানিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রিস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রিকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মানিয়াগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়িক। খলিফা উসমানের সময়ে তারা মদিনায় কর পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরি পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী আর্মানিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার অভ্যন্তরীণ মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মানিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ি অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মানিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো। এক হাজার দিনের ক্ষুধার্ত সিংহের মতো তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের তেজস্বী তলোয়ারের নিচে গলা পেতে দিল আর্মানিয়ার সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্বেতবর্ণের ঝর্ণারাশি রঙিন হলো আর্মানিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুন হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ

হলো। আর্মানিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে গেলেন না। তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মানিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণ-সাগর তীরে এসে পৌঁছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রিকদের সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মত শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিল না। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু কাসপিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকাকালেই বিদ্রোহ চলছিল। তন্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়াজগার্দ খলিফা উসমানের শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে স্বদেশ পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টাশি বছর বয়স্ক ইয়াজগার্দকে 'সিংহ-রূপী' মুসলমানদের সম্মুখ হতে 'মূষিক ছানা'-র মতো পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে আগে খোরাসানে প্রবেশ করতে পারবে, সেই হবে সেখানকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি দখল করে নিতে আর দেরী করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খৃস্টাব্দের ঘটনা।

ভূমধ্যসাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকুলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকূলবর্তী জনপদসমূহের ওপর আক্রমণ করার স্বপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরামর্শে হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খলিফা উসমানের (রাঃ) কাছে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা উসমান সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাইপ্রাস

দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। খলিফা উসমান মুয়াবিয়াকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন: বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোটেই অমূলক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে যুদ্ধই জীবিকা নির্বাহের উত্তম উপায়। অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন। জলযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। রাজধানীতে মানুষ দলে দলে সৈনিকের খাতায় নাম লেখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে উঠলো। হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস আল্ হারেসির নেতৃত্বে, হিজরি আটাশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকূলে এসে উপিনীত হলেন। গ্রিক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন। খবর পেয়ে মদিনায় খলিফা উসমান চিন্তিত হলেন। তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। মিশর থেকে আবদুল্লাহ বিন সাদ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রিকবাহিনী পরাজয় বরণ করে। বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) কর আরোপ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন। মুয়াবিয়ার পরামর্শে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ নৌ-বহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান। জীবিতকালে হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়তি সম্পদও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলো না। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিনদিন শাসক ও শোষিতের মধ্যকার

বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী রমরমা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়া (রাঃ) যখন হজরত উসমানকে (রাঃ) আর্মানিয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) ত্রিপলি (বর্তমানে লিবিয়ার রাজধানী) আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমর ইবনুল আসের (রাঃ) সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাকে অপেক্ষা করতে হলো অনেক দিন। হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ত্রিপলি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে (রাঃ) সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। উসমান (রাঃ) মদিনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রিপলি অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মদিনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন: ‘মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রিপলির গভর্নর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে’।

যেই ঘোষণা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে সেনাশিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে-পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার বণ্টনে মুসলিম সেনাপতির কোন অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটিমাত্র মেয়ের দিকে হা করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাকিয়ে আছে এক পাল কাম ক্ষুধার্ত সৈন্য। রাজকন্যা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুয়রের মতে, গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোনো মুসলিম সৈন্যের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রিপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীরনেতা আবদুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) ‘বীর শ্রেষ্ঠ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে এতো সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ

সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ বিন সাদকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মাওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিল না। বাইতুলমাল-শূন্য রাষ্ট্র-পরিচালনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মানিয়া ও ত্রিপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রিপলির যুদ্ধপূর্বে আবদুল্লাহ বিন সাদকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগণ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ বিন সাদ ও মারওয়ান এরা দু-জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং খলিফা হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়। ত্রিপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে-ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরুরাজি আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেইন ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা উসমান লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদিনা থেকে একদল সৈন্যসহ আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন আবদে কায়েস নামক দুজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেইন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দস্যুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেইন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আবদুল্লাহ বিন সাদ যখন সাইপ্রাস উপকূলে জলযুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া তখন স্থলযুদ্ধে কনস্টানটাইন দখল করতে বেরিয়ে পড়েন। কনস্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বছরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল-মুরাত নামক এলাকাটি দখল করতে সক্ষম হন।

খলিফা উসমানের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার লক্ষ্যে এবারে কুফা ও বসোরার প্রতি একটু নজর দেয়া যাক। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্নর ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন। সরকারি সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলো না। হজরত মুগিরা ইবনে শোবা

(রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্বত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমূলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তিকেন্দ্রীক চরিত্র ও জনগণের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর খলিফা উসমানের (রাঃ) কানে পৌঁছিলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগণকে হতাশ করে হজরত উসমান (রাঃ) আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সাদ (রাঃ) সুযোগ বুঝে পূর্বের চেয়েও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুলমাল থেকে বিপুল পরিমাণের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে বসলেন। তখন বাইতুল-মালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলাম পূর্ব মক্কায় আকাবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল রাখাল ছিলেন। বাইতুলমালের অর্থ নিয়ে গভর্নর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের (রাঃ) দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সাদ (রাঃ) দোষী সাব্যস্থ হলেন। এবারে কুফার গভর্নর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। কুফার নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা অলিদ ইবনে ওকাবা ছিলেন নবিজি মুহাম্মদের (দঃ) প্রাণের শত্রু ওকবার পুত্র। নবিজির সাথে একবার একটি ঘটনা কুফাবাসীর জানা ছিল: এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে ওকবা বন্দী হয়ে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবিজিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (ওকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবিজি বলেছিলেন, দোজখের আগুন খাবে। সেই ওকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফা উসমানের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পেলো না। অলিদের কঠোর দমননীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় এসে হজরত অলিদ (রাঃ) একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্ত, হজরত অলিদ (রাঃ) নেশাগ্রস্থ হয়ে একদিন এমনভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসৎ চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ, মদিনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির

সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়িয়েছেন বলেও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে হজরত অলিদকে পদচ্যুত করেন। এরপর থেকে হজরত অলিদ আর কোনোদিন খলিফা উসমানকে সুনজরে দেখেননি। এবার খলিফা উসমান কুফার মসনদে বসালেন কোরায়েশ বংশের তরুণ বীরযোদ্ধা হজরত সাইদ বিন আল আসকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশসুলভ অমানবিক, দুশ্চরিত্রের অভাব মোটেই ছিল না।

কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্নর ভয়ানকরূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিমতো দূরের কথা, অকোরায়েশ মুসলিমদেরকেও হীন মর্যাদার, পশুপ্রকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বললেন, এদেরকে তিনি লৌহদণ্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশবংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবি করতে পারে। একটি বৈঠকে সাইদ বিন আল আস যখন বললেন: 'সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত' উপস্থিত জনগণ সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বললো: এই বিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবে না। সারা দেশ জুড়ে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। মদিনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমি বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম না হলে ইসলাম জন্ম নিতো না, সেই হাশিমি গোত্র এমন আস্ফালন বরদাশত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসোরি (রাঃ) ও হজরত রাবেয়া বসোরির (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মুতাজিলা মতবাদও ইরাকের এই বসোরা হতে উদ্ভূত। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল। বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিণ পারস্য, বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন। কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলও বসোরার

শাসনাধীন ছিল। হিজরি ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবি হজরত আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) বসোরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরি হয়ে ওঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈরশাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরি মসজিদে জেহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জেহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বললো, তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হটকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদিগণ প্রত্যক্ষ করলো, গভর্নর আবু মুসা-আশআরি (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা আশআরি (রাঃ) ঐ লোকদের নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ট হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে অত্যাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা বঞ্চিত দল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদিনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরি ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহযুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরাবাসীর দুঃখ দূর হলো না। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির। এই লোকটি খালিদ বিন ওলিদ ও আমর ইবনুল আসের চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অকোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসননীতি সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিমজগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অকোরায়েশ। একদিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য-বিস্তার, বিভিন্ন দেশ-এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, হজরত উসমানের ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) হাশিমি বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অকোরায়েশ, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

হজরত উসমান কর্তৃক এ যাবৎ মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরান সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ খলিফা উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরানের শরিয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরান সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলো না। খলিফা উসমান কোরানের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী, আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ ও হজরত আলিকে (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না। যদিও এরা উভয়েই প্রথম পর্যায়ের কোরানের কাতিব (লেখক) ছিলেন।

নবি মুহাম্মদ (দঃ) লিখতেও পারতেন, পড়তেও পারতেন। কিন্তু নিজে কোরান লেখেন নাই। তাঁর মুখনিঃসৃত কথা, স্বর্গীয় বাণী বলে দাবিকৃত বিধায় উপস্থিত শ্রোতা যে যেভাবে পারেন স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা পাথরে, খেজুর পাতায়, গাছের পাতা থেকে বিশেষভাবে তৈরি কাগজে, পশুর চামড়ায় ও কাঠের টুকরোয় লিখে রাখতেন, এমনকি মুখস্তও করে রাখতেন। তাওরাত, জবুর ও ইনজিল কেতাব অনুসারীদের কাছ থেকে মুহাম্মদের (দঃ) শুনা ঘটনাবলী ও মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে মানুষের ঐ শুনা কথা, বিভিন্ন বস্তুতে, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্যসমূহই পবিত্র কেতাব 'আল-কোরান। কোরান সম্পাদনায় মুহাম্মদকে (দঃ) যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরানের কাব্যিক ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, তৎকালীন এবং ইসলাম পূর্ববর্তী আরবিয় একাধিক কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধারকৃত। একদিন নবির কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) কোরানের 'সুরা ক্বমর' (চাঁদ) আবৃত্তিকালে আরবের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েসের মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কায়েসের মেয়ে রাগান্বিত হয়ে হজরত ফাতিমাকে বললেন: 'সর্বনাশ, এটাতো আমার বাবার লেখা একটি কবিতার পংক্তি। তোমার বাবা, আমার বাবার কবিতা নকল করে আল্লাহর বাণী বলে কোরানে ঢুকিয়েছেন।' খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইমরুল কায়েসের ধর্মীয় ভক্তিমূলক কবিতাগুচ্ছ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে লেখা এবং কবি ইমরুল কায়েস মুহাম্মদের জন্মের পূর্বেই মারা যান কিন্তু তার কবিতাগুলো আরবে মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল। মুহাম্মদ (দঃ)

কখন কীভাবে ঐ কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গ্রন্থাকারে কোরান তৈরি করার ধারণাটা প্রথম আসে হজরত ওমরের মাথায়। হজরত ওমর খলিফা আবুবকরকে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে আবুবকর প্রথমে রাজি হননি। আবুবকর (রাঃ) জানতেন বিষয়টা স্পর্শকাতর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খলিফা উসমান যখন পুনরায় এ উদ্যোগটা নিলেন, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সিরিয়া, কুফা, বসোরা, আজারবাইজান, মিশরসহ বিভিন্ন এলাকার কোরান আর মদিনায় হজরত ওমরের নির্দেশে তৈরি কোরান আর, তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গচ্ছিত কোরানের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। কোরায়েশ শাসকগণ তাঁদের প্রজা নির্যাতন, অপশাসন ও শোষণের বৈধতা যখন কোরানিক নির্দেশ বলে দাবি করতেন, তখন নির্যাতিত শোষিতেরাও একই কোরান দিয়েই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, শাসকেরা তাদের স্বার্থানুযায়ী কোরানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এনেছে এবং তাঁরা কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্ফারি (রাঃ) সিরিয়ার স্বৈরশাসক হজরত মোয়াবিয়াকে সরাসরি 'কোরান-বিরোধী শাসক' বলে অভিযোগ করেন। আবু জওহর কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন: 'আপনি যে জনগণের সম্পদ দিয়ে রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং রাজকীয় বেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন তা কোরানের পরিপন্থি।' মোয়াবিয়া (রাঃ) আবু জওহর গিফ্ফারীকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন: 'বেকুবের দল, রাষ্ট্রীয় আয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক জনগণ নয়। সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহই আমাকে তাঁর সম্পদের রক্ষক হিসেবে মনোনীত খলিফা করেছেন। সম্পদ ব্যবহার হবে জনগণের নয়, খলিফার ইচ্ছানুযায়ী।'

জনগণের কাছে যখন সারা মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্নরসহ স্বয়ং খলিফা উসমান কোরান-বিরোধী, অনৈসলামিক শাসক বলে বিবেচিত, তখন হজরত উসমানের কোরান সংকলন মানুষের কাছে কতটুকু সমাদৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হজরত উসমান যায়িদ বিন সাবিতকে (রাঃ) সর্বপ্রধান করে আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, সাদ ইবনুল আস এবং আব্দুর রহমান বিন হারেসসহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোরান সংকলন কমিটি গঠন করলেন। নির্দেশ দিলেন মদিনার ওহি লেখকদের সাথে যদি ভাষাগত মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে কমিটি যেন কোরায়েশদের ভাষা অনুসরণ করে। খলিফা আরো বললেন: 'এই কমিটিকর্তৃক প্রণীত কোরানই

হবে সরকার অনুমোদিত পরিপূর্ণ বৈধ কোরান এবং রাজ্যের অন্যান্য সকল কোরান অবৈধ বলে গণ্য হবে।' কোরানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লেখা ও সম্পাদনা হলো। হজরত উসমান কমিটিকে কোরানের ৭টি কপি তৈরি করতে আদেশ দিলেন। ৭টি রাজ্যে কোরানের ৭টি কপি পাঠিয়ে তখনকার প্রচলিত বাকি সব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। বেসরকারিভাবে প্রচলিত সকল কোরান পুড়িয়ে ফেলা হলো। এবারে আরব-অনারব, হাশিমি-উমাইয়া, কোরায়েশ-অকোরায়েশ নয়, রাজ্যের সকল প্রদেশের সকল এলাকা থেকে, সকল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। খলিফা উসমান **১২**টি বছর খেলাফত কালের পূর্ণ **১০**টি বছর যুদ্ধবিগ্রহ করে কাটিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বিরাট ভূখণ্ড দখল করা হলো, যশ-মান-পদোন্নতি-জগতের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার-সম্পদ- দাস-দাসী সবই পদানত করা হলো। তবু হায়! হায় শান্তির ধর্ম! হায় সাম্যের ইসলাম! অগণিত নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরের প্রাণ সংহার করে, এতসব মানবরক্ত পান করেও তার রক্তপিপাসা নিবারণ হলো না। ইসলাম এবার নিজেরই রক্তপান করতে উদ্যোত হলো। রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সরকার-বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠলো। তাদের এক দফা, এক দাবি: স্বৈরশাসনের পতন হউক। সর্বদলীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা এগিয়ে আসলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো:

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ): মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা সাহাবি হজরত আবুবকরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নবি মুহাম্মদের কনিষ্ঠ স্ত্রী আয়েশার ভাই। খলিফা আবুবকরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, শিশু পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে হজরত আলিকে (রাঃ) বিয়ে করেন। আবুবকরের (রাঃ) স্নেহের সন্তান মুহাম্মদ ছিলেন যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী। হজরত আলির পোষ্যপুত্র মুহাম্মদ, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে, হজরত ওমরের নির্বাচন কমিটির ওপর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেছিলেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভের পরপরই তাঁর অদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা, অন্যায় শাসন সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর মদিনা ছেড়ে মিশর চলে যান।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ): মুহাম্মদের (দঃ) বিশেষ সম্মানিত সাহাবি হজরত আবু হুজাইফার (রাঃ) পুত্রের নামও 'মুহাম্মদ'। তাঁর পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে (আবুবকরের আমলে) মৃত্যুবরণ করার পর থেকে তিনি খলিফা উসমানেরই গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে

মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রচারের নামে জগত জুড়ে যে অত্যাচার-অনাচার চলছে তা কোনোভাবেই ধর্ম-সমর্থিত হতে পারে না। স্বদেশ ত্যাগ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফাও মিশরে চলে আসেন। মিশরের আদিম অধিবাসী 'কীবতি সম্প্রদায়' কোরায়েশদের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতো না। মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা মিশরের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহর দিকে ইঙ্গিত করে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শাসকদের বিলাসিতাপ্রিয় আসল চেহারা। মিশরে এসে 'মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর' ও 'মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা' এই দুই মুহাম্মদ, সুদীর্ঘ ১২টি বছর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা (রাঃ): হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বিলাসবহুল জীবন ঘৃণা করতেন। ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। তিনি হজরত আলিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হজরত আলির ভেতর নবি মুহাম্মদের সকল প্রকার গুণাবলী বিদ্যমান বিধায় নবির মৃত্যুর পর হজরত আলিই প্রথম খলিফা হবেন। বসোরায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁর এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা করতে থাকেন। বসোরার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমির, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কুফায় চলে যান। সেখানে আগে থেকেই হজরত আলির বহু সমর্থক ছিল। বসোরা ও কুফায় তাঁর বিশ্বাসের প্রতি প্রচুর লোক সমর্থন জানায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় তখন হজরত উসমানের উমাইয়া বংশীয় সরকার হজরত মোয়াবিয়ার যাঁতাকলে, হাশিমি বংশের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। পরিশেষে সিরিয়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফার সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি 'সাবায়ি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন।

সারা মুসলিম বিশ্বে যে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছে, হজরত আলি (রাঃ) তা আঁচ করতে পেরে খলিফা উসমানকে কতগুলি সূক্ষ্ম পরামর্শ দিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ যে কতো অন্ধ হতে পারে ৮০ বছর বয়স্ক হজরত উসমান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি আলির (রাঃ) পরামর্শ গ্রাহ্য তো করলেনই না বরং বিদ্রোহের প্ররোচণাকারী বলে হজরত আলিকে অপবাদ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে

থাকে। সমগ্র দেশটা গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ অবস্থায় দেখেও হঠাৎ করেই হজরত উসমান নতুন একটি প্রথার উদ্ভব ঘটালেন: 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারি ও জমিদারী প্রথা'। দুটি উদ্দেশ্যে হজরত উসমান এ কাজটি করেছিলেন যথা:

এক: স্বগোত্রীয় বিত্তশালী লোকদের সমর্থন অর্জন.
দুই: গরিব প্রজাদেরকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর, আর কৃষকদেরকে ভূমিহীন করা।

তাঁর ধ্বংসমুখী আইনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে- 'দেশে মাত্রাতিরিক্তভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নাগরিক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নবাগত মুসলিম অধিবাসীদের বেশিরভাগই যাযাবর-বেদুইন কিংবা গ্রাম্য অনারব। এরা মূর্খ ও বর্বর। এদের রুচি-আচরণ কদর্য, অভদ্র ভাষা, অসভ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি ঔদ্বত্যপূর্ণ। এদের দ্বারা দেশের শান্তি বিপন্ন হচ্ছে।'

আসলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে। ধর্ম প্রচারের নামে খুন, লুট, ডাকাতিকে আরবগণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ডাকাতি শুধু লাভজনক একটি ব্যবসাই নয়, পূণ্য কাজ বলেও শাসকগণ প্রচারণা করতেন। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম কবুল করে দস্যুতা গ্রহণ ছাড়া কোনো গতি ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলো, সৈনিক দলে যোগদান করে লুটকৃত সম্পদের অংশীদার হলো, সাথে নিয়ে আসলো কুসংস্কার, বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অজ্ঞতা ও অরাজকতা। তাছাড়া ক্ষমতাশীল, বিত্তবান সাহাবিগণের যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে গণিমতের মাল হিসেবে রক্ষিতা, যুদ্ধবন্দী নারীগণ, তাঁদের গর্ভজাত জারজ-সন্তানাদি সমাজ ও শাসকদের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়।

খলিফা উসমানের 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারি ও জমিদারী প্রথা' নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত একটা জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় নাই, সে কথা বুঝতে কারো বাকি রইলো না। বেশ কয়েকজন সাহাবি এর প্রতিবাদ করলেন। প্রাক্তন

বিশিষ্ট সাহাবিগণ অভিমত প্রকাশ করলেন, শরিয়ত বিরোধী এ সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে মুসলিম জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

এবারে নবির আমলের খ্যাতনামা সাহাবি দেশের বরেণ্য উলামাগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। এমনকি এককালে উসমানের ডান হাত বলে পরিচিত হজরত তালহা (রাঃ), হজরত জোবায়ের (রাঃ), কুফার কোষাধ্যক্ষ সাহাবি ইবনে-মাসউদ (রাঃ) সহ বহুসংখ্যক সাহাবি ও সরকারি কর্মচারী খলিফার বিরুদ্ধে চলে যান। হজরত উসমান কঠোর দমননীতি অনুসরণ করলেন। কয়েকজন সাহাবিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন, কিছু লোককে প্রসাদে ডেকে এনে স্বহস্তে অমানুষিক নির্মম শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি হজরত উসমানের ভাষা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, অকথ্য, অমার্জিত। হজরত আলিও উসমানের অকথ্য ভাষায় গালাগালি থেকে রেহাই পাননি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাহাবি হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) যিনি হজরত ওমর কর্তৃক খলিফা নির্বাচন কমিটির প্রধান হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চণার মাধ্যমে উসমানকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন, সাহাবি হজরত জায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) যাঁকে উসমান তাঁর 'কোরআন সংকলন কমিটি'-র প্রধান বানিয়েছিলেন, সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যাঁর কথায় উসমান (রাঃ) হজরত ওমরের খুনী পুত্র উবায়দুল্লাহকে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এঁরাসহ হজরত আলি (রাঃ) বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে এসে অবস্থান নেন। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়া খলিফাকে বার্তা পাঠালেন- 'আমিরুল মোমেনিন, আপনি অতিসত্তর সিরিয়া চলে আসুন, মদিনায় আপনার প্রাণের নিরাপত্তা আর নেই, নতুবা সামরিক আইন জারি করুন, আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবো।' খলিফা কোনোটাই করলেন না। গণঅভ্যুত্থানের হাওয়ায় মদিনা উত্তপ্ত। উসমান টের পেলেন বিপদ আসন্ন। তিনি হজরত আলির স্মরণাপন্ন হলেন। হজরত আলিকে ডেকে এনে উসমান (রাঃ) নিজের ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু ভুল স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে হজরত আলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উসমান বললেন: 'আলি, এখন থেকে আমি শুধু তোমার কথাই শুনবো। মোয়াবিয়া, মারওয়ানের পরামর্শ নেয়া আমার ঠিক হয়নি। আজ থেকে তুমি যেভাবে বলবে রাষ্ট্র সেভাবে চলবে।' আলির মনে

পড়লো ক্ষমতা ও সম্পদ লোভী, আত্মম্ভরী, স্বেচ্ছাচারী উসমানের সুদীর্ঘ ১২ বছর শাসনের কলঙ্কিত দিনগুলোর কথা। খলিফা উসমান তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনী সাহাবি হজরত ওমরের পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোরান সংকলন করে রাজ্যের সর্বত্র মানুষের হাতে লেখা 'কোরান' আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। সেগুলোতে কী লেখা ছিল পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন জানতে পারবে না। গরিব কৃষকেদর জমি জবরদস্তি দখল করে মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ করে মানুষকে ভিটেহীন করেছেন। ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স আরোপ করে নবির আদর্শকে কলংকিত করেছেন। 'প্রজাস্বত্ব হস্তান্তর' আইন প্রণয়ণ করে নিজের আত্মীয় উমাইয়া বংশের মানুষকে জমিদার বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ভিখারী করেছেন। মাদকাসক্ত, ব্যাভিচারী, মিথ্যাচারী, দেশের স্বঘোষিত নামকরা সন্ত্রাসী, যাদের মধ্যে চরিত্রের বালাই নেই তাদেরকে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছেন। বায়তুলমাল থেকে টাকা আত্মসাৎকারী কুফার গভর্নর কুখ্যাত অলিদের কথায় তার কোষাধক্য সাহাবি ইবনে-মাসউদকে সকলের সম্মুখে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছেন। এই তো সেদিন ইবনে-মাসউদকে মসজিদে দেখে উসমান বলেছিলেন- 'ঐ দেখো বাঁদির বাচ্চা নষ্টের কীট এসেছে, সে যে পাতে খায় সেই পাতে মলত্যাগ করে'।

ইতিপূর্বে ইবনে-মাসউদ (রাঃ) কুফার গভর্নর অলিদের অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। হজরত আয়েশা, মসজিদ সংলগ্ন ঘর থেকে উসমানের গালিগালাজ শুনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, আপনি নবির বিশ্বস্ত সাহাবিদেরকে এমনভাবে গালাগালি করছেন? আয়েশার কথায় খলিফা ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ইবনে-মাসউদকে (রাঃ) এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সাহাবি মাসউদের কোমরের একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্তায় মাসউদকে সেদিন উসমান টেনে হিঁচড়ে 'মসজিদে নববি' থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে সাহাবি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) খলিফা উসমানের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুলমাল থেকে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল, কিছু স্বর্ণালংকার ও মণি-মুক্তা চুরির অভিযোগ এনেছিলেন মদিনার কিছু লোক। খলিফার বেশ কয়েকজন আত্মীয়ের গায়ে সেই অলংকারের প্রমাণও তারা দেখিয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) মোয়াবিয়ার ভাষায় বলেছিলেন, 'বায়তুলমালের সম্পদের মালিক আল্লাহ। আমি আল্লাহর

মনোনীত খলিফা। আল্লাহর মনোনয়ন ছাড়া খলিফা হওয়া যায় না। সম্পদ ব্যবহার হবে আমার ইচ্ছায়, তোমাদের তাতে কিছু বলার কোনো অধিকার নেই'। আম্মার ইবনে ইয়াসের ও হজরত আলি একসাথে সমস্বরে বলেছিলেন- 'খলিফা, আল্লাহর কসম, আমি হবো আপনার প্রথম প্রতিবাদী, বায়তুলমালের সম্পদের জবাবদিহি আপনাকে করতেই হবে।' খলিফা উসমান, আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে বন্দী করে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিনদিন তাঁকে বেহুশ হয়ে মৃত অবস্থায় উম্মে সালমার (রাঃ) গৃহে পড়ে থাকতে হয়। আয়েশাও সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। হজরত উসমান সেদিন আলিকেও বলেছিলেন: 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমারও আম্মারের অবস্থা হবে'। আলিও রক্তবর্ণ চোখ দেখিয়ে বলেছিলেন- 'আত্মম্ভরী উসমান, আল্লাহর কসম, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম, আমার মা তোমার মায়ের চেয়ে উত্তম, নবির কাছে আমার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!' এসব কিছু স্মরণ করে আলি আরো বললেন, 'আজ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। এর আগে বহুবার আপনাকে সতর্ক করেছি, পরামর্শ দিয়েছি, আপনি তো কানেই তোলেননি। বরং কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্ফারিকে (রাঃ) বিনা অপরাধে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি এর প্রতিবাদ করায় আপনি আপনার মন্ত্রী মারওয়ানের পক্ষ নিয়ে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে প্রসাদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।' উসমানেরও মনে আছে সেদিন হজরত আলিও কম বলেননি। উসমান জানেন কোথায় আলির পিতা আবু তালিবের হাশিমি বংশ আর কোথায় উসমানের উমাইয়া বংশ। কিন্তু আজ তিনি নীরবে শুধু আলির কথা শুনতে থাকলেন। উসমান বললেন- 'আলি, আমি জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে তাদের দাবি মেনে নেবো, তুমি তাদেরকে মদিনা থেকে ফিরিয়ে দাও।' হজরত আলি, তার কাছে ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদের দেয়া অভিযোগ ও দাবিসমূহ উসামানকে এক-এক করে শুনালেন। অভিযোগগুলো শুনে হজরত উসমান, সকল দোষ তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার ওপর, বিশেষ করে হজরত ওমরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি আঙুলে গুণে কয়েকজন দুধর্ষ দুষ্কৃতিকারী সাহাবির নাম উল্লেখ করে বললেন, 'দেখো আলি, এদেরকে দ্বিতীয় খলিফা ওমর গভর্নর পদে নিয়োগ করে গেছেন। সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়া কেমন মানুষ তুমি তো জানো। তার মতো মানুষকে সরিয়ে আমার খেলাফত কি একদিনও টিকবে?' অতি নম্র ভাষায় উসমান

আরো বললেন, 'দেখো, বিগত দুই খলিফাও অনেক ভুল করেছিলেন কিন্তু কেউতো কোনোদিন তাদের পদত্যাগ দাবি করেনি, আমার বেলায় কেন এমন হচ্ছে? আমি শুধু একটি দাবি বাদে জনগণের বাকি সব দাবি মেনে নেবো। আমি ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারবো না'। হজরত আলি বললেন: 'ঠিক আছে, আপনি যে জনগণের দাবি মানতে রাজি তার একটি প্রমাণ দিন'। কিছুদিন পূর্বে নবিপত্মী আয়েশাও উসমানকে বলেছিলেন, 'খেলাফত ত্যাগ করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং আমার ভাই মুহাম্মদকে মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করুন।'

নবিপত্মী আয়েশা তার ভাই মুহাম্মদকে সরকারি কোনো পদ না দেওয়ায় উসমানকে সেই প্রথম থেকেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। আয়েশা এবং তাঁর ছোট বোনের স্বামী হজরত তালহা (রাঃ) ও বড় বোনের স্বামী হজরত জোবায়ের (রাঃ) যে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী খলিফা উসমান তা টের পেয়েছিলেন। সবকিছু বিবেচনা করে উসমান ঘোষণা দিলেন যে, আজ থেকে মিশরের নতুন গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে (আয়েশার ভাই) নিযুক্ত করা হলো। সরকার জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছেন। ঘোষণা পত্রে উসমান দস্তখত করলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর কিছু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মিশরের পথে রওয়ানা হয়ে যান। মদিনায় জড়ো হওয়া বিক্ষুদ্ধ জনতা খলিফার ঘোষণা বাস্তবায়নের আশা বুকে ধারণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর, মিশর পৌঁছার আগেই খলিফা উসমানের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে ধরা পড়ে যায়। উসমান তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরকে একটি চিঠি দিয়ে মিশর প্রেরণ করেছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, 'মুহাম্মদকে তার দল নিয়ে মিশর পৌঁছামাত্র যেন হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়'। কিন্তু গুপ্তচর মুহাম্মদের দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। সকলে মদিনায় ফিরে আসলেন। বিচার ডাকা হলো। বিচারের ভার দেয়া হলো হজরত আলির হাতে। হজরত আলি খলিফা উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন-

-এই গুপ্তচর কি আপনার?

-জ্বি, আমার।

-এই উট কি আপনার?

-জ্বি, আমার।

-এই চিঠির সীলমোহর কি আপনার?

-হ্যাঁ, আমার।

-এই চিঠির নিচে স্বাক্ষর কি আপনার?

-হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

-এই চিঠি আপনি লিখেছেন?

-আল্লাহর কসম, আমি লিখি নাই।

-আপনি কাউকে লিখতে বলেছিলেন?

-আল্লাহর কসম, আমি কাউকে লিখতে বলি নাই।

হজরত আলি লেখা পরীক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে চিঠির লেখা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। বিশেষজ্ঞগণ একমত হলেন, চিঠির লেখা মারওয়ানের হাতের। হজরত আলি মারওয়ানকে বিচারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উসমান বাধা দিলেন, মারওয়ানকে এখানে আনা যাবে না। গর্জে উঠলো উপস্থিত জনতা। মদিনার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে বজ্রধ্বনি উঠলো, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!, ইনতেকাম! ইনতেকাম! (প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!)। মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো মদিনার অলিতে গলিতে। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে দেখে হজরত আলি, হজরত তালহা ও হজরত জোবায়েরসহ অনেকেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। জনতা খলিফার গৃহ অবরোধ করলো। চার হাজারেরও বেশি মানুষের গৃহ অবরোধের শেষ পরিণতি আন্দাজ করতে পেরে নবিপত্নী হজরত আয়েশা চলে গেলেন মক্কায় আর হজরত আলি শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। স্বপরিবারে পূর্ণ বিশদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পরও উসমান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। তাঁর একটি আশা ছিল সিরিয়া ও বসোরা থেকে সৈন্যবাহিনী এসে তাঁকে উদ্ধার করবে। হিজরি ৩৫ সালের ১৭ই জিলহাজ্ব, শুক্রবার। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) প্রাসাদের ছাদের ওপর দিয়ে জানালা ভেঙে খলিফা উসমানের কক্ষে ঢুকে পড়েন। হাতে উন্মুক্ত শাণিত তরবারি, সঙ্গে আরও ৪ জন। উসমান আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মিনতি, বেঁচে থাকার শেষ প্রতারণা করলেন। বুকের ওপর দুই হাতে কোরান ধরে বসে রইলেন।

নবিজির দোহাই দিলেন, মুহাম্মদকে তাঁর পিতা আবুবকরের দোহাই দিলেন, কোরানের দোহাই দিলেন। মুহাম্মদ ভীষণ শক্ত হাতে উসমানের সাদা ধবধবে দাঁড়িতে ঝাপটে ধরে টান দেন, উসমান মাটিতে পড়ে যান। উপর্যুপরি খঞ্জরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় উসমানের সর্বাঙ্গ। ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানের দেহনিঃসৃত রক্তের স্রোতধারা। তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কোরানের পাতাগুলো। উসমানের রক্তে সিক্ত, লাল রঙে রঞ্জিত, কোরানের ছিন্ন পাতাগুলোর সাথে তাঁর প্রাণহীন দেহটিও মেঝেতে পড়ে রইলো তিন দিন, তিন রাত্রি। চতুর্থ দিন রাতের অন্ধকারে, গোপনে হজরত আলি কতিপয় যুবককে নিয়ে লাশটি সংগ্রহ করে, জনবিরল এক গলিপথে শহরের বহির্ভাগে নিয়ে জান্নাতুল-বাকির পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জমিতে সমাহিত করেন।

ইসলামের চার খলিফার কেউই তাঁদের জীবদ্দশায় জনগণের শতদাবির মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। তাদের তিনজনকেই জনতার রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। আর তারা সকলেই খুন হয়েছিলেন মুসলমানের হাতে। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, হজরত উসমানের খেলাফতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঘরে, যে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে, তা হজরত আয়েশার যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। হজরত আয়েশার আশা ছিল, উসমান-পরবর্তী মদিনার খলিফা হবেন তাঁর দুই দুলাভাই হজরত তালহা (রাঃ) অথবা হজরত জোবায়ের (রাঃ)। জনগণ হজরত আলিকে বিপুল ভোটে মদিনার চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত করে। নবিপত্নী আয়েশা এমনিতেই হজরত আলিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। হজরত আলি ছিলেন বিবি আয়েশার চক্ষুশূল। যে মহিলার বিছানার ভেতর জিব্রাইল ওহি নিয়ে আসতেন বলে নবি মুহাম্মদ (দঃ) গর্ব করতেন, সেই আয়েশা যখন ঘোষণা দিলেন উসমান হত্যায় হজরত আলি জড়িত, মানুষ তা অবিশ্বাস করতে পারলো না। পূর্বে সাহাবি হজরত তালহা ও হজরত জোবায়ের (আয়েশার দুই দুলাভাই) আলিকে খলিফা মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আয়েশার পরামর্শে তারা সে শপথ অস্বীকার করে বললেন যে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হয়েছিল আলিকে খলিফা মানতে। উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হজরত আয়েশার ডাকে উমাইয়া বংশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাঁর সাথে যোগদান করলো বেশকিছু মুসলিম, যারা নবি মুহাম্মদের (দঃ) অস্ত্রের মুখে প্রাণ রক্ষার্থে মুসলমান হয়েছিল আর যাদের মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন নবি মুহাম্মদের নির্দেশে

হজরত আলির হাতে খুন হয়েছিল। এদিকে খেলাফত লাভের সাথে সাথে হজরত আলি সকল প্রাদেশিক গভর্নর পদ বাতিল করে দেন। কিছু উমাইয়া বংশীয় গভর্নরগণ পদত্যাগ করলো বটে কিন্তু রাজস্বভাণ্ডার লুটপাট করে শূন্য করে দিল। আর অনেকেই আলির খেলাফত অস্বীকার করলো। হজরত আলির জন্য প্রাদেশিক গভর্নর সমস্যার চেয়ে আয়েশার সৃষ্ট সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি, তাঁর সর্বকণিষ্ঠ সৎ শাশুড়ি বিবি আয়েশা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। হজরত উসমানকে যখন হত্যা করা হয়, আয়েশা তখন মক্কায় ছিলেন। সেখান থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। হজরত আয়েশা, আলি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত ইয়েমনের গভর্নরের দেয়া পুরস্কার, অত্যাধিক সুন্দর, হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা উট আল-আসকারের ওপর আরোহণ করলেন। পেছনে তাঁর ১০০০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। ডান পাশে হজরত তালহা, বামপাশে হজরত জোবায়ের। আয়েশার জীবনে বাল্যকালের আনন্দ ছিল না। যৌবন ছিল চরম হতাশা আর বেদনায় ভরা। যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে যাওয়ায় আয়েশার ওপর লোকে সেনাপতির সাথে কেলেঙ্কারি রটিয়েছে। মানুষ তাঁকে সতীত্বের অপবাদ দিয়েছে। আজ আয়েশার দুচোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে সারা জনমের জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ! হায়, নবিজি মুহাম্মদ! একবার এসে দেখে যান, আপনার বিষবৃক্ষে কী অপরূপ ফল ধরেছে। দেখে যান, আপনার আদরের দুলালী ফাতিমার স্বামীকে বধ করতে আপনার প্রিয়তমা বালিকা বধুর হাতে খঞ্জর। এ তো আপনারই শিক্ষা। এ তো আপনারই দেখানো সেই পথ! সর্বনাশা এই পথের সন্ধান 'উম্মে সালমা' জানতেন কীভাবে? উম্মুল-মোমেনিন (মুসলিম জাতির মা) হজরত আয়েশা সৈন্যদল নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হবার আগে, তাঁর অন্যতম সতীন উম্মে সালমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সালমা বললেন- অসম্ভব! আয়েশা তুমি ঐ সর্বনাশা পথে পা বাড়িও না। নবিজি আমাকে বলে গেছেন, 'একদিন একদল সশস্ত্র লোক ঐ পথে যাত্রা করবে যাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মুসলিম নারী। সে নারী, আমার উত্তরাধিকারী, খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমার স্বামী আমার প্রিয় জামাতা হজরত আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে'। নবিজি আরও বলেছেন, 'যারা আমার আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে, মনে করো তারা আমাকেই অস্বীকার করলো'। আয়েশা তুমি সেই অভিশপ্ত নারী হতে যেও না।

আয়েশার শরীরের রক্তধারা আজ উজান বইছে। উম্মে সালমার নির্বোধ কথা শুনার সময় আয়েশার নেই। বসোরার পথে আয়েশার দলে আরও ২ হাজার লোক যোগদান করলো। বসোরার গভর্নর আয়েশাকে বাধা দিলেন। ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা রাজধানীতে ঢুকে পড়লেন। তারা হজরত আলির নতুন খলিফা, গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফকে নামাজরত অবস্থায় বন্দী করে তাঁর দাঁড়ি-গোঁফ মুণ্ডায়ে শহর থেকে বের করে দিলেন। হজরত আলি যখন উম্মে সালমা মারফত আয়েশার মনোভাবের সংবাদ পেলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৪০ জন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে আয়েশার সেনাবাহিনী বসোরা দখল করে নিয়েছেন। আলি তাৎক্ষণিকভাবে মাত্র ৯ শত সৈন্য নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হয়ে যান। নবিজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র (হজরত আলির সন্তান) হাসান ও হোসেন আর বসে থাকতে পারলেন না। পিতার নির্দেশে হজরত হাসান (রাঃ) অতিসত্তর কুফায় চলে যান। সেখান থেকে ৯ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পিতার সাথে মিলিত হন। আলির পরাজিত গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফ এসে বসোরার অবস্থা বর্ণনা করলেন। আলি মুচকি হেসে বললেন- 'বৃদ্ধ গভর্নর পাঠিয়ে ছিলাম, এ দেখছি যুবক হয়ে ফিরে আসলেন'।

ধীরে ধীরে হজরত আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২০ হাজারে আর আয়েশার ৩০ হাজার। প্রথমাবস্থায় হজরত আলি ও হজরত তালহার মধ্যে সাময়িক বাকযুদ্ধ হলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো, পরের দিন আরো আলাপ হবে বলে তারা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই আয়েশা তার স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) রণকৌশল দেখে আসছেন। পরের দিন আরো আলাপ করার জন্যে আয়েশা এতদূর আসেন নাই। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে আয়েশার সৈন্যদল হজরত আলির সেনা-তাঁবুতে আক্রমণ করে বসলো। অতি অল্পসময়েই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাত হতে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল, যুদ্ধ আর থামে না। হজরত আলির দক্ষ সেনাবাহিনীর সামনে আয়েশার সৈন্যগণ আর কতক্ষণ টিকে থাকবে? আয়েশার সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়লো। তারা পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিল। এতক্ষণে দশহাজার মুসলিম সন্তানের তাজা রক্তে শুষ্ক-মরুভূমি রক্তনদীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নবিজির কাছ থেকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খেতাব প্রাপ্ত বীরের সামনে, উটের ওপর রমণীর উঁচু শীর! হজরত আলির আর সহ্য হয় না। নির্দেশ দিলেন, আয়েশার উটের পা কেটে ফেলা হউক। উটসহ আয়েশা মাটিতে পড়ে যান। হজরত আলি, আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে বললেন, তোমার

বোনকে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে এসো। (ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ **'জঙ্গে জামাল'** নামে অধিক পরিচিত) হজরত আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারলেন না, সামনে তাঁর জন্যে ও তাঁর আদরের ধন হজরত হাসান ও হোসেনের জন্যে যে, অপেক্ষা করছে ভয়াবহ সিফফিন ও কারবালা। জামাল যুদ্ধে পরাজিত আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদিনায় পাঠিয়ে দিয়ে হজরত আলি (রাঃ) বসোরা থেকে কুফায় গমন করলেন ৩৬ হিজরির রজব মাসে। সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করবেন। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখনও সিরিয়ার গভর্নর। মুয়াবিয়া (রাঃ) যে, হজরত আলিকে খলিফা হিসেবে এত সহজে মেনে নেবেন না, তা আলিরও জানা ছিল। আর মুয়াবিয়াও হজরত আলিকে লোমে-পশমে চেনেন। রহস্যজনকভাবে মুয়াবিয়া, হজরত আয়েশার সমর্থনে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। আলির জন্যে তা ছিল বিরাট স্বস্তির ব্যাপার। কিন্তু আলি জানতেন না যে, আসলে হজরত মুয়াবিয়া সিরিয়ায় আলিকে লৌহকঠিন খাঁচায় বন্দী করার ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মুয়াবিয়া রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে, আলি ইচ্ছে করলে উসমানকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতালোভী আলি তা না করে হত্যাকারীদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং বাহুবলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জামাল যুদ্ধে আলি যখন আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, মুয়াবিয়া তখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। হজরত মুয়াবিয়া সারা পৃথিবীতে উমাইয়াবংশীয় শাসন কায়েম করতে চান। তার আগে হাশেমি বংশের নবি মুহাম্মদের (দঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী হজরত আলির জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেয়া চাই।

হজরত উসমানের সুদীর্ঘ বারো বছরের অপশাসনে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, উসমান হত্যার মধ্য দিয়ে তা আরও দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। হজরত আলির রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব এই সর্বপ্রথম কোরায়েশবংশের হাশেমি গোত্রের নবি মুহাম্মদের রক্ত-সম্পর্কের একজন খলিফা পেলো। আলি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু দক্ষ রাজনীতিবিদ মোটেই ছিলেন না। ক্ষমতায় বসেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আলির চোখে ভেসে ওঠে মুসলিম সাম্রাজ্যের এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনে পড়ে সেই কালো রাত্রির কথা, যে রাতে হজরত ওমর তাঁর দরজার সামনে এসে হাঁক দিয়ে

বলেছিলেন: 'কে আছো ঘরের ভেতর, বেরিয়ে এসো, আর আবুবকরের খেলাফত গ্রহণ করো, অন্যথায় মানুষসহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো।' হজরত ফাতেমা বের হয়ে বলেছিলেন, 'আমার ঘরে নবিজির বিশ্বস্ত কয়েকজন সাহাবি মেহমান আছেন। ওমর, তুমি কি নবিজির মেয়ের ঘর আগুনে পোড়াতে চাও, যার হাতে আছে বেহেস্তের চাবি?' উল্লেখ্য, আবুবকরের খেলাফত গ্রহণ করার পর থেকে, ফাতেমার ঘরে রাতে কিছু লোক নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতেন। তারা ফাতেমা ও আলির মতো আবুবকরের খেলাফত অস্বীকার করেছিলেন। ঐ ঘটনার পর হজরত ফাতেমা তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে রাতের আঁধারে গোপনে দাফন করা হয়, যাতে হজরত ওমর তাঁর জানাজায় আসতে না পারেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত ফাতেমা ইন্তেকাল করেন।

রাজ্যের সর্বত্রই হজরত আলি দেখতে পান মদ্যপায়ী, উচ্চাভিলাসী, শরিয়া বিরোধী, স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী, নারী-আসক্ত, ভোগ-বিলাসী, শাসকদের চেহারা। আলি একসাথে সকল প্রাদেশিক গভর্নরের পদ 'অবৈধ' ঘোষণা করে দেন। রাগের বশে, আবেগের বশে, অথবা তাঁর ও তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতেমার ওপর আবুবকর, ওমর ও ওসমান কর্তৃক সারা জীবনের অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবেই হোক, খলিফা আলির এ কাজটি ছিল অদূরদর্শিতার প্রমাণ। বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নর তৃতীয় খলিফা উসমান হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করাতো দূরের কথা, আলির খেলাফতই মেনে নিতে রাজি হলো না। 'উসমান হত্যার বিচার' ইস্যুটি ছিল হজরত মুয়াবিয়ার চক্রান্ত, আলির জন্যে এক মরণফাঁদ। মুয়াবিয়ার কাছে 'সবার ওপরে ধন আর ক্ষমতা সত্য' -এর উর্ধ্বে কিছুই ছিল না। হজরত মুয়াবিয়াই নবি মুহাম্মদের (দঃ) ইসলাম সৃষ্টির গোপন রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মুয়াবিয়া ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) রাজনৈতিক সচিব। তাই রাজনৈতিক ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফসল সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছিলেন। মুয়াবিয়া কোনোদিনই মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম ধর্ম' গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর (মুহাম্মদের) মাস্টার মাইন্ডেড ছল-চাতুরী, ভণ্ডামি, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ভালভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। আর আজ সেই দক্ষতাই মুহাম্মদের (দঃ) শেষ বাতিটি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে মুয়াবিয়া কাজে লাগাতে উদ্দ্যত হয়েছেন। সারা মুসলিম জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উসমান হত্যায় জড়িত মিশর, মক্কা,

কুফাসহ বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীগণ হজরত আলিকে পরিস্কার হুমকি দিয়ে বসলো, যদি উসমান হত্যার বিচার করা হয়, তাহলে আলিকেও উসমানের মতো বড়ই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। আলি দেখলেন তিনি আজ সাত-পাঁকে বাঁধা পড়ে গেছেন। তলোয়ার দিয়ে রক্তের হুলি খেলা যে আলির নেশা, যে আলি মুহাম্মদের (দঃ) সহচরী হয়ে ৯৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে 'আলি হায়দার', 'সাইফুল্লাহ', 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবসমূহ পেয়েছিলেন সে আলী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বড়ই ক্লান্ত। আজ মানুষের রক্তাসক্ত, আলির মাতাল তরবারি চায় একটু বিরতি, শান্তির একটু নিঃশ্বাস। কিন্তু তা তো হবার নয়। ক্ষমতা আর রক্ত যে একে অপরের সম্পূরক সে কথা বুঝতে আলির মোটেই দেরি হলো না।

এখানে হজরত মুয়াবিয়ার জীবনের বিবিধ কার্যাবলী ও মুহাম্মদ (দঃ) বংশের হজরত আলির সাথে তাঁর শত্রুতার কারণ বুঝার প্রয়োজনে মুয়াবিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া ভাল। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন সাহাবি হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার জারজ সন্তান। আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার বিবাহের তিন মাস পরে মুয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হিন্দা ছিলেন একজন 'বেশ্যা'। উর্দুভাষী একাধিক ঐতিহাসিক, হিন্দার চারিত্রীক বর্ণনায় 'বেশ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সূত্রানুযায়ী হিন্দা, বেশ্যা না হলেও তিনি যে বহু-পুরুষগামী মহিলা ছিলেন এবং মুয়াবিয়া যে তার জারজ সন্তান তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত আয়েশার (রাঃ) উক্তিতে। শাম ইবনে মুহাম্মদ কালভি (রঃ) তাঁর 'কেতাবে মোসাব' বইয়ে লেখেন- হজরত হাসান (রাঃ) একদিন ব্যঙ্গ করে হজরত মুয়াবিয়াকে বলেন, 'তোমার কি মনে আছে তোমার আসল পিতা কে?' মুয়াবিয়া কর্তৃক হজরত আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবিবা (মুয়াবিয়ার বোন ও নবি মুহাম্মদের স্ত্রী) আয়েশাকে আস্ত একটি ছাগল রান্না করে 'সদকা' হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, 'এর অর্থটা কি?' উত্তরে উম্মে হাবিবা বললেন, 'উসমান হত্যার পুরুস্কার, তোমার ভাই মুহাম্মদ খলিফা উসমানকে খুন করেছিল'। আয়েশা অভিশাপ দিয়ে বলেন- 'বহু-পুরুষগামী হিন্দার মেয়ের ওপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক'। এর পরে আয়েশা যতোদিন জীবিত ছিলেন, উম্মে হাবিবা ও তাঁর মা হিন্দাকে নামাজ শেষে অভিশাপ দিয়েছেন। হিন্দা ইসলামের ইতিহাসে নবিজির চাচা হজরত হামজার

(রাঃ) কলিজা ভক্ষণকারী বলেও পরিচিত! ইবনে আবি আল হাদিদ তাঁর 'নাহজুল বালাগা' (ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ১৩০) বইয়ে উল্লেখ করেন, মুয়াবিয়ার জন্মদাতা হিসেবে সম্ভাব্য চারজন পিতার নাম লোকমুখে শুনা যায়; তারা হলেন: আবি ইবনে ওমর বিন মুসাফির, ওমর বিন ওলিদ, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সাবাহ (এক ইথোপিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ)। একই বক্তব্য পাওয়া যায় 'রাবিউল আবরার' (ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ৫৫১) কেতাবে আল্লামা হজরত জামাকশারির লেখায়। তবে যেহেতু আবু সুফিয়ানের, উৎবা নামে সর্বজন স্বীকৃত আরেকজন জারজ সন্তান ছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বিয়ের আগে হজরত আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার দৈহিক সম্পর্কের ফসল হজরত মুয়াবিয়া। মুহাম্মদের (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নিজ পরিবার ও গোত্রের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু সুফিয়ান পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিজের ও মুহাম্মদের (দঃ) মধ্যকার শত্রুতা, কোরায়েশ বংশের অগণিত মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশটি বছর যে ছেলেটাকে আদরে আহ্লাদে কেউ এতোটুকু কটু কথা বলেনি, সেই হাশেমি বংশের একটা এতিম ছেলের হাতে উমাইয়া বংশের একি করুণ পরাজয়! আবু সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের মন থেকে সেই পরাজয়ের গ্লানি কোনোদিনই মুছে যায়নি। মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে, সরকারি উচ্চপর্যায়ে চাকুরি (সেক্রেটারি অব স্টেইট) দেয়ার অঙ্গিকার নিয়ে আবু সুফিয়ান ছেলে মুয়াবিয়াকে 'ইসলাম ধর্ম' গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে রাজি না হলেও পরে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মুয়াবিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, চতুর রাজনীতিবিদ। তার অধীনেই মুসলিম সৈন্যগণ ত্রিপলী, আরমানিয়া, সাইপ্রাসসহ অনেক অঞ্চল দখল করে ভারত ও চীন দখল করতে চেয়েছিল। হজরত আলি তা ভাল করেই জানেন। আলি ভাবলেন, মদিনার অলিতে-গলিতে উসমান হত্যার আহাজারি, আকাশে-বাতাসে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামতে না থামতেই আয়েশার বিরুদ্ধে করতে হলো 'জামাল যুদ্ধ'। রক্তক্ষয়ী জামাল যুদ্ধে দশ সহস্রাধিক মানুষের প্রাণনাশের পরপরই, মুয়াবিয়ার সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমুচিৎ হবে না। হজরত আলি হামদান প্রদেশের গভর্নর, বনি-বাজিলা প্রধান হজরত জারিরকে, মুয়াবিয়ার প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়ে সিরিয়া পাঠালেন- 'সিরিয়ার গভর্নর যেন অনতিবিলম্বে হজরত আলির খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন।' হজরত মুয়াবিয়া বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

সুচতুর মুয়াবিয়া হজরত জারিরকে এমন এক মায়াবীনি মন-মাতানো আতিথিয়েতা দিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন যে, হজরত জারির (রাঃ) ভুলেই গেলেন, তিনি কী জন্যে এসেছিলেন। মুয়াবিয়ার চোখ-জুড়ানো রঙিন প্রাসাদে, চিত্তরঞ্জন করে হজরত জারির (রাঃ) ফিরে আসলেন দীর্ঘ তিন মাস পরে সম্পুর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে। এসে বললেন- 'মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত আলির সাথে রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতে রাজি নন, যতক্ষণ পর্যন্ত না হজরত উসমানের হত্যাকারীর ফাঁসি হবে'। তিনি আরও বললেন- 'এখনও হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল দামেস্কের মসজিদের মিনারে ঝুলছে। সিরিয়ার আপামর জনসাধারণ আল্লাহর নামে জীবনমরণ কসম খেয়েছে, যতদিন পর্যন্ত হজরত উসমানের হত্যাকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দামেস্কের মসজিদে হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তার স্ত্রীর কাটা আঙুল ঝুলন্ত থাকবে'। সাহাবি হজরত মালিক আল আশতার (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে হজরত জারিরকে বললেন- 'তুমিতো আমাদের প্রস্তাব মুয়াবিয়াকে আদৌ দাওনি। দীর্ঘ তিন মাস মুয়াবিয়া তোমাকে তার রাজপ্রাসাদে চিত্তবিনোদনে মত্ত রেখে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে'। এই সেই সাহাবি হজরত মালিক আল আশতার (রাঃ) যিনি অস্ত্রের মুখে হজরত আয়েশার দুই ভগ্নীপতি হজরত তালহা (রাঃ) ও জোবায়েরকে (রাঃ) হজরত আলির খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ভয়ঙ্কর মালিক আল আশতারকে হজরত জারির (রাঃ) ভালভাবেই চেনেন। আলি যখন হজরত তালহা (রাঃ) ও জোবায়েরকে (রাঃ) তাঁর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেন, মালিক আল আশতার তখন তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত শাণিত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রচণ্ড সাহসী বীর হজরত তালহা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে নবিজির প্রাণরক্ষার্থে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের তীর বর্ষা নিজের বুকে-পিঠে গ্রহণ করেছিলেন, মালিক আল আশতারের তলোয়ারের সামনে, আলির খেলাফত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মেনে নিলেন। সাহাবি জোবায়েরকে জিজ্ঞাসা করায় যখন তিনি নীরব রইলেন, মালিক আল আশতার সিংহের মতো গর্জে উঠে হজরত আলিকে (রাঃ) বললেন- 'আলি (রাঃ), জোবায়েরকে আমার কাছে আসতে দিন, তার মাথাটা তলোয়ারের এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলি।' উল্লেখ্য; ইসলামের চার খলিফা নির্বাচনে প্রতিবারই একাধিক খলিফা পদপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কোনোবারই গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারচুপি ও

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের সময় থেকে। হজরত আলির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

হজরত জারির বুঝতে পারলেন এখানে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। তিনি কুফা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান এবং হজরত মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে যোগদান করেন। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট ছলচাতুরি দেখে হজরত আলি নিশ্চিত হলেন, বিষয়টার ফয়সালা অস্ত্রের মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং আবারও যুদ্ধ, আবারও রক্তপাত। আলির জেষ্ঠ্য পুত্র হজরত হাসান, সিরিয়া আক্রমণ করতে পিতাকে নিষেধ করলেন। হাসান বললেন- 'পিতা, প্রয়োজন হলে খেলাফত ছেড়ে দিন, মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যাবেন না, মুয়াবিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক মানুষ! এ যুদ্ধে মুসলিম-জাহানের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর কতো রক্তপাত, আর কতো প্রাণহানি?' হজরত আলি বললেন- 'আজ যদি মুয়াবিয়াকে ছাড় দেওয়া হয়, যদি তার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে না পারি, অল্পদিনের মধ্যেই সারা মুসলিম বিশ্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে বসবে।' আলি বিলম্ব না করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। আলির ইচ্ছে হলো উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করে সিরিয়া দখল করবেন। তাই মেসোপটামিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে একদল সেনাবাহিনী অগ্রীম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেনাদলটি আল ফোরাত নদীর পশ্চিম কিনারে এসে মুয়াবিয়ার একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে তারা মেসোপটামিয়ান ফিরে যায়। এদিকে হজরত আলি মূল সৈন্যদল নিয়ে টিগরিস হয়ে পশ্চিমে মসুল এলাকার ফাঁড়ি পথে মেসোপটামিয়ান অতিক্রম করে আল-ফোরাত নদীর উপরিভাগে 'আর-রাককা' নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। আর-রাককা 'বালিক' ও 'আল-ফোরাত' নদীর মোহনা স্থান। অবাক বিস্ময়ে আলির সৈন্যদল লক্ষ্য করলেন নদীপাড়ে এক বিরাট মানববন্ধন তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মালিক আল আশতার শাণিত তরবারী উঁচু করে তাদেরকে আক্রমণ করার হুমকি দিলেন। জনতা ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছার পথে বেশ কয়েকটি জায়গায় হজরত আলির সৈন্যদলের সাথে মুয়াবিয়ার ছোট ছোট সেনাবহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। ৩৬ হিজরির জিলহাজ মাসে, হজরত আলি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার 'সিফ্ফিন' নামক স্থানে এসে মুয়াবিয়ার ১২০ হাজারের মূল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। ইতোমধ্যে আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজারে।

আলি বুঝতে পারলেন চতুর্দিকে ব্যারিকেড, নদী পারে পানিপথ বন্ধ, সুশৃংখলভাবে ১২০ হাজার সৈন্য মোতায়েন, এ সকল মুয়াবিয়ার বহুদিনের সুনিপুণ আয়োজন।

'সিফ্ফিন' ময়দানে এসে আলি (রাঃ) বিনা যুদ্ধে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি আদায়ের সকল প্রকার শেষ চেষ্টা করলেন। উসমান হত্যার বিচার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে মুয়াবিয়ার কাছে প্রতিনিধিদল পাঠালেন, নিজেও তার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। কিন্তু তাঁর এই কোমলমতি আচরণ তীক্ষ্ম বুদ্ধির মুয়াবিয়ার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলো না। মুয়াবিয়া মনে মনে বললেন, আলি, আয়েশার বসোরা দেখেছো, মুয়াবিয়ার সিরিয়া দেখো নাই। আলির প্রতিউত্তরে মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন- 'উসমান হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র থেকে সরানো হবে না।' মুয়াবিয়া জানেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আলির পক্ষে সম্ভব নয়। আলিও জানেন তার নিজের সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ লোকই উসমান হত্যায় জড়িত। আলির সেনাপতি মালিক আল আশতার ও মুহাম্মদ বিন আবুবকর তাদের অন্যতম। উসমান হত্যাকারীদেরকে মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করা আর প্রকারান্তরে তাঁকে খলিফা মেনে নেয়ারই সমান। সাতপাকে বাঁধা পড়া হজরত আলি এবার নিশ্চিত হয়ে গেলেন, এখানেই হবে তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হয়তো সূচনা করবে ইসলামের ভিন্নমুখী এক নতুন ইতিহাস।

৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস (জিলহজ ৩৭ হিজরি) সৈন্য মোতায়েন, সংলাপ বিনিময়, ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধে অতিবাহিত হলো। মে মাসে বিশাল প্রশস্ত সিফ্ফিন মাঠ, ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনাদলের পদাঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠলো। বর্শা আর তরবারির ঝনঝনানী শব্দে, রণবাদ্যের হুংকারে স্তব্ধ হয়ে যায় জগতের পশুপক্ষী, জীবজন্তুর কলরব। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর ১২০ হাজার সৈন্যকে ৮ জন সেনাপতি দিয়ে ৮ টি দলে বিভক্ত করলেন। অপরপক্ষে আলিও তাই করলেন। যুদ্ধের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, এই বিশাল আয়োজন দেখে উভয় পক্ষই আতঙ্কিত হলো, এই বুঝি ইসলাম ও মুসলিম জাতি বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়! কেউই পুরোদমে যুদ্ধ শুরু করতে চাইলো না। বিচ্ছিন্নভাবে সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ চললো পুরো একমাস। আসলো জুন, ৩৭ হিজরীর পবিত্র মোহাররম মাস, উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি চাইল। হজরত আলি পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টার সমাধান চাইলেন। চতুর মুয়াবিয়া বিরতির

সময়টাকে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর কাজে লাগালেন। আলির সৈন্যদলে যারা উসমান হত্যার বিচার কামনা করে, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আলি সত্যিকার অর্থে উসমান হত্যার বিচার করবেন না, কারণ হত্যাকারীরা আলির আত্মীয়, আলি তাদেরকে চিনেও না চেনার ভান করেন। উসমান হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করাতো দূরে থাক বরং অনেককে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পুরস্কৃত করেছেন। আলির কিছু লোক তাঁর ওপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে সিরিয়ার সংলাপ প্রতিনিধিদল আলিকে প্রশ্ন করেন- 'আলি, আপনার দৃষ্টিতে খলিফা উসমানকে হত্যা করা কি ন্যায়-সঙ্গত ছিল?' আলি জবাব দেন- 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবো না।'

মুয়াবিয়ার প্রপাগাণ্ডার বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করলো। আলির সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি দেখলেন এখান থেকে বিনা যুদ্ধে পরিত্রাণ পাওয়ার সকল পথ মুয়াবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরবি সফর মাসে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন উভয় পক্ষে শতশত প্রাণহানি ঘটতে থাকলো। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) একাই একদিনে, প্রতিবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে এক এক করে ৪০০ জন শত্রুর মস্তক কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুয়াবিয়ার একজন সৈন্য আলির পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল। আলি তলোয়ার দিয়ে তার পেট বরাবর এমন শক্ত কোপ মেরেছিলেন, চোখের পলকে লোকটির শরীরের নীচভাগ ঘোড়ার পিঠে রেখে উপরিভাগ মাটিতে পড়ে যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চললো। দিনে দিনে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। তবে তুলনামূলকভাবে মুয়াবিয়ার দিকে হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন, বিজয় নিকটবর্তী। মুয়াবিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মুয়াবিয়ার সেনাপতি সাহাবি হজরত আমর ইবনে আস (রাঃ) তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতারণার অস্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। মুয়াবিয়ার অনুমতি নিয়ে হজরত আমর ইবনে আস (রাঃ) তার সৈন্যবাহিনীর বর্শার ফলকে ৫০০ কপি কোরআন গেঁথে দিয়ে উড়াতে নির্দেশ দিলেন। আলির সেনাবাহিনী থমকে গেল, বিষয়টা কি? আমর ইবনে আস বললেন- 'আর রক্তপাত নয়, উভয় পক্ষের অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়ে গেছেন। আমরা অস্ত্র নয়, কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা চাই'। হজরত আলি তাঁর সিপাহীদেরকে

নিষেধ করে বললেন- 'সাবধান মুয়াবিয়ার প্রতারণায় কর্ণপাত করো না, এ নিছক প্রতারণা বৈ কিছু নয়'। বেশকিছু সৈন্য আলির কথা অমান্য করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার দৌঁড়ে এসে বললেন- 'আল্লাহর কসম, আরো কিছুক্ষণ সময় তোমরা ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আমাদের অনিবার্য।'

এক নাগাড়ে একমাস যুদ্ধ করে অবশ ক্লান্ত দেহের আলির একদল সৈন্য হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বললো- 'আমরা অস্ত্রের চেয়ে কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা শ্রেষ্ঠ মনে করি।' চতুর্দিক দিক থেকে 'আল্লাহর আইন, কোরানের ফয়সালা' চিৎকার ধ্বনি শুনা গেলো। আলি পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার দলের কিছু লোক, এই বলে আলির ওপর অভিযোগ আনলো যে, আলি ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে মুসলিম জাতিকে এ যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন এবং তিনি উসমান হত্যার বিচার মোটেই চান না। আলিকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো। বনি-কিন্দা প্রধান হজরত আল-আশাত মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞেস করেন: '৫০০ খানি কোরান বর্শার মাথায় গাঁথার মানেটা কি? মুয়াবিয়া বললেন- 'আল্লাহর ইচ্ছের ওপর, তাঁর কোরানে লিখিত সমস্যার সমাধান খোঁজা আমাদের উচিৎ।' কোরানকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেও মুয়াবিয়া কোরানিক সমাধানের প্রস্তাব দিলেন। বললেন- 'উভয় পক্ষ নিজ নিজ দল থেকে একজনকে প্রধান করে মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হউক। মধ্যস্থাতাকারী দুই প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।' আলির লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন: 'আমরা মানি, আমরা মানি।' বৈঠক বসার আগে হজরত মুয়াবিয়া অতি গোপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেললেন। হজরত উসমানের সময়ের মিশরের গভর্নর হজরত আমরকে বললেন-

- 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত যাই হোক তুমি মিশর ছাড়বে না।
- যদি মিশর আলির দখলে চলে যায়?
- সর্বপ্রথম মিশর আক্রমণ করা হবে, তোমরা প্রস্তুত থেকো।

আলির পক্ষে মধ্যস্থতাকারী দলপ্রধানও মুয়াবিয়ার তৈরি। আলি প্রস্তাব করলেন, দলপ্রধান হিসেবে প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম। আলির লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা প্রস্তাব করলো মুয়াবিয়ার সমর্থক হজরত আবু-মুসার (রাঃ) নাম। আলি বললেন- 'সর্বনাশ, আবু মুসা একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তাকে আমি কুফার অস্থায়ী গভর্নর করে

পাঠিয়েছিলাম। সে আমার খেলাফত অস্বীকার করায় এই সেদিন আমি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি'। এক সময়কার হযরত আলির (রাঃ) অন্ধসমর্থনকারী কুফাবাসীও আজ আলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা বললো- 'আলি তোমারই কারণে আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধে কুফার হাজার হাজার পুরুষ খুন হয়ে শত শত নারী বিধবা হয়েছে'। আলি বাধ্য হলেন মুয়াবিয়ার সাথে শান্তি চুক্তি করতে।

৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (৩৭ হিজরির রমজান মাস) ঐতিহাসিক 'আলি-মুয়াবিয়া' শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সত্তর হাজার মানুষের রক্তে আজ স্যাত স্যাতে পিচ্ছিল সিফ্ফিনের বিশাল সবুজ মাঠ। হজরত আলির ২৫ হাজার আর হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের ৪৫ হাজার মানুষের গলাকাটা লাশ পড়ে রইলো সিফ্ফিন প্রান্তরে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেখতে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বাসরা, মিশরসহ রাজ্যের সকল প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো। কোনো এক গোপন রহস্যে হজরত মুয়াবিয়া, 'সন্ধিপত্র' লেখার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে হজরত আলির পক্ষকে অনুরোধ করলেন।

তারা সন্ধিপত্র তৈরি করতে থাকুন, ইতিমধ্যে আসুন দেখা যাক, যুদ্ধের মাঠে ও যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে কে, কোথায়, কী বলেছিলেন। হজরত আম্মার (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ আলির একদল সৈন্যকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন-
'বন্ধুগণ, তোমরা কি শুনো নাই, নবিজি জীবিতকালে বহুবার বলেছেন, যে লোক আমার আলিকে দুঃখ দেবে, মনে করো সে আমাকেই দুঃখ দিল, যে লোক আমার আলির বিরুদ্ধাচরণ করবে, মনে করো সে আমারই বিরুদ্ধাচারণ করলো। তোমরা কি জানো না এই মুয়াবিয়া একজন বিধর্মী, ইসলামের শত্রু, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রেমে ইসলাম গ্রহণ করে নাই? তার রাজপ্রাসাদে অমুসলিম নারীদের আনাগোনা, বিধর্মীদের সাথে তার মেলামেশা। আমরা জেহাদ করছি নবিজির শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাতে।'

হজরত আম্মারের (রাঃ) কথা সম্পূর্ণই সত্য। মুয়াবিয়া এবং তাঁর পিতা আবু-সুফিয়ান স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ঘটনাটি ছিল এরকম: মক্কা বিজয়ের পরপরই নবি মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানকে তাঁর একটি খাস কামরায় তলব করলেন। বুদ্ধিমান

আবু সুফিয়ান ঘরে ঢুকেই ঘরের পরিবেশ দেখে অনুমান করতে পারলেন, কী জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে? মুহাম্মদের (দঃ) ডানে বামে দুইজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের একজন। ইবনে আব্বাসের চাদরের নিচে তলোয়ার লুকানো। কোরায়েশ নেতার বুঝতে বাকি রইলো না, মুহাম্মদ (দঃ) তাকে কী প্রশ্ন করবেন। মাথা দেবে, না মুহাম্মদের অধীনতা মেনে নেবে? আবু সুফিয়ান অধীনতা মেনে নিলেন। ঘরে গিয়ে পুত্র মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। মুয়াবিয়া বললেন- 'এ কী বলছেন আপনি? এই সেদিন বদরের যুদ্ধে আপনার চোখের সামনে মুহাম্মদ আমার দুই ভাইকে খুন করেছেন। আপনি নিজের হাতে আপনার ছেলেগণকে দাফন করেছেন। পুত্রশোকে মা আমার পাগলবেশে মক্কার অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করবো না, আমি এর প্রতিশোধ নেবো'। আবু সুফিয়ান বললেন- 'শত্রুকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার দলে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ, প্রতিশোধ নেয়ার সময় একদিন আসতেও পারে'।

হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুয়াবিয়ার সৈন্যদলের এক সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ, দ্বিতীয় খলিফা সাহাবি হজরত ওমরের (রাঃ) সেই সন্ত্রাসী পুত্র, যিনি উসমানের শাসনামলে, তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনের আসামী, যাকে জনতার আদালতে হজরত আলি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আর উসমান তাকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছিলেন। আজ সিফফিনের ময়দানে সাহাবি হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র ওবায়দুল্লাহ ও সাহাবি হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র মুহাম্মদ একে অপরকে বধ করতে অস্ত্র হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর সৈন্যদেরকে বলেন-

'আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার সমর্থক সিপাহী সাথীরা, আমার চক্ষের সামনে হজরত উসমানের খুনীকে (মুহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে ইঙ্গিত করে) স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যে সকল খুনীদের বিচার আলি করতে পারেননি, আজ এই মাঠে তাদেরকে হত্যা করে আমরা খলিফা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেবো, আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো।'

ওবায়দুল্লাহর সেই সাধ পুরণ হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই আলির সৈন্যের তীরের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহর মরদেহ কেউ না তুলেই পলায়নের পথ খুঁজছিল। ওবায়দুল্লাহ যা বলছিলেন, তা আংশিক সত্য। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর, উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন কিন্তু আলির ৯০ হাজার সৈন্যদলের সবাই উসমান হত্যার পক্ষে ছিলেন না। সত্য কথা

হলো, মুয়াবিয়ার দলেও উসমান হত্যায় জড়িত অনেক লোক ছিলেন। মুয়াবিয়া অতি কৌশলে কিছু লোককে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে, যাকে যেভাবে পারেন লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং হজরত আলি (রাঃ) উসমান হত্যার বিচার করলেও সিফফিন যুদ্ধ এড়াতে পারতেন না।

মোহরম মাসে যুদ্ধ বিরতির সময়ে মুয়াবিয়ার এক যোদ্ধাকে হজরত হাশিম ইবনে উৎবা (রাঃ) বলেন-

'তোমাদের হয়েছেটা কী? তোমরা কেন বুঝতে পারছ না, উসমানকে কেন আমরা হত্যা করেছি? উসমান নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কোরান লিখিয়েছেন। নবি পরিবার ও কোরানের অবমাননা করেছেন, আগুন দিয়ে কোরান পুড়িয়েছেন। যারা জালিম খলিফা উসমানকে হত্যা করে নবির শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা তো নবির বিশ্বস্ত লোক। তোমরা কি নবি পরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে'?

হজরত আলি একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবির নাম উল্লেখ করে তাদের চারিত্রিক পরিচয় দিলেন। তন্মধ্যে মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনে আস, হজরত আবি মুয়্যাত, হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ ইবনে-আবি সারাহ, ও হজরত হাবিব মাসলামাহ অন্যতম। আলি বললেন-

'মুয়াবিয়া বিধর্মী, ওবায়দুল্লাহ সর্বজন নিন্দিত সন্ত্রাসী-খুনী, আমর ইবনে আস লুটেরা ডাকু স্বৈরাচারী, ইবনে আবি সারাহ নিজে কোরান লিখে এখনো কোরান আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে না, আবি মুয়্যাত ও হাবিব মাসলামাহ্ দেশদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক। তোমরা সবাই এদেরকে না চিনলেও আমি ছোটবেলা থেকে এদেরকে চিনি, জানি। তোমরা বিশ্বাস করো, এ জেহাদ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের জেহাদ, এ জেহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জেহাদ।'

শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার মানুষের প্রাণনাশের পর যুদ্ধ থামলো। এবার সন্ধিপত্র লেখা হবে। মক্কা, মদিনা, কুফা, সিরিয়ার বড় বড় প্রবীণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। লেখক লিখলেন- 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আমিরুল মোমেনিন হজরত আলি (রাঃ) ইবনে আবি তালিব ও হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান…' থামুন! বজ্রকণ্ঠে আমর বিন আস লেখককে থামিয়ে দেন। কী ব্যাপার? লেখক জিজ্ঞেস করেন। আমর বিন আস বলেন- 'আমিরুল মোমেনিন হজরত

আলি (রাঃ) লাইনটি কেটে ফেলা হউক। আলি তোমাদের আমিরুল মোমেনিন হতে পারেন, আমাদের নন'। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলির বুকটা ছ্যাত করে ওঠে! যেন একটা বিষ-মাখানো তীর তাঁর বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আলি বুঝলেন, মুয়াবিয়া বহুদিনের পুরনো একটি ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটালো। সেদিন মুহাম্মদ (দঃ) ও কোরায়েশদের মধ্যকার ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়া-সন্ধি কালে একই ঘটনা ঘটেছিল। ঐ দিন কলম ছিল আলির হাতে। আলি লিখছিলেন, 'পরম করুণাময় আল্লার নামে, এই মর্মে আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও ...' কোরায়েশ প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর ধমক দিয়ে বলেছিলেন, থামুন! 'আল্লাহর রসুল কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখা হউক, মুহাম্মদ তোমাদের রসুল হতে পারেন, আমাদের নয়'। হজরত আল আহনাফ (রাঃ) বললেন, 'দোহাই আপনাদের, হজরত আলির নাম থেকে 'আমিরুল মোমেনিন' উপাধিটি মুছে ফেলবেন না, নবি বংশকে জগত থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র'। নবিজির কথা মনে পড়ায় আলির চোখের জলের বাঁধ ভেঙে যায়। ফোটা দু-এক অশ্রু গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিল। জীবনে নবিজি দুজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, একজন আলি, আর একজন হজরত ফাতেমা (রাঃ)। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, 'হুদাইবিয়া-সন্ধি' কালে নবিজি যেভাবে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রসুল কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখা হউক' ঠিক সেভাবেই আলি বললেন- 'ঠিক আছে 'আমিরুল মোমেনিন' কথাটি কেটে দিয়ে 'আলি ইবনে আবু তালিব' লেখা হউক।' উভয়পক্ষের প্রতিনিধি প্রধানগণ পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত না করেছেন, ততদিন পর্যন্ত আলির লোকজন আলিকে ও মুয়াবিয়ার লোকজন মুয়াবিয়াকে তাদের খলিফা হিসেবে মেনে চলবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না। কমিটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সময় নিলেন কমপক্ষে ছয় মাস। এবার নিজ নিজ লাশ গ্রহণের পালা। মানুষের রক্তে পিচ্ছিল মাঠ, হাটতে গিয়ে অনেকেই বারবার হোঁচট খেল। উভয়পক্ষের সত্তর হাজার মানুষ আর গৃহে ফিরে এলো না। স্বামীহারা বিধবাদের আর্তচিৎকার, পিতৃহারা শিশুদের ক্রন্দনরোল শুনা গেল আরব দেশের ঘরে ঘরে বহুদিন।

কয়েক মাস পর আজ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি কোরান নিয়ে বসেছেন কোরানিক ফয়সালা দিতে। হায়রে জগতের অভাগা মুসলমান! মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি প্রধান সিংহরূপী আমর ইবনে আস-

এর সামনে, আলির প্রতিনিধি প্রধান আবু মুসা 'মুষিক ছানা'-র সমান। প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আবু মুসাকে ধূর্ত আমর ইবনে আস সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন- 'সাবধান আবু মুসা, এই ধূর্ত মানুষটা মিশরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে খলিফা উসমানও তাঁকে ভয় পেতেন। খলিফার নিযুক্ত মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদকে বাধ্য করেছিল তার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে'। আমর ইবনে আস হজরত আবু মুসাকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। মুয়াবিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমর, আবু-মুসাকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেন। শাহি ভোজন ও আপ্যায়ন পর্ব সমাপন করে আমার ইবনে আস আবু-মুসাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি মনে হয় আলি কোনোদিন উসমান হত্যার বিচার করবেন?' আবু মুসা উত্তর দেন, 'উসমান হত্যাপূর্ব সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, আমি মনে করি এসব কিছুর জন্যে হজরত আলি ও মুয়াবিয়া সমভাবে দায়ী'। এ উত্তরটাই হজরত আমর ইবনে আস কামনা করেছিলেন। তারিখ ঘোষণা করে সমাবেশ ডাকা হলো বিচারকদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। সমাবেশে আমর ইবনে আস খুব নম্র ভাষায় বিনয় সহকারে অনুরোধ করলেন, আবু-মুসা যেন প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন। আবু-মুসা ঘোষণা দেন:

'আমারা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজ থেকে আলি ও মুয়াবিয়া উভয়ের খেলাফত অবৈধ ঘোষণা করা হলো। সাধারণ নির্বাচানের মাধ্যমে জনগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করবেন।'

তারপরই আমর ইবনে আস তার বক্তব্যে ঘোষণা দেন:

'আবু মুসার সাথে আমিও একমত। রাজনীতিতে আলি সম্পূর্ণই নতুন। খলিফা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর এখনও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের আইন প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। জাতি আজ এক অশুভ রাহুগ্রস্থ। এই সঙ্কটময় দিনে আমীরুল মোমেনীন হজরত মুয়াবিয়ার মতো একজন বিচক্ষণ, দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের প্রয়োজন'।

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো আবু মুসার মাথায়। গালি দিয়ে উঠলেন অশ্লীল ভাষায়। শুরু হলো কোরানের 'কালাম-যুদ্ধ'। দুনিয়ার যত অশ্লীল গালি আছে তারা ছুঁড়তে থাকলেন একে অপরের

প্রতি। আলির প্রতিনিধি দল চিৎকার করে তেলাওত করলেন কোরানের ৭ নং সুরা 'আল আলাফে'-র ১৭৫ নং আয়াত:

'আর তাদেরকে পাঠ করে শুনাও ওর বৃত্তান্ত, যাকে আমি আমার নির্দেশাবলী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে ওসব থেকে দূরে সরে যায়, আর শয়তান তার পিছু নিল, কাজেই সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়'।

আলির সমর্থকগণ মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে থাকলেন 'মুয়াবিয়া শয়তান! মুয়াবিয়া শয়তান!' অপরপক্ষে মুয়াবিয়ার লোকজন নিয়ে এলো ৬২ নং সুরা আল জুমুআ'-র ৫ ও ৬ নং আয়াত দুটো:

'যাদের তাওরাতের ভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার মতো, সে শুধু গ্রন্থরাজির বোঝাই বইছে। কত নিকৃষ্ট সে জাতির দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে। আর আল্লাহ অন্যায়কারীকে সৎ পথে চালান না, এবং বলো, ওহে, যারা ইহুদি-মত পোষণ করো, যদি তোমরা মনে করো যে, লোকজনকে বাদ দিয়ে তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

কোরান থেকে 'কালাম-যুদ্ধ' করতে করতে তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলেন না। সম্মেলন ভঙ্গ হয়ে যায়। শান্তি প্রদানে ব্যর্থ কোরান বুকে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরলেন। হজরত আলি কুফায় বসে সম্মেলনের এ সংবাদ শুনে খুবই আহত হলেন। আকাশ পানে দুহাত তুলে দীর্ঘ একটি দোয়া করলেন: 'হে দয়াময়, মহা-শক্তিমান প্রভু, তোমার সর্বনিকৃষ্ট গজব অর্পিত করো তাদের ওপর, বিশেষ করে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, আবুল আওয়ার আল সুলাইমি, আবি সারাহ, হাবিব ইবনে মাসলামাহ, আব্দুর রহমান বিন খালিদ, জাহাক বিন কায়েস আর অলিদ বিন উকবার ওপর।' আলির এই দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছিল কি না জানা যায়নি, তবে মুয়াবিয়ার কানে যথা সময়েই পৌঁছিল। মুয়াবিয়া জুমার নামাজের জন্যে খুতবায় নতুন কিছু আয়াত সংযোজন করতে তার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া সেদিন থেকে আইন করে প্রতি শুক্রবার খুতবায়, নবি পরিবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত হামজাহ, হজরত আলি, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হোসেনকে অভিশাপ দেয়া বাধ্যতামূলক করে দেন। হুজুর ইবনে আদি নামে একজন মুসলমান মুয়াবিয়ার এ আদেশ অমান্য করায় মুয়াবিয়া

তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ঘটনাটা হজরত মৌলানা আবুল আলা মওদুদি (রঃ)- তাঁর ‘খেলাফত ও মুলকিয়াত’ কেতাবের ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন (আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরছি):

“হুজর ইবনে আদি নবিজির প্রিয়ভাজন একজন ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে যখন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হজরত আলিকে ভর্ৎসনা ও অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়, মৃত্যু ভয়ে অনেকেই প্রতিবাদ করার সাহস পেলো না। কুফা নগরীতে হজরত হুজর ইবনে আদি (রাঃ) মুয়াবিয়াকে প্রত্যাখান করতঃ আলির (রাঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন। হজরত মুগিরা (রাঃ) কুফার গভর্নর থাকালীন সময়ে ইবনে আদির কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তখনো কুফায় খুতবায় অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু বসোরার গভর্নর হজরত জিয়াদের (রাঃ) আমলে কুফাকে যখন বাসারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, জিয়াদ (রাঃ) জুমআর খুতবায় হজরত আলিকে অভিশাপ দেয়া শুরু করে দেন। হুজর ইবনে আদি (রাঃ) এর প্রতিবাদ করলেন। একদিন ইবনে আদি (রাঃ) হজরত জিয়াদকে জুমার নামাজে দেরি করে না আসার জন্য সতর্ক করেন। হজরত জিয়াদ (রাঃ) ইবনে আদি ও তাঁর ১২ জন সঙ্গী-সাথীর ওপর মিথ্যা দেশদ্রোহিতা ও খলিফা মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করে মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া অভিযুক্ত ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেন। তাদের একজন সাথী হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়।” [৬০]

সম্মেলনের সংবাদ শুনে কুফার জনগণ কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হজরত আলি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপনের অজুহাতে ‘খুরায়েজ’ গোত্র সরাসরি আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলো। মধ্যপথে বিজয়ক্ষণে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আরেক দল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অনেকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ, শক্তিশালী শাসক। দিন যত যায়, মুয়াবিয়ার দল বড় ও শক্তিশালী হতে থাকলো আর আলির খেলাফতের প্রাচীর ভেঙে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকলো। কিন্তু আলি থেমে যাওয়ার পাত্র নন। মুহাম্মদের (দঃ) রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরায়। হজরত আলি মরণপণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। বিদ্রোহী চরমপন্থী মৌলবাদী ‘খুরায়েজ’ বা খারিজি

---

[৬০]. মৌলানা আবুল আলা মওদুদি (রঃ) ‘খেলাফত ও মুলকিয়াত’ ৪র্থ অধ্যায়

দল আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব একটি দল গঠন করলো। তারা আল্লাহর হুকুমত, কোরানের শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের মতে আলি ও মুয়াবিয়া দুজনই কোরান-বিরোধী শাসক। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত এরা আলির পক্ষেই ছিল। যেহেতু আলি, মুয়াবিয়ার মতো একজন বিধর্মীর সাথে শান্তি-চুক্তিতে দস্তখত করেছেন এবং রাজ্যে শরিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে হজরত আলিও একজন বিধর্মী।

খারিজি দল 'হারোরা' নামক একটি গ্রামে সমেবেত হয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দলে পরিণত হলো। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে, মানুষের গলা কেটে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, নির্বিচারে হত্যা করে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে দেয়। হজরত আলি দিন-রজনী কষ্ট করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাবলিগ করে কিছু লোককে পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের জন্যে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এখন তাঁর সামনে সিরিয়া আক্রমণের চেয়ে বিদ্রোহী খারিজি দলকে দমন করা আবশ্যক হয়ে গেছে। এদিকে খারিজিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, মুয়াবিয়া, আলি ও আমার ইবনে আস এই তিনজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না। তাদের শ্লোগান হলো 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর শাসন ছাড়া কোনো শাসন নাই। হজরত আলি তাদের কাছে লোক পাঠালেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোরানের খেলাফ কোনো কাজ করেন নাই। ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন- 'রাজ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে সকল আগে মুয়াবিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। আর এ জন্যে তোমাদেরকে আমার সাথে যোগদান করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যেহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি'। তারা পাল্টা উত্তর দিল, 'আলি আপনি কোরান অমান্যকারী, আপনিও কোরান বুঝেন না'।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী খারিজি দল, তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো বাগদাদ থেকে ১২ মাইল দূরে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে। বসোরাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগদান করলো। ১২ হাজার সদস্যের খারিজি জঙ্গি দল এখান থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র খাটি ইসলামি আইন বাস্তাবয়ন করবে। তাদের মূল মন্ত্র হলো রাজ্যের সকল সমস্যার ফয়সালা করবে একমাত্র কোরান। খারিজিদেরকে নিজ দলে আনতে সকল প্রকার চেষ্টা করে হযরত আলি (রাঃ) ব্যর্থ হয়ে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া আক্রমণের যাত্রা

পথে 'নোখাই'- এর উপত্যকায় এসে তাবু ফেল্লেন। আলির কাছে সংবাদ এল, সন্ত্রাসী খারিজিরা 'নাহরাওয়ান' -এর গভর্নর হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে খাববাব (রাঃ) কে মুরগিকাটা কেটে খুন করেছে, সাথে গভর্ণরের অন্তসত্তা ক্রীতদাসী ও বনু-তায়ি গোত্রের তিনজন নিরপরাধ মহিলাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে তারা হত্যা করেছে। বিষয়টা তদন্ত করতে আলি, হজরত হারিস ইবনে মুররাহকে 'নাহরাওয়ান' প্রেরণ করলেন। খারিজিরা ইবনে মুহরাহকেও হত্যা করে ফেলে। আলির সন্দেহ হলো এই মুহূর্তে সিরিয়া আক্রমণ করতে গেলে খারিজিরা কুফা দখল করে নিতে পারে। হজরত আলি খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ৩৮ হিজরির সফর মাসের ৯ তারিখ খারিজিদের সাথে আলির যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'যুদ্ধে নাহরাওয়ান' বা 'খাল-যুদ্ধ' নামে অভিহিত। আলির শক্তিশালী সৈন্যগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই খারিজিদের ১২ হাজার সদস্যকে তাদের তলোয়ারের নিচে কতল করতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৯ জন খারিজি পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। দুই বছর পর ৪০ হিজরিতে এই ৯ জনের তিন জন মিলে হজরত আলিকে মসজিদ প্রাঙ্গণে খুন করে। খারিজিদেরকে হত্যা করে আলি ভেবেছিলেন একটা আপদ গেলো, এবার সিরিয়া আক্রমণ করতে আর কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু বিধি বাম, আলির সৈন্যগণ আর কোনোমতেই যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। হজরত আলির বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভগ্ন হৃদয়ে কুফায় ফিরে গিয়ে আলি নিজের লোকজনকে ভীরু-কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়ে শান্ত হয়ে যান। এদিকে আলির এই নীরবতা হজরত মুয়াবিয়ার মোটেই ভাল লাগলো না। মুয়াবিয়ার দৃঢ় সংকল্প, 'আমি সেই দিন হবো শান্ত, যেদিন জগতের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো হাশেমি বংশের কেউ থাকবে না।'

মুয়াবিয়া জানেন এখন আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিংহ ও ছাগলের ব্যবধান। মুয়াবিয়ার বাবা আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ একদিন আসতেও পারে'। পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার এখনো কিছুটা বাকি। সুতরাং দুর্বল ছাগলের শক্তিও আলির আছে কিনা পরীক্ষা করতে মুয়াবিয়া দিকে দিকে ছোট্ট ছোট্ট সেনাদল পাঠালেন। আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে ঠিক যেভাবে নবি মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে একটি একটি করে আরব অমুসলিম গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে তাদের সহায়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর দখল করেছিলেন, মুয়াবিয়ার সৈন্যগণ সেভাবেই একের পর এক আলির প্রদেশসমূহ দখল করতে লাগলো। ইসলামের

জন্মভূমি ও মুহাম্মদের রাজধানী মদিনা আক্রমণ করার জন্যে সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত বাশারকে সেনাপ্রধান করে একটি শক্তিশালী দল মদিনা পাঠালেন। হজরত বাশারের সৈন্যবাহিনী দানবের মতো আক্রমণ করে বসে মদিনার মানুষের ওপর। তারা ক্ষণিকের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত মদিনাবাসী বিনা যুদ্ধেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। বিজয়ী বাশার মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন- 'মদিনার লোক, যদি আজ খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশ নিয়ে না আসতাম, আল্লাহর কসম মদিনার একটা পুরুষও আমি জীবিত রাখতাম না'। সেনাপতি বাশার, নবি মুহাম্মদ কর্তৃক বনি মুস্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমণের তুলনায় মদিনাবাসীর ওপর অশেষ করুণাই করলেন। সেদিন নবি মুহাম্মদ বনি মুস্তালিক গোত্রের একটা পুরুষকেও জীবিত রাখেন নাই, উপরন্তু তাদের সকল নারীদেরকে বন্দী করে তাঁর সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদিনা জয় করে বাশার, তার দল নিয়ে ইয়েমেন দখল করতে রওয়ানা হলেন। মদিনা পতনের সংবাদ পেয়ে হজরত আলি কাগুজে বাঘের মত কিছুক্ষণ গর্জন করলেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মদিনার মত একই পদ্ধতিতে আক্রমণ করে সেনাপতি বাশার ইয়েমন দখল করে নেন। তবে সেখানকার গভর্নর হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাধা প্রদান করায় তাঁকেও তাঁর ছোট ছেলেকে বাশার হত্যা করেন।

ছোট ছোট রাজ্যগুলো দখল করে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবার দৃষ্টি ফেললেন মিশরের ওপর। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা মিশরের গভর্নর আবুবকরের পুত্র মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে না। তাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজ হাতে তার বিচার করবো'। উল্লেখ্য, আবুবকর মদিনার খলিফা হওয়ার পর, হজরত আবু সুফিয়ান তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, 'এই আবুবকর তোমার দুই ভাইয়ের হত্যাকারী, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবে'। মুয়াবিয়ার সন্দেহ ছিল আলি কুফা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে মিশর রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আলির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং মিশর দখল করতে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর তেমন বেগ পেতে হলো না। আবুবকরের পুত্র মুহাম্মদকে বন্দী করে মুয়াবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। মুয়াবিয়া ঠাণ্ডা মাথায় মুহাম্মদকে বলেন, 'তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দেবো যা খলিফা উসমান হত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তরবারি ও বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়েও

কষ্টদায়ক'। হজরত মুয়াবিয়া আবুবকরের পুত্র মুহাম্মদকে শুকনো খড়কুটা দিয়ে মুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। মুয়াবিয়ার মনে আছে তার ভাই হানজালাকে খুন করা হয়েছিল এই বদর যুদ্ধে, যে যুদ্ধে আবু বকর, তার ছেলে মুহাম্মদ ও তার কন্যা আয়েশা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া সেদিন 'জামাল যুদ্ধে' আলির বিরুদ্ধে আয়েশাকে সাহায্য করেননি।

হিজরি ৪০ সনের রমজান মাস। খারিজি দলের তিনজন লোক হজরত আলিকে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদের পাশে অবস্থান নেয়। আলি মসজিদ থেকে বেরিয়ে, দ্বারপ্রান্তে আসামাত্র শাবির ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম, হজরত আলির মাথায় তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করে। কিছুদিন পরেই ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হজরত আলি কুফায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পিতৃশোকে কাতর আলির পুত্র হজরত হাসান (রাঃ) বাবার শোকসভায় বলেন- 'আজ এমন একটি পবিত্র মাসে নবিজির শ্রেষ্ট মানুষটিকে ঘাতকরা হত্যা করলো, যে মাসে কোরান শরিফ নাজিল হয়েছিল। যে মাসে হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ আকাশে তুলে নেন, যে মাসে হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীরা কোরান লেখককেই খুন করে ফেললো।' ৩৩ সন্তানের জনক, হজরত আলি জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী ফাতেমার মৃত্যুর পর আরো ৮ জন রমণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত আলি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন কিন্তু মুয়াবিয়া আলি পরিবারের পিছু ছাড়লেন না। হজরত হাসান (রাঃ) ঘরমুখো নিরীহ সরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, রাজনীতি বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না তবে নারীলোভী ছিলেন। হজরত আলির ভক্তগণের চাপে হাসান প্রথমে অস্বীকার করে, পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাফত গ্রহণ করেন। হাসানকে ক্ষমতা থেকে সরানো এখন হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) জন্যে মাটির পুতুল ভাঙার মতোই সহজ। এক নাগাড়ে দীর্ঘ তিন যুগের শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষ মুয়াবিয়া সবগুলো কাজ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। তিনি জানেন ধর্ম অশিক্ষিত ও দুর্বল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি সহজ অথচ শক্তিশালী অস্ত্র, তা দিয়ে উন্নতশীল রাষ্ট্রগঠন বা গণকল্যাণমুখী কোনো কাজ সাধন হয় না। তাই মাঝে-মাঝে তিনি প্রয়োজনে খুব সতর্কতার সাথে ধর্ম ব্যবহার করতেন কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ধারে কাছেও যেতেন না, বরং তিনি পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য বাইজানটাইন, আরমানিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনা

পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে ঐ সকল এলাকা দখল করে বহু খ্রিস্টান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বহুজাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজতন্ত্রের আদলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হজরত মুয়াবিয়া ধর্মনিরপেক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার জনগণ সবসময় তাদের নেতার পাশে থেকে সমর্থন দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হজরত আলির ধর্মতান্ত্রিক ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনাস্থা এনে দলে দলে মুয়াবিয়ার দলে আসতে থাকে। হজরত আলির একান্ত বাধ্য সৈন্যগণ, এমনকি নবি বংশের হজরত হাসানের আপনজন চুরি দুর্নীতি মিথ্যাচারে জড়িয়ে পড়েন। হাসান একদিন দুঃখ করে বলেন, এই দুনিয়ায় নবির আদর্শ কোরান হাদিসের অনুসারী একজন মানুষও কি বেঁচে নেই?

হজরত মুয়াবিয়া কুফা ও বসোরার অবস্থা পরখ করার লক্ষ্যে দুইজন গুপ্তচর পাঠালেন। একই সাথে কুফার অদূরে ৬০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে হাসানকে পত্রমারফত জানিয়ে দিলেন- "স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করো নইলে অস্ত্রের মাধ্যমে কুফা দখল করা হবে"। হাসান তাঁর পিতার রক্ষিত ৪০ হাজার সৈন্য থেকে হজরত কায়েসকে সেনাপতি করে **১২** হাজার সৈন্য মুয়াবিয়ার মুকাবিলায় সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পারস্যের প্রাচীন বিলাসবহুল কুসুম কাননে বিশ্রাম নেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হাসানের কাছে খবর এলো যে, সেনাপতি হজরত কায়েস আর বেঁচে নেই, সৈন্যগণ রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। পালিয়ে আসা হাসানের নিজের সৈন্য ও বিক্ষুব্ধ জনতা দৌড়ে এসে তাঁর রঙ্গমঞ্চের তাঁবু ছিড়ে ছিন্নভিন্ন করে তাদের মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। যে মখমল কার্পেটে বসে তিনি আয়েশে আরাম করছিলেন, একজন লোক হেঁচকা টানে কার্পেটটি উঠিয়ে নেয়, তারা হাসানকে কাফের মুশরিক বলে গালি দিতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত হাসান পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীরু ভীত হাসান, মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ দিলেন যে, তিনি বিনা যুদ্ধে দুটি শর্তে আত্মসমর্পন করতে রাজি আছেন। শর্তনামায় হজরত হাসান লিখলেন: **(এক)** 'কুফায় বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি রাজস্বখাতে জমাকৃত সোনা-দানা টাকা-পয়সা আমাকে দিতে হবে, যাতে বাকি জীবনটুকু কাটাতে আমাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়'। **(দুই)** 'আমার বাবা ও আমাদের পরিবারের নামে জুমার নামাজে খুৎবা পাঠে অভিশাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে'। মুয়াবিয়া ইচ্ছে করলে বলপূর্বক কুফা দখল

করতে পারতেন। কুফার সামান্য ধনের পিপাসা মুয়াবিয়ার নেই, আছে নবি মুহাম্মদের বংশের রক্তপান করার নেশা। বুদ্ধিমান মুয়াবিয়া অপ্রয়োজনে তাঁর একটি সৈন্যও হারাতে রাজি নন। হাসানের দুটো শর্তই তিনি মেনে নিলেন। তবে দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বললেন- 'রাষ্ট্রীয়ভাবে আলি পরিবারকে অভিশাপ দেয়ার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেয়া হলো, তবে জনগণ যদি স্বেচ্ছায় তা চর্চা করে তাতে সরকারের কিছু বলার থাকবে না'। হজরত আলির অন্ধ সমর্থক বেঁচে থাকা অবশিষ্ট শিয়াদের পানে ব্যক্তি স্বার্থপর হাসান ফিরে তাকালেন না। রাজস্ব কিছু সম্পদ নিয়ে তিনি স্বপরিবারে মদিনায় চলে যান। কুফায় হাসান আত্মসমর্পন করার কিছুদিন আগেই বসোরার গভর্নর (নবি বংশের) ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে চিঠি লিখে আত্মসমর্পন করে তার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির অভিযোগে আলির যুগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বসোরার গভর্নরপদ ত্যাগ করার আগে রাজভাণ্ডার শূন্য করে নিয়ে যান। মুয়াবিয়া এখানেও অসন্তুষ্ট হলেন না। এখন শুধু হাসান আর হোসেনের প্রাণ দুটো হাতে এলেই হয়, মুয়াবিয়ার মিশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট।

সমস্ত আরব বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক সম্রাট মুয়াবিয়া রাজকীয় বেশে কুফায় প্রবেশ করলেন। জনগণ প্রফুল্লচিত্তে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলো। কুফা নগরীকে বসোরার অন্তর্ভুক্ত করা হলো, দামেস্ক হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এবার গোপনে সকলের অগোচরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিলেই হয়। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) গুপ্তচরের মাধ্যমে হজরত হাসানের স্ত্রী জায়েদা বিনতে আশাত বিন কায়েসকে জানিয়ে দিলেন যে, জায়েদা যদি তার স্বামী হাসানকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে এবং খলিফার পুত্রবধু করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে। একদিন হাসান রোজা ছিলেন, জায়েদা তার স্বামীকে দুধে বিষ মিশিয়ে ইফতার করতে দেন। বিষ পানের চল্লিশ দিন পর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবি ৫০ হিজরির সফর মাসে হজরত হাসান (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। জায়েদা স্বামীকে হত্যা করে যখন মুয়াবিয়ার কাছে তার পুরস্কার দাবি করলেন, হজরত মুয়াবিয়া যায়েদাকে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বললেন- 'স্বামী হত্যাকারী মহিলাকে আমার পুত্রবধু বানাতে পারি না'। মুয়াবিয়া এবার ভাবলেন, নিজে ক্ষমতায় থাকতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়া বংশের হাতে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করলেন, স্বপুত্র এজিদকে

রাজপুত্র ঘোষণা দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করবেন। বিষয়টা সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে রাজকুমার, না খলিফা ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের সমর্থনে না বল প্রয়োগ করে পুত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সীমাহীন মতোবিরোধ দেখা যায়। আমরা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত রাখার লক্ষ্যে দু-একটি উদাহরণের প্রতি আলোকপাত করবো। ইবনে খালেদুন তাঁর Qayd 'AL-Shareed min Akhbar Yazeed' বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় বলেছেন: Mu'awiyah was eager for people's agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the district's governors. They all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says, 'His (Yazeed) caliphate is reightful, sixty of the companions of the prophet gave him the allegiance. Abdullah Ibn'Umar was one of them'.

এই তথ্যানুযায়ী নবির সহচরী ৬০ জন সাহাবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুয়াবিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং এজিদকে ইসলাম বিরোধী বললে সাহাবিদেরকেও অপমান করা হবে। হয় এজিদ ও সাহাবিগণ সত্যের পথে ছিলেন, না হয় যে অপরাধে এজিদ দোষী সেই অপরাধে সাহাবিগণও দোষী। মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বলেন- 'O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah Ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you

like a fox when it finds its opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a chance, cut him into pieces'.[৬১]

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে এজিদ কেটে কুটরো টুকরো করেছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি পূরণ করেছিলেন। এজিদ অত্যন্ত নৃশংস অমানুষিকভাবে হজরত হোসেনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে স্বপরিবারে হত্যা করেন। মৌলানা সাঈদ কুতুবের লেখা 'Social Justice in Islam' বইয়ের ২০৯-২১০ পৃষ্ঠায় আমরা আরও দেখতে পাই:

After the oath was taken to Yazid in Syria Muawiya gave Syed ibn Aas the task of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he (Syed ibn Aas) was unable to do. So Muawiya went to Mecca with an army and with full treasury. He called together the principal Muslims and addressed them thus: 'you all know that I nave lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of allegiance to Yazid as the next Caliph. Muawiya was answered by Abullah ibn Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah's Massenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done and hand over the whole matter to a council of six individuals. Muawiya's anger was kindled, and he asked Abullah ibn Zubair, 'Have you anymore to say?' 'No; said Abullah ibn Zubair. Muawiya turned to the others and said 'And you?' 'We agree with what Abullah ibn Zubair said' they replied. Then Muawiya addressed the meeting in threatening terms-'I stand to my words and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the decision that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head and no man can save his life'. So the people took the oath. (ঈষৎসংক্ষেপিত)।

---

৬১. ইক্বদ আল ফারিদ, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ২২৬

মৌলানা হজরত রসিদ আখতার (দেওবন্দি) তাঁর 'তাহজীব আওর তামাদ্দুনে ইসলাম' বইয়ের ১ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে- হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাধারণ মানুষকে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করেছিলেন। একই বক্তব্য পাওয়া যায় সিরিয়ান লেখক হজরত রসিদ রেজার 'ইমামাতুল উজমা' বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায়। অধ্যাপক সাইয়্যেদ আকবর এলাহাবাদী তার 'মুসলমানৌ কা উরজ ও জাওয়াল', পৃষ্ঠা ৫৩ এবং সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদি তার 'খেলাফত আওর মুলকিয়াত', পৃষ্ঠা ১৬৪/১৬৫ বইয়ে উভয়েই মুয়াবিয়াকে অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করার দায়ে অভিযুক্ত করেন। তবে সুখের কথা হলো কোনো প্রকার সংঘাত, প্রাণহানী ছাড়াই হজরত মুয়াবিয়া তাঁর রাজতন্ত্র কায়েম করার ইচ্ছে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাই হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আরব বিশ্বে উমাইয়া রাজতন্ত্রের স্থপতি হিসেবেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চণার উপর ভিত্তি করে যে ইসলামের জন্ম, জগতের অগণিত নিরপরাধ শিশু-কিশোর,নারী-পুরুষের রক্ত পান করে যার বিকাশ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তার বেঁচে থাকার অনিবার্য অবলম্বন।

নোটঃ এই সিরিজটি লিখতে গিয়ে বহু গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় সবচেয়ে প্রমান্য দলিল হিসেবে গন্য করা হয় সহি বুখারি, সিরাত এবং তারিখ আল্ তাবারি'-র তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককে। এগুলো ছাড়াও মৌলানা সাঈদ কুতুবের 'আদালাহাল ইজতিমাইয়্যা ফিল্ ইসলাম', সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদির 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র', খিলাফত ওয়া মুল্কিয়াত, মুসলমানৌ কা উরজ ও জাওয়াল, রাবিউল আবরার ওয়া নুসুসুল আখবার সহ বহু গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। কিছু রেফারেন্সের সচিত্র সাইটেশন এখানে দেয়া আছে।

https://mukto-mona.com/.../ak.../book/islam_jonmo_references.pdf

পাঠকের মন্তব্য

আকাশ মালিকের 'যে সত্য বলা হয়নি' গ্রন্থের পান্ডুলিপি পড়তে গিয়ে নিজের অজান্তেই একটা বড় ধাক্কা খেলাম। তিনি তার পুরো বইটিতে সাহসিকতার সাথে যে কথাগুলো উচচারণ করেছেন সেগুলো হয়তো আপনার আমার অনেকেরই মনের কথা। কিন্তু মনের কথা হলে কি হবে, সেই কথাগুলো সাহসিকতার সাথে উচচারণ করতে পারে ক'জন? তিনি 'মানব জাতির বিবেক' ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারের যে উক্তিটি ব্যবহার করেছেন 'বোকার স্বর্গ' প্রবন্ধে- 'পৃথিবীর প্রথম পুরোহিত বা মোল্লা ব্যক্তিটি হচেছ পৃথিবীর প্রথম ধূর্ত বাটপার, যার মোলাকাত হয়েছিল প্রথম নির্বোধ ব্যক্তিটির সাথে।' ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রারম্ভ আর তা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে এর চেয়ে নির্জলা সত্য আর কি হতে পারে! আমার প্রায়ই উচচস্বরে বলতে ইচেছ করে, যে যত বড় ধর্মপ্রচারক তিনি তত বড় ধর্মপ্রতারক। ডেভিড কপারফিল্ডের জাদুর চেয়েও যেন মোহনীয় ছিল তাদের প্রতারণার কৌশল। প্রতারণার ফাঁদ পেতে যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে গেড়ে আছেন এককেজন বিরিঞ্চিবাবা হয়ে- কেউ বা সেজেছেন 'ঈশ্বরের পুত্র' কেউ বা 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ' নবী-পয়গাম্বর' কেউ বা 'সত্য সাঁই'।

মনে পড়ে আটারো শতকে এক অজ্ঞাত লেখক এক গ্রন্থ লিখেছিলেন 'তিন ভন্ড' (The Three Impostors) নামে যা পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। 'তিন ভন্ড' গ্রন্থে দাবী করা হয়েছিল, বিশ্ব তিনজন ভন্ড চুরামনি দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। আর সেই তিন ভন্ড হচেছন, মুসা, যীশু আর মুহাম্মদ।

আকাশ মালিকের তালিকায় অবশ্য ভন্ডচুরামনি হিসেবে এসেছে আরো একজনের নাম, হিন্দুদের ভগবান মনু। 'তিন ভন্ড' গ্রন্থে'-র রচয়িতা হিসেবে দুই জনকে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। একজন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, অন্যজন মুসলিম দার্শনিক আবু রুশদ। সম্রাট ফ্রেডারিককে অভিহিত করা হয়ে থাকে 'The first modern man' হিসেবে, আর আবু রুশদ বিশেষিত হন 'সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক' অভিধায়। আমার কেন যেন মনে হচেছ 'যে সত্য বলা হয়নি' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে যেন আকাশ মালিক বাংলাদেশের আবু রুশদ হতে চলেছেন। এ সত্যই অতিশয়োক্তি নয়। সন্দেহ নেই বাংলাভাষায় এ ধরনের বই আগে লেখা হয়নি। পুরো গ্রন্থটি তার পরিশ্রম, মেধা এবং অধ্যাবসায়ের এক উজ্বল সাক্ষর। রসুনের মত খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আকাশ

মালিক যেন পাঠকদের সামনে তুলে এনেছেন শ্বেত শুভ্র সত্যের নির্যাস। তার পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় পাওয়া সত্যের নির্যাস দেখে অনেক পাঠকই চমকিত হবেন। আমিও হয়েছি। বারবার পড়েছি তার পুরো পান্ডুলিপিটি। চমক কাটতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিগুরুর বাণীতে খোঁজে পেয়েছি উত্তর-

'সত্য যে কঠিন সে কঠিনেরে ভালবাসিলাম সে কখনো করেনা বঞ্চনা।'

অভিজিৎ রায়
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মুক্তমনা
মার্চ ২০০৯

Akash Malik is a very creative writer, suffusing flesh, blood, warmth, and emotion on rather dreary, boney, chilling, and blood curdling history of Islam. His ability to render Islamic mumbo-jumbo in Bangla is superb. His writing style is engaging, incisive, fluid, and informative. Very few Bangla writers possess such writing skill. I doubt if his writings are translated into English will have the same verve and impact as it will be in Bangla.

No one knows Islamic history better than Tabari. His seminal work, 'Ta'rikh al-rasul wa'l muluk' (The History of al-Tabari) is the standard work recognized by the later historians of Islam. Tabri's work has been translated into English in thirty-nine volumes and published by SUNY press, Albany, New York. Volumes XI to XViii details the reigns Caliphs Abu Bakr to Muawiyah.

What Akash Malik has written so eloquently about the wars between various feuding parties of Islam conforms to the details by Tabari. I have checked the sources of Akash Malik, and I must say he has done extensive research before he put his pen on paper. His work bears all the hallmarks of a professional writer. I am yet to find an event depicted in his writing that has not been covered by Tabari. A true unbiased person should judge Akash Malik's work on the basis of its merit, authenticity, and dissemination of correct information. In this regard he has done a splendid job, I must admit. Islamist scholars will have tough time refuting Akash Malik's sources of information.

Abul Kasem

Sydney, Australia.

March 2009

(Abul Kasem is an Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in Leaving Islam - Apostates Speak Out and Beyond Jihad - Critical Voices from Inside. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia . His latest contribution is in the book Why We left Islam, edited by Susan Crimp et al. He also worked as an Editor of M A Khan's Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery.)

তথ্য-সুত্র ও সাহায্যকারী বইয়ের তালিকা

১) শহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞানের দর্শন, দ্বিতীয় খন্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৮।

২) রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, তোমার ক্ষয়, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০, ৩৫।

৩) হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২২।

৪) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৫) জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মের ভবিষ্যৎ, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১০।

৬) শফিকুর রহমান, পার্থিব জগৎ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৭, ১২৭।

৭) কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

৮) মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম এবং অন্যান্য, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৭৭-২১৪।

৯) বেঞ্জামিন ওয়াকার, ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪১।

১০) আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৫, ১০৬, ২৫৭।

১১) মনিরুল ইসলাম, বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, (সম্পাদনা করুণাসিন্ধু দাস), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৪২।

১৩) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮।

১৪) সফিউদ্দিন আহমদ, ডিরোজিও: জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৮।

১৫) মাওলানা করীম জওহর, আমি ধর্ম বলছি, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১০।
১৬) চিত্তরঞ্জন পাল ও রাজেশ দত্ত (সম্পাদনা), যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৭৪।
১৭) প্রদীপ দেব, ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিলতে ইতিহাস, প্রকাশকাল ৩১ শে জুলাই, ২০০৭।
১৮) অভিজিৎ রায়, বিজ্ঞানময় কিতাব, 'বিজ্ঞান ও ধর্ম: সংঘাত নাকি সমন্বয়', প্রথম প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর, ২০০২।
১৯) সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদি, (অনুবাদ আবদুর রহীম), তাফহীমুল কোরআন, ও 'খেলাফত ও মুলকিয়াত', ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৬৮।
২০) বন্যা আহমেদ, 'বিবর্তনের পথ ধরে' পৃষ্ঠা ৯।
২১) ফিলিপ, কে, হিট্টি, 'আরব জাতির ইতিহাস', মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।
২২) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'কোরান শরিফ', সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
২৩) জে, জি, বার্ণাল, (অনুবাদক আশীষ লাহিড়ী) 'ইতিহাসে বিজ্ঞান', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
২৪) মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, হজরত ওসমান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪।
২৫) Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, 2006, page 279, 315.
২৬) Ali Dasti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, London, 1985, Page 94
২৭) Ibn Warraq, Why I am not a Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, Page 35, 175.
২৮) Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, New Delhi, India, 2002, Page 39, 79, 80, 167, 216)
২৯) Sam Shamoun, Muhammad and Idolatry.
৩০) Samuel M. Zwemer, F.R.G.S., The Influence Of Animism On Islam: An Account Of Popular Superstitions.

৩১) Sita Agarwal, Genocide of Women in Hinduism.
৩২) The Dark Bible, Compiled by Jim Walker
৩৩) Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Sahi Bukhari Hadith.
৩৪) Mervyn Hiskett Some to Mecca Turn to Pray: Islamic Values in the Modern World Claridge Press, London, 1993, page 245-246)
৩৫) Dr Muhammad Kamal, Mutazilah: the rise of Islamic rationalism, The Rationalist Society of Australia's Newsletter: Australian Rationalist, Number 62, Page 27-34
৩৬) Toby Lester, What is the Quran?, 'The Atlantic Monthly', January, 1999.
৩৭) International Humanist News, International Humanist and Ethical Union (IHEU), London, U. K, February, 2004, Page 5
৩৮) Floris Van den Berg, Islamic Terror in the Netherlands, 'Free Inquiry', April/May 2005, Vol. 25 No. 3, page 44-47.
৩৯) John Patrick Michael Murphy, Murphy's Law: Giordano Bruno, 1998
৪০) The Daily Hindustan Times, 12/03/2000
৪১) Anwar Shaikh, Islam: the Arab Imperialism, Principality Publishers, 1998, page 4-5
৪২) W. H. Temple Gairdner, Iskandar 'Abdu'l-Masih, and Sali 'Abdu'l-Ahad, The Verse of Stoning in the Bible and the Qur'an
৪৩) Alfred Guillaume, Islam, Harmondsworth, 1978, Page 74.
৪৪) Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, Page 545.
৪৫) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, the History of Al-Tabari, "The Victory of Islam", vol-8, Translated by Michael Fishbein, State University of New York Press (SUNY), N.Y, USA, Page 35-36).
৪৬) Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, London, 1991, Page 207.

৪৭) Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Low Price Publications, Delhi, (First Published 1933), 2006, page 235.
৪৮) Dr Ali Muhammad As-Sallaabee, Faisal Shafeeq (translator), The Noble Life of The Prophet, vol 3, Dar-us-salam Publishers, 2005, Page 1535.
৪৯) Abul Kasem, Who Authored the Qur'an?—an Enquiry
৫০) Don Richardson, Secrets of the Koran, Regal Books, U.S.A, 2003, page 33.
৫১) Sir William Muir: The Life of Mahomet, Vol 2, Page 150.
৫২) Hisham Ibn-Al-Kalbi, The Kitab Al-Asnam, 'The Book Of Idols', (Translated in English by Nabih Amin Faris), Princeton University Press, 1952, Page 16-17.
৫৩) Ameer Ali, The Spirit of Islam, Low Price Publications, Delhi, India, 2002, page 34-35.
৫৪) Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1, Part 1 & 2, Pakistan Historical Society, Pakistan, Page 236-239.
৫৫) M. Fethullah Gulen, Questions this Modern Age Puts to Islam, Truestar, London, 1993, Page 58.
৫৬) Arthur Jeffery- A Variant Text of the Fatiha
৫৭) Dr. Taha Hussain, The Future of Culture in Egypt, American Council of Learned Societies, Washington, DC, 1954, Page 7.
৫৮) Sahih Muslem, Dawud, Tirmizi and Bukhari Shareef.
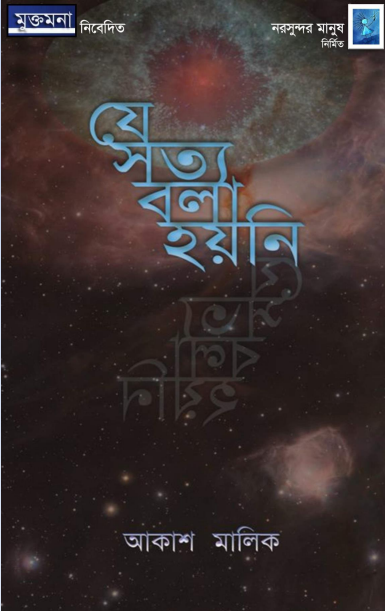
আকাশ মালিক-এর *'যে সত্য বলা হয়নি'* গ্রন্থের পান্ডুলিপি পড়তে গিয়ে একটা বড় ধাক্কা খেলাম। তিনি তার পুরো বইটিতে সাহসিকতার সাথে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন সেগুলো আপনার আমার অনেকেরই মনের কথা। কিন্তু মনের কথা হলে কি হবে, সেই কথাগুলো সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করতে পারে ক'জন?

অভিজিৎ রায়
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মুক্তমনা

Akash Malik is a very creative writer, suffusing flesh, blood, warmth, and emotion on rather dreary, boney, chilling, and blood curdling history of Islam.

Abul Kasem
Sydney, Australia

কিছু কিছু মানুষের লেখা মনোজগতের আমূল পরিবর্তন করতে পারে অনায়াসে; আকাশ মালিক ঠিক তেমন একজন লেখক; বাংলা মুক্তবুদ্ধি চর্চার বিখ্যাত এই বইটির সাথে যুক্ত থাকতে পারা আমার অহংকারের দিকটা প্রকট করলো!

নরসুন্দর মানুষ

www.mukto-mona.com